জীবনস্মৃতি

সম্পাদনায় সহায়তা

অভিজিৎ সেন

অনিন্দিতা ভাদুড়ী

দে'জ পাবলিশিং । কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৬৪

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে । দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট । কলকাতা ৭০০ ০৭৩

শব্দগ্রন্থন : অরিজিৎ কুমার । লেজার ইম্প্রেশন্‌স
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন । কলকাতা ৭০০ ০০৪

ভূমিকা

উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে বাংলা দেশে যে ব্রাহ্ম আন্দোলন জেগে উঠেছিল, আমরা জানি, তাতে পুরুষরাই ছিলেন প্রধান ভূমিকায়। পুরুষরা, যাঁরা ব্রাহ্ম মতাদর্শে আকৃষ্ট হচ্ছিলেন, তাঁদের স্ত্রীরা কিংবা মা-বোনেরা অনেকক্ষেত্রেই তাঁদের অনুগামী হতেন, কেউ কেউ বা নিজেদের পুরুষানুক্রমিক বিশ্বাসেই স্থিত থাকতেন। ব্রাহ্ম পুরুষরা যে-মেয়েদের সামাজিক-আর্থিক দুরবস্থা থেকে উদ্ধার করতেন, তাঁরাও স্বভাবতই ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত হতেন। এক্ষেত্রে মেয়েদের নিজেদের সুস্থভাবে বাঁচার একটা তাগিদ থাকত অবশ্যই। শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিতে আমরা লক্ষ্মীমণির মতো মেয়েদের দৃষ্টান্ত দেখেছি। ব্রাহ্ম-সমাজের কর্মসূচিতে নারীশিক্ষা নারীস্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলি যথেষ্ট গুরুত্ব পেত। সেসব কারণেও হয়তো অচেতন মেয়েরা ব্রাহ্মধর্মে আকৃষ্ট হতেন। কিন্তু, পুরুষদের মতোই, নিছক আধ্যাত্মিক চেতনার তাগিদেই কি মেয়েরা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার কথা ভাবেন নি কখনো?

ভেবেছিলেন যে, তারই পরিচয় আছে সুদক্ষিণা সেনের জীবনস্মৃতিতে। তাঁর নিজের এবং তাঁর মায়ের, দুজনেরই পুরুষানুক্রমিক পৌত্তলিক ধর্ম-সংস্কারের বাইরে নিজস্ব বোধের উন্মেষের কথা জানিয়েছেন সুদক্ষিণা। সেই বোধ নিয়ে তাঁরা নিজের ঘরের নিরাপদ কোণটিতে বসে থাকেন নি। সুদক্ষিণার মা নিত্যকালী দেবী তিনটি সন্তান নিয়ে নিজের গ্রামের নিজের পরিবারের স্নেহসজল আশ্রয় ছেড়ে, নিরাপত্তার যাবতীয় ভাবনা ছেড়ে, সুদূর কলকাতায় পাড়ি দিয়েছিলেন তাঁর ধর্মবোধের তাগিদেই মুখ্যত। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর গৌণ কারণটিও অবশ্য ছিল। উনিশ শতকের বাঙালী মেয়ের ইতিহাসে মেয়েদের এমন একটি সামর্থ্যের দিক অনুল্লেখিতই থেকে যায় সচরাচর ঐতিহাসিকের কলমে। সুদক্ষিণা সেনের জীবনস্মৃতি সে সামর্থ্যের সাক্ষ্য রচনা করেছে। বাঙালী মেয়ের ইতিহাসে তাই এ বইটির গুরুত্ব অসীম। শুধু তাঁর নিজের পরিবারের কথাই নয়, এ বই থেকে বিধুমুখী দেবীর মতো আরো কোনো কোনো মহিলার কথা জানতে পারছি, স্ব-ইচ্ছায় যাঁরা ঘর ছেড়েছিলেন, ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' নাটকে মালিনীর মা মালিনীকে বলেছিলেন : 'শাস্ত্র লয়ে কাটাকাটি করা', 'সন্দেহসাগরে হাহা করে ফেরা'—এসব পুরুষের কাজ ; মেয়েদের 'ধর্ম থাকে বক্ষে কোলে চিরদিন স্থির / পতিপুত্র রূপে।' মালিনীর মায়ের বয়ানে পুরুষতন্ত্রের নির্দেশই প্রকাশ পায়। সে নির্দেশ যে মেয়েরা মান্য করে নি সবসময়, তার দৃষ্টান্ত শুধু

কবির কলমে গড়া মালিনীই নয়, বাস্তবের নিত্যকালী, বিধুমুখী, সুদক্ষিণারাও।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুসমাজ ত্যাগ করে সুদক্ষিণারা কীভাবে ব্রাহ্মসমাজে এলেন, সেইসময়কার ব্রাহ্মদের অবস্থা কেমন ছিল—সেসব বলার জন্যেই যে সুদক্ষিণার জীবনস্মৃতি লিখতে বসা, ভূমিকায় তিনি তা জানিয়েছেন। স্বভাবতই ধর্মপ্রসঙ্গ তাঁর বইতে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে তাঁর এবং তাঁর মায়ের মনে ধর্মবোধের অঙ্কুর জাগল, দেখিয়েছেন তার মেয়েলি ধরণ। তাঁর মা যখন 'সনাতন সত্য ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট' হলেন, যখন তিনি লুকিয়ে 'ব্রহ্মোপাসনা' করতে আরম্ভ করলেন, তখনও কিন্তু 'প্রকাশ্যে শিবপূজা' ছাড়তে পারেন নি। তাঁর বাল্যবয়সের ব্রতপালনের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন সুদক্ষিণা। ব্রত করতে করতেই তিনি তার অর্থহীনতা বুঝতে পারেন, বুঝতে পারেন ভিতরের বিশ্বাস যদি না থাকে, তবে এসব 'মিথ্যা অভিনয়' মাত্র, এবং প্রতিজ্ঞা করেন—আর ব্রত করবেন না। মেয়েদের সে-সময়কার সামাজিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বালিকার এই ছোট্ট বিদ্রোহ নেহাত ছোট নয়। পরে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়ে সেখানকার উপাসনার অভিজ্ঞতা কী আবেগ দিয়েই না লিখেছেন সুদক্ষিণা : 'হে ঈশ্বর! সকল কুসংস্কারের জাল ছিন্ন করিয়া, সকল মাটির কল্পিত পুতুল দেবতাগুলি চুরমার করিয়া ভাঙিয়া চুরিয়া তোমার নিরাকার রূপে মুগ্ধ করিতে এ তুমি কোথায় আনিলে?' প্রতি রবিবার তো ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হতই, কেশব সেন সেখানে উপদেশ দিতেন। ভারতাশ্রমে দিনে দুবার উপাসনা হত। একবার সমস্ত রাত্রি উপাসনা হয়েছিল। সুদক্ষিণার ধর্মবোধ এসবের থেকেই জলসিঞ্চন পেতে থাকে। সুদক্ষিণা যখন ঢাকা থেকে কলকাতা আসেন দ্বিতীয়বার, লেখাপড়া শেখার জন্যেই, তখন ভারতাশ্রমকে তাঁর থাকার জায়গা হিসেবে তিনি নিজেই নির্বাচন করেন। তাঁর ধর্মবোধই তার কারণ। তখনকার 'ব্রাহ্মদের আননে' তিনি 'স্বর্গীয় বিভা' দেখতে পেতেন। সুদক্ষিণা উপলব্ধি করেছিলেন, শুধু ধর্মবোধের কারণেই কত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে সেই ব্রাহ্ম যুবকদের। এক তো ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করা মানে 'পিতামাতার বক্ষে শেল বিদ্ধ করা'। অন্যদিকে যে ত্যক্ত হচ্ছে তারও দুঃখ কম নয়। আবার স্ত্রীদের যতদিন নিজের কাছে আনতে না পারছেন, ততদিন তাদের সঙ্গেও দেখা করা মানা। পরিবারের সকলকে ত্যাগ করে যাঁরা ব্রাহ্মসমাজে আসতেন, তাঁরা সে সমাজের সকল মানুষকেই আপন করে নিতেন। তাঁর ধর্মবোধ থেকে এই এক নতুন রকম আত্মীয়তার সন্ধান পেয়েছিলেন সুদক্ষিণা। সেই আত্মীয়তার, পারস্পরিক ভালোবাসার ছবি সবিস্তারেই বলেছেন তিনি, বলেছেন তার আনন্দের কথা।

২

সেই আনন্দই তাঁর জীবনস্মৃতির মূল সুর। তবু, বিবাহ হওয়ার ফলে তাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নি বলে সুদক্ষিণার আক্ষেপও কম ছিল না। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করাও তো নিত্যকালীর সংসারত্যাগের লক্ষ্য ছিল। তাঁর স্বামী মৃত্যুর আগে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর কথা বিশেষ করে বলে গিয়েছিলেন নিত্যকালীকে। নিত্যকালীর

পিতৃগৃহের পরিবেশও এ বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করেছিল তাঁকে। সুদক্ষিণার শিক্ষালাভের বিবরণ সূত্রে উনিশ শতকের নারীশিক্ষার গোটা পরিস্থিতিরই একটা ছবি উঠে এসেছে এ বইতে। কোনো কোনো অবস্থাপন্ন পরিবার নিজেদের বাড়িতেই স্কুল বসাতেন, বড় বড় পদস্থ ব্যক্তিরা কখনো-সখনো আসতেন পরিদর্শনে, মেয়েদের পারিতোষিক দিতেন। এ ব্যবস্থা তখন পূর্ববঙ্গের অনেক পরিবারেই ছিল। সুদক্ষিণা কলকাতায় আসার পর দেখছি তিনি কেশব সেনের নারীবিদ্যালয়ে পড়তে যাচ্ছেন, বেথুন স্কুলে না গিয়ে। বেথুন স্কুলের মেমসাহেব এসে তাঁর মাকেই ছাত্রী করে নেন, যদিও তিনদিনের বেশি তাঁর আর বিদ্যালয়ে যাওয়া হয়ে ওঠে নি। খরচ কমানোর জন্যে নিত্যকালী কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন, ঢাকাতেও তখন 'এডাল্ট ফিমেল স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুদক্ষিণা সেই বিদ্যালয়ে পড়তে যেতেন তাঁদের আশ্রয়দাতা পরিবারে রান্না করে সকলকে পরিবেশন করে। অনেক সময় নিজে খেতে সময়টুকুও পেতেন না। সে বিদ্যালয়ে বিবাহিতা মেয়েরা শিশুসন্তান সঙ্গে নিয়ে আসতেন। এ জাতীয় তথ্য অপ্রমাণ করে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে সে-সময়কার প্রচলিত একটি যুক্তি। সে যুক্তি এই, যে, অল্পবয়সে মেয়েদের বিয়ে-হওয়া মা-হওয়া তাদের লেখাপড়া শেখার প্রধান বাধা। ঢাকা থেকে সুদক্ষিণা শুধু লেখাপড়ার জন্যেই দাদার সঙ্গে আবার কলকাতায় আসেন। কেশব সেন প্রতিষ্ঠিত ভারত-আশ্রমে থেকে সেখানকার বিদ্যালয়ে পাঠ নিতেন তিনি। এই বিদ্যালয়ে পড়াতে আসতেন কৃতবিদ্য পণ্ডিতেরা। সুদক্ষিণার 'জীবনস্মৃতি'র এই নতুন সংস্করণের পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে যোগেশচন্দ্র বাগলের কয়েকটি প্রবন্ধ। বাঙালী মেয়েদের শিক্ষা বিষয়ে উদ্যমের প্রথম পর্যায়টি তথ্যের নিরিখে উপস্থাপিত হয়েছে সেই প্রবন্ধগুলিতে। সুদক্ষিণার স্মৃতিকথায় পাচ্ছি তাঁর, একটি বাঙালী কিশোরীর, অভিজ্ঞতার নিরিখ, শিক্ষা পাবার জন্যে মেয়েদের প্রবল আকাঙ্ক্ষা, প্রয়াস সেখানে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

৩

যে সমাজে সুদক্ষিণা জন্ম নিয়েছেন (১৮৫৯), সেই হিন্দুসমাজকে তিনি 'কারাগারে'র উপমায় উপমিত করেছেন। প্রথম বাঙালী আত্মজীবনী রচয়িতা রাসসুন্দরী শ্বশুরবাড়িকে দেখেছিলেন কারাগারের উপমায়। উনিশ শতকের মেয়েদের লেখায় নিজেদের অবস্থানের উপমা হিসেবে 'কারাগারে'র অনুরূপ 'পিঞ্জর' তো ঘুরেফিরেই এসেছে, সে পিঞ্জর কখনো অবরোধের, কখনো পিতৃতন্ত্রের। সে 'কারাগার' বা পিঞ্জর থেকে মুক্তির কোনো সম্ভাবনা তাঁদের সামনে ছিল না। কিন্তু সুদক্ষিণার কাছে বিশেষ ধর্ম বা সমাজই কারাগাব, সেই ধর্ম বা সমাজ ত্যাগ করলেই কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ব্রাহ্মধর্ম ব্রাহ্মসমাজে আসা তাই সুদক্ষিণার কাছে 'অন্ধকার কারাগার হইতে মুক্ত বাতাসে' আসা। হিন্দুসমাজ কেন তাঁর কাছে কারাগার স্বরূপ, তার উত্তর রেখেছেন সুদক্ষিণা, দেখিয়েছেন হিন্দুসমাজের কুসংস্কার মেয়েদের কীভাবে পেষণ করে।

এক তো লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা বিধবা হবে—এই এক বিচিত্র কুসংস্কার ছিল সে-যুগে, মেয়েদের বিদ্যালাভের প্রধান একটি অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই কুসংস্কার। তার উপর বৈধব্যপালনের চূড়ান্ত নিষ্ঠুর সংস্কার। একাদশীর নির্জলা উপবাসবিধি কী ভয়ংকরভাবে অনড় ছিল তখন। এই সমাজে নারী-পুরুষ বিষয়ে নির্দেশ কতটাই বৈষম্যমূলক, সেই বিধির বর্ণনাসূত্রে নির্দেশ করতে পেরেছিলেন সুদক্ষিণা : 'পুরুষগণ স্ত্রীর মৃত্যুর পরে, এমন-কি বর্তমানে, যাহা খুশি তাহাই করিতে পারিবে। কিন্তু হতভাগিনী বিধবা শুষ্ককণ্ঠে জল পাওয়া দূরের কথা, চিতাভস্ম ধুইলেও ধর্ম নষ্ট হবে!' হিন্দুসমাজের বিচিত্র বিধিনিষেধের চাপে এবং পারিবারিক অত্যাচারের চাপে পিষ্ট এক 'পার্বতীমাসী'র কথা লিখেছেন সুদক্ষিণা, যাঁর আড়াই বছর বয়সে বিবাহ হয় এবং পাঁচ বছর বয়সে বৈধব্য ঘটে। এমন অর্থহীন বিবাহ সত্ত্বেও পার্বতীর পুনর্বিবাহের কথা তো চিন্তা করাও পাপ, যদিও পার্বতীর মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর বাবা দিব্যি নতুন বৌ ঘরে আনেন, আর সৎমার অত্যাচারে পার্বতীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। সে অত্যাচাব থেকে ত্রাণ পাবার জন্যে পার্বতী ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণে উন্মুখ হয়ে ওঠেন এবং ব্রাহ্ম পুরুষদের সহায়তায় গ্রাম-পরিবার ত্যাগ করতেও সক্ষম হন। নিতান্ত কম বয়সে বিধবা হওয়ায় যে হিন্দু মেয়েদের জীবন হতাশাচ্ছন্ন ছিল, তাদের আশার আলো যোগানোয় ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকার কথা আমরা সকলেই জানি। পার্বতীর উদ্ধারের কাহিনী তারই এক দৃষ্টান্ত। বোঝা যায়, কেন সুদক্ষিণার কাছে হিন্দুধর্ম বা সমাজ কারাগারের উপমা পেয়েছিল।

বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ-জনিত কুসংস্কারেরও ছবি রেখেছেন সুদক্ষিণা। কুলীন ব্রাহ্মণদের নাকি নিয়ম ছিল—প্রথমে একটি অকুলীন মেয়ে বিয়ে করতে হবে, তারপরে যত ইচ্ছে কুলীন মেয়ের সঙ্গে বিবাহ হতে পারবে। এই কুসংস্কারের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন সুদক্ষিণার বাবা, ঘটকের শত প্রয়াসেও তিনি একাধিক বিবাহে রাজি হন নি। কিন্তু সুদক্ষিণার পিতৃহীন দাদাকে, বাল্যবিবাহর বিরুদ্ধে তিনি প্রবন্ধ লেখা সত্ত্বেও, আত্মীয়জনদের জেদে মাত্র পনেরো বছর বয়সেই বিয়ে করতে হয়। তবু, সমাজে [illegible], বাল্যবিবাহ বিষয়ে সচেতনতা দেখা দিয়েছিল যে, সুদক্ষিণা তা জানাতে ভোলেন নি। প্রমাণস্বরূপ বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করা দুটি ছড়া উদ্ধৃত করেছেন তিনি। 'অল্প বয়সে বিবাহ/সিংহ হয় বরাহ'—এরকম ছড়া পড়লে অবশ্য বুঝতে অসুবিধে হয় না, ছেলেদের বাল্যবিবাহের বিরোধিতা যতটা গুরুত্ব পাচ্ছিল, মেয়েদের ততটা নয়। শ্বশুরবাড়ির লোকজন জোর করে ছেলের বিয়ে দেওয়ায় সুদক্ষিণার মা তাই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, ভয় তাঁর মেয়েদের ভবিষ্যৎ ভেবে, কেননা তাদের যদি জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা সতীন-ঘরেই হবে নিশ্চিত, কুলীন-ঘরের মেয়ে তাঁরা, আর কুলীন পুরুষকে তো প্রথম বিয়েটা অকুলীনকে করতেই হয়!

পুরুষের বহুবিবাহের মতোই, হিন্দুসমাজের বিবাহসংক্রান্ত কুসংস্কারের অন্য একটি দিকও দেখিয়েছেন সুদক্ষিণা—সে হল অসবর্ণ বিবাহের অসম্ভাব্যতা। জাতিভেদ-বর্ণভেদ সংস্কার হিসেবে এমন পরাক্রান্ত ছিল হিন্দুসমাজের যে-কোনো মানুষের মনে, যে অসবর্ণ

বিবাহ সমাজচ্যুতিরই আরেক নাম ছিল বলা যায়। আত্মীয়স্বজন হিন্দুসমাজে আবার ফিরে আসার অনুরোধ করতেন সুদক্ষিণাদের। সুদক্ষিণার মা সেই অনুরোধ এড়ানোর কারণেই মেয়েদের অসবর্ণ বিবাহ দেবার সিদ্ধান্ত নেন।

তবু, সেই কারাগার-সদৃশ হিন্দুসমাজ যে অচল অনড় ছিল না, তারও পরিচয় এই স্মৃতিকথার মধ্যে রয়েছে। ছয়-সাত মাসের মেয়ে নিয়ে সুদক্ষিণা যখন মা-বোনের সঙ্গে তাঁর মাতুলালয়ে আসেন, তখন দিনের আলোয় কেউ তাঁদের 'বাড়িতে উঠাইতে সাহস পাইলেন না', 'সমাজ তাঁহাদিগকে অভিশাপ-অঙ্গুলি তুলিয়া নিষেধ করিতেছিল।' কেননা একে তো সুদক্ষিণারা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়েছেন, তার উপর আবার দুই বোনেরই অসবর্ণ বিবাহ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মোটে দুবছর পর, সুদক্ষিণা যখন শিশুপুত্র কোলে আরো একবার মায়ের সঙ্গে মামারবাড়ি এলেন, তখন 'বাড়ির ঘাটে নৌকা লাগিবামাত্র বাটির সকলে ও প্রতিবাসীবা' তাঁদের 'আহ্লাদের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন।' সে-সময় বেশ দীর্ঘদিন তাঁরা থাকলেনও সেখানে। বিলাত যাওয়াও তখন হিন্দুসমাজে 'অধর্ম' বলে বিবেচিত হত, কিন্তু সুদক্ষিণার স্বামী তখন বিলাতেই ছিলেন, সেখান থেকে সুদক্ষিণাকে চিঠিও পাঠাতেন—এসব নিয়েও সেই সোহাগদল গ্রামে কোনো কথাটিও ওঠে নি।

৪

হয়তো সেই কারণেই, হিন্দুসমাজের কুসংস্কার 'কুজঝটিকা' বা 'কারাগার'-তুল্য হলেও হিন্দুসমাজের সবকিছুই এই লেখিকা হীন চোখে দেখেন নি। তাঁর শৈশব-স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে মাতুল পরিবারের লক্ষ্মীপূজার ছবি : 'লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিবস রাত্রিতে চন্দ্রালোকে যখন সমস্ত প্রাঙ্গণ জুড়িয়া সকলে আহার করিতে বসিল, সে কি সুন্দর দৃশ্য!' ব্রাহ্মসমাজে পুরো জীবন যুক্ত থেকেও জীবন-সায়াহ্নে পৌঁছে 'লক্ষ্মীপূজা সংক্রান্ত' তাঁর দেশের একটি সুন্দর নিয়মের কথা না লিখে থাকতে পারেন নি সুদক্ষিণা। লক্ষ্মীপূজার সময় প্রতিবাড়িতে বিবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত থাকত, যে বাড়িতে আসত তাকেই সেসব দিয়ে আপ্যায়ন করা হত। সব বর্ণের মানুষদের মধ্যেই এ প্রথা চলিত ছিল। সুদক্ষিণাকে বলতে হয়েছে : 'নিয়মটি বড়ই চমৎকার। ইহাতে প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের সৌহার্দ্দ্যের আদান প্রদান হইত।' না, সুদক্ষিণা 'গোরা' উপন্যাসের বরদাসুন্দরীর সগোত্র ছিলেন না। বাল্যবয়সেই যিনি ব্রত করার অসারতা বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি কিন্তু নিজে ব্রাহ্মিকা হওয়া সত্ত্বেও, বিশিষ্ট ব্রাহ্ম নেতা অম্বিকাচরণ সেনের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর সোনাদিদির 'নিরাকুলী'র ব্রত করাকে আদৌ হেয় করেন নি : 'তাঁহার বিশ্বাস যাহা তাহাই তিনি করিতেন।'

তাঁর সোনাদিদি, তাঁর মাতুল পরিবারের অন্যদের কথা সুদক্ষিণা সবিস্তারেই বলেছেন। পিতৃপরিবারের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল না ঠিকই, কিন্তু মাতুল পরিবারে স্নেহসিঞ্চিত শৈশবযাপনের দিনে পরিবার বন্ধনের ভিতরকার কোনো স্বার্থহানাহানির

অপ্রীতিকর দিক তাঁর অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে নি। তাহলেও ছোট সামাজিক পরিবার থেকে তিনি যখন অনেক বড় এক ধর্মীয় পরিবারে এসে পৌঁছলেন, তখন বালিকাবয়স সত্ত্বেও জীবনে এক ব্যাপ্তির আনন্দ তিনি ঠিকই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বিশেষত দ্বিতীয়বাব কলকাতায় এসে আত্ম-পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি যখন ভারতাশ্রমে ছিলেন, 'সেইসব আনন্দের দিন', বহু মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, তাদের স্নেহ ভালোবাসা পাওয়া—এসব লেখিকা সবিস্তারেই লিখেছেন। ভারতাশ্রম আমাদের দেশের প্রথম আধুনিক কমিউন। কেশবচন্দ্র সেন মনে করেছিলেন, 'কতকগুলি ব্রাহ্ম পরিবারকে একত্র রাখিয়া, কিছুদিন সময়ে আহার, সময়ে বিশ্রাম, সময়ে উপাসনা এইরূপ নিয়মাধীন রাখিয়া, শৃঙ্খলামত কাজ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহারা সেই ভাব লইয়া গিয়া চারিদিকের ব্রাহ্ম পরিবারে ব্যাপ্ত করিতে পারে।' এই ভাব নিয়ে তিনি ভারতাশ্রম স্থাপন করেছিলেন কিন্তু নিয়ম-শৃঙ্খলার বাঁধাবাঁধি যতই থাক, একত্র বাস যে কত আনন্দময় ছিল, সকলের জন্যে রান্না করা, একসঙ্গে পুকুরে স্নান করা, উপাসনা করা—এসবের ছবি সুদক্ষিণা যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, আর কারো লেখায় তেমনটি নেই। উপরের উদ্ধৃতিটি শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত থেকে নেওয়া। তিনিও একসময় ভারতাশ্রমে ছিলেন, একসঙ্গে থাকা-খাওয়া উপাসনা করার কথা তিনিও লিখেছেন। কিন্তু সুদক্ষিণার মতো খুঁটিনাটির বিবরণ দেন নি তিনি। ভারতাশ্রম বিষয়ে লিখতে বসে গবেষক-ঐতিহাসিকরা সুদক্ষিণা সেনের জীবনস্মৃতি থেকেই উদ্ধৃতি দেন (দ্রষ্টব্য : পরিশিষ্ট ২, যোগেশচন্দ্র বাগল : 'বামাহিতৈষিণী সভা ও ভাবতাশ্রম')।

ভারতাশ্রমেও যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটত না এমন নয়। শিবনাথ শাস্ত্রীব 'আত্মচরিত' গ্রন্থে এমন এক ঘটনার উল্লেখ আছে, যার জন্যে সংবাদপত্রে বাদপ্রতিবাদও হয়েছিল। সে ঘটনা সুদক্ষিণা ভারতাশ্রমে থাকার সমসময়ও হতে পারে। কিন্তু সুদক্ষিণার জীবনাস্মৃতিতে কোনো বিবাদী সুরের স্পর্শমাত্র নেই। ব্রাহ্মমন্দিরের উপাসনায় মেয়েরা আড়ালে বসবে, না প্রকাশ্যে বসবে—এই নিয়েও যে সে-সময় তর্কবিতর্ক চলেছিল, সুদক্ষিণা সেসব বিষয়েও কোনো কথা বলেন নি। কথা বলেন নি কেশব সেনের মেয়েদের বিবাহ নিয়ে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিবাদ আন্দোলন বিষয়েও। ব্রাহ্মসমাজ যে আবার দ্বিধাবিভক্ত হলো—এই নিয়েও নিজস্ব কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন নি তিনি (শুধু এইটুকু জানিয়েছেন—তাঁর স্বামী দুই দলের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন)। জীবনের যে-কোনো অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতাকে এই নারী যেন তাঁর স্মৃতিলোক থেকে সরিয়ে রাখতেই চেয়েছেন। কয়েকটি মৃত্যুশোকের অভিঘাত ছাড়া অন্য কোনো কালো দিক তার অন্ধকার ছায়া ফেলে নি কোথাও। সচরাচর মহিলারচিত স্মৃতিকথাতে সেই কালো দিকগুলিই বেশি প্রাধান্য পায়। সুদক্ষিণা সেনের 'জীবনস্মৃতি' সেদিক থেকে ব্যতিক্রমী।

ব্যতিক্রমী আরো একদিক দিয়েও। অনেক মানুষজনের কথা আছে হয়তো এই স্মৃতিকথায়, যেরকম সচরাচর থেকে থাকে। কেশব সেন কিংবা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কিংবা বিধান রায়দের মতো বিখ্যাতজন এবং তাঁদের পরিবারবর্গের কথা প্রায়শই এসেছে।

স্মৃতিকথা মাত্রেই ঐতিহাসিক দলিল, ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস রচনার দিক থেকে হয়তো এই বইটি বেশ বেশিরকম গুরুত্বপূর্ণ দলিলই। কিন্তু সেদিক থেকে বইটি ব্যতিক্রমী নয়। একটি ছোট মেয়ের ছোট ছোট আনন্দ কুড়িয়ে নেবার ইতিহাস আছে এই বইতে, তার স্বাদ বড় দুর্লভ। গুরুজনদের অবাধ্য হয়ে ঝড়ে আম কুড়োতে যাওয়া কিংবা ভারতাশ্রমের বাগানে বসে কচি ভুট্টা পেড়ে খাওয়ার কথা, বৃহদাকার ডালিম কিংবা মুলোর কথা, আইসক্রিমকে গোরুর মাংস ভেবে না-খাওয়া, রান্না করতে করতে পড়া শেখা,—এসব তুচ্ছ কথাই অন্যত্র মেলে না, উচ্চকথা বলতে তো সবাই পারে। আমার মতো পাঠকের কাছে এইজন্যেই বইটি বিশেষভাবে মূল্যবান।

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' প্রকাশের (১৯১২) কুড়ি বছর পরে সুদক্ষিণা সেনের (১৮৫৯-১৯৩৪) আত্মজীবনীটি প্রকাশিত হয় (১৯৩২ : ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ)। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' নামটিতে অনুপ্রাণিত হয়ে লেখিকা নিজের আত্মকথার ওই একই নাম রেখেছিলেন,—এ-সবই আমাদের অনুমান। অবশ্য সুদক্ষিণা সেনের লেখার কোনো জায়গাতেই রবীন্দ্রনাথের কোনো উল্লেখ নেই। ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হলেও আত্মজীবনীটি বেশ দুষ্প্রাপ্য। কলকাতার অনেক নামী গ্রন্থাগারের সংগ্রহে এই বইটি নেই। বর্তমান পুনর্মুদ্রণটি সম্ভব হল শ্রীমতী সুদক্ষিণা ঘোষের আনুকূল্যে। শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অন্তর্গত প্রমথ চৌধুরী সংগ্রহে রক্ষিত এই বইয়েব একমাত্র কপি থেকে শ্রীমতী ঘোষ একটি প্রতিলিপি আমাদের সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন।

সুদক্ষিণা সেন মারা যান ১৯৩৪ সালে। তিনি আমৃত্যু যে-বাড়িতে বসবাস করেছেন—৫৭নং ল্যান্সডাউন রোড (এখনকার শরৎ বসু রোড)—সে-বাড়িটি এখনও আছে, তবে পরিবারস্থ কোনো জীবিত সদস্যের হদিশ না পাওয়ায় এবং বাড়ির যে-অংশে এঁরা বসবাস করতেন সেই অংশ তালাবন্ধ থাকায়, কোনো পারিবারিক ছবির অ্যালবাম বা অন্যান্য কাগজপত্র দেখার সুযোগ হল না।

পুনর্মুদ্রণের 'সংযোজন' অংশটিতে প্রয়াত যোগেশচন্দ্র বাগলের তিনটি বাংলা ও একটি ইংরাজিতে লেখা প্রবন্ধ পুনঃপ্রকাশিত হল। সুদক্ষিণা সেনের 'জীবনস্মৃতি'-তে বিবৃত ঘটনাবলীর পটভূমি ও নববিধান ব্রাহ্মমণ্ডলী তথা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে কীভাবে বঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার ও বিকাশলাভ ঘটেছিল, সেই প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধগুলি মূল পাঠ্যাংশের পরিপূরক হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। ইংরাজিতে লেখা চতুর্থ প্রবন্ধটি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রচেষ্টায় হিন্দুমহিলাদের শিক্ষা-প্রচেষ্টার বিবরণ।

বাংলায় মহিলাদের লেখা স্মৃতিমূলক সাহিত্যের ধারায় সুদক্ষিণা সেনের স্বল্প-পরিচিত এই বইটি স্থানলাভ করে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোক এটাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা। ব্যক্তি-পরিচিতি অংশে প্রধানত নববিধান-মণ্ডলীভুক্ত একাধিক ব্যক্তিবর্গের পরিচয় আমরা দিতে পারিনি। এ-ছাড়া কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিদের পরিচয় নতুন করে দিইনি। বাংলা বইয়ের পাঠক এবং উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, এ-সব মনীষীর নাম ও পরিচয় তাঁরা জানেন।

পরিশেষে শ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকা সুতপা ভট্টাচার্যকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর লেখা সুচিন্তিত মুখবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত এই বইয়ের অন্যতম সম্পদ।

সূচি

জীবনস্মৃতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্ম ও শৈশব

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর, বাঙ্গলা ৯ই পৌষ তারিখে, ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর, সোহাগদল নামক গ্রামে, মাতুলালয়ে আমার জন্ম হয়। আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় জগবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায়, মাতৃদেবী স্বর্গীয়া নিত্যকালী গঙ্গোপাধ্যায়; পিতামহ ৺শিবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পিতামহী ৺শিবসুন্দরী দেবী। মাতৃকুলে, মাতামহ ৺গঙ্গাপতি মুখুটী, মাতামহী ৺উমাসুন্দরী দেবী। আমার পিত্রালয় বিক্রমপুর, মাইজপাড়া গ্রামে। আমার পিতামহ মাইজপাড়া গ্রামের বিখ্যাত জমিদার রায়বাড়ীর ভাগিনেয় ছিলেন। আমার প্রপিতামহ রামনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার বৈদ্যনাথ রায় মহাশয়ের কন্যা শচীপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের দুই সন্তান,— আমাদের পিতামহ শিবচন্দ্র ও তাঁহার ভগিনী গৌরী দেবী। আমার পিতামহের পাঁচ পুত্র— প্রথম পক্ষের কাশীচন্দ্র, এবং দ্বিতীয় পক্ষের ঈশ্বরচন্দ্র, জগবন্ধু, বিশ্বেশ্বর, চন্দ্রকিশোর এবং দুই কন্যা — কালীতারা এবং জগৎতারা। আমার প্রপিতামহী শচীপ্রিয়া দেবীরা চার ভগিনী ছিলেন। তাঁহাদেরই বংশধর নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়[১], অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়[২] (আমাদের অঘোরদাদা, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর পিতা), শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ইত্যাদি।

রায় পরিবার কুলীন ছিলেন না; তাঁহারা কন্যাকে কুলীন পাত্রস্থ করিয়া কুলীন স্থাপিত করেন। মাইজপাড়া গ্রাম আমার পিতার যৌবনাবস্থায় অত্যন্ত কুসংস্কারাপন্ন ছিল। তজ্জন্য আমার পিতৃদেব আমার মাতৃদেবীকে অতি কম সময়েই স্বীয় গ্রামে লইয়া যাইতেন। মাতৃদেবীর পিত্রালয়ে, সোহাগদল গ্রামেই মাতৃদেবী বেশী সময় থাকিতেন। তাঁহার চারিটি সন্তান জন্মে সকলেরই জন্মস্থান সেই পদ্মাতীরস্থ প্রিয় সোহাগদল গ্রাম। ষোল বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম গোবিন্দবন্ধু রাখা হয়। তাহার পরে আরও একটি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া অতি অল্পকাল জীবিত থাকে। তৎপরে আমার জন্ম। আমার পূর্ব্বের ভাইটির অতি অল্প আয়ু হওয়াতে আমার জন্মের পূর্ব্বে ও জন্মের সময়ে মাতৃদেবীকে অনেক কঠোর নিয়ম পালন করিতে হইয়াছিল। আমার পরে আমার ভগ্নী বগলাসুন্দরীর জন্ম হয়।

সোনাদিদি

আমার মাতামহীরা তিন ভগিনী ছিলেন,— জাহ্নবী দেবী, উমাসুন্দরী দেবী (আমার মাতামহী) এবং জানকী দেবী। আমার জন্ম ও জীবনের সহিত আমার মাতার ছোট মাসীমাতা স্বর্গীয়া জানকী দেবী বিশেষভাবে জড়িতা। তিনি আমার মাতৃতুল্যা ছিলেন, এমন কি মাতার অধিক বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমার জন্মে আমার মাতৃদেবীকে অনেক কঠোর নিয়ম পালন করিতে হইয়াছিল। আমার পরম পূজনীয়া মাতৃসমা জানকী দেবীও আমার জন্য সেই সময়ে অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। মাতৃদেবীর চিকিৎসক আদেশ করিয়াছিলেন

যে, আমাকে জন্মের পরে ছয়দিন অবধি যেন বিছানায় না শোয়ানো হয়। জানকী দেবী (তাঁহাকে আমি সোনাদিদি বলিয়া ডাকিতাম), তাঁহার স্নানাহার ও আহ্নিকের সময়টুকু ব্যতীত দিবারাত্র আমাকে কোলে করিয়া রাখিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, ছয়দিনের পরে যখন আমাকে কোল হইতে নামান হইল, তখন আমি বিছানায় শুইতে প্রথমতঃ কিছুতেই রাজী হই নাই। এই যে তিনি আমাকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন, আজীবন তিনি আমাকে তাঁহার বুকভরা স্নেহ দিয়াছেন ও আমার জন্য এত ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমার লেখনী বর্ণনা করিতে অক্ষম। এমন দেবী বুঝি পৃথিবীতে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই।

এস্থানে তাঁহার বিষয় আরও একটু কথা না লিখিয়া পারি না। জানকী দেবী ষোল বৎসর বয়সে একটি পুত্র-সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়া বিধবা হয়েন। তদবধি আমার মাতামহ ও মাতামহী তাঁহাকে কন্যাসম পালন করেন। ইনি কিরূপ সেবাপরায়ণা ছিলেন তাহা বুঝাইবার ক্ষমতা আমার নাই। আত্মপর প্রভেদ জ্ঞান ইঁহার ছিল না; সকলের সেবা করিয়া ইনি সুখী হইতেন। এমন কি বাড়ীতে মুটে-মজুরটি পর্য্যন্ত আসিলে তাহাদের সেবা করিতে ক্ষান্ত হইতেন না। আমার যখন ছয় সাত বৎসর আন্দাজ বয়স, সেই সময় চূড়ামণি যোগে দাদামহাশয় ও আমার প্রাণসমা সোনাদিদির সহিত কলিকাতায় গঙ্গাস্নানে আসি। আমার পিতামাতা, দাদা ও ছোট ভগিনী বগলা বাড়ীতে রহিলেন। আমি সোনাদিদিকে ছাড়িয়া একদিনও থাকিতে পারিতাম না। কোনও কার্য্যোপলক্ষে যদি তিনি একদিনের জন্যও আমাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইয়া থাকিতেন, আমি মাতার ক্রোড়ে শুইয়াও তাঁহার জন্য কাঁদিয়া অস্থির হইতাম। অতএব আমাকে না লইয়া সোনাদিদি গঙ্গাস্নানে আসিতে পারিলেন না।

তখন কলিকাতা আসা বড়ই কষ্টসাধ্য ছিল। কালীঘাটে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া আমরা একমাস গঙ্গাবাস করি। প্রতিদিন প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া দাদামশায় আহ্নিকাদি সমাপনান্তে গঙ্গাস্নানে যাইতেন; আমিও তাঁহার সহিত যাইয়া প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিতাম। এক দিবস দাদামহাশয় আহ্নিক করিতে বসিয়াছেন, আমার মনে হইল দাদামহাশয়ের আহ্নিক শেষ হইয়াছে, এক্ষণই তিনি গঙ্গাস্নানে যাইবেন। এই মনে করিয়া একাকীই গঙ্গার দিকে ছুটিলাম আমার বিশ্বাস ছিল, দাদামহাশয় আমার পশ্চাতে আসিতেছেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাঁহার তখনও আহ্নিক ক্রিয়া সমাপ্ত হয় নাই। ঘাটে পৌঁছিয়া আমি একেবারে জলে নামিয়া ডুব দিলাম। কিন্তু পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম দাদামহাশয় নাই। আমি তখন হতভম্ব হইয়া জলে দাঁড়াইয়া শীতে কাঁপিতে লাগিলাম। একে মাঘ মাস, তাহাতে প্রত্যুষে গঙ্গার জল, কত শীতল সহজেই অনুমেয়, সর্ব্বোপরি দাদামহাশয় সঙ্গে আসেন নাই। আমি একেবারে অসাড় হইয়া জলে দাঁড়াইয়া রহিলাম। উঠিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইব, তেমন শক্তি আমার ছিল না। গঙ্গার ঘাটে একখানি নৌকা বাঁধা ছিল। নৌকার একটি ভদ্রলোক আমাকে এইরূপ বিপন্ন দেখিয়া তাঁহাদের নৌকায় তুলিয়া লইলেন, এবং আর্দ্র বস্ত্র ছাড়াইয়া আমাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া রহিলেন।

অন্যদিকে, দাদামহাশয় আহ্নিক সমাপ্ত করিয়া আমাকে গঙ্গাস্নানে যাইবার জন্য ডাকিলেন। আমার কোন সাড়া না পাইয়া তিনি ভাবিলেন, আমি সোনাদিদির নিকট রহিয়াছি। যখন জানিতে পারিলেন যে আমি সোনাদিদির নিকটেও নাই, তখন ভীত হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে গঙ্গার দিকে ছুটিলেন। যে ভদ্রলোকটি আমায় নৌকায় তুলিয়া লইয়াছিলেন, তিনি দাদামহাশয়কে দেখিতে পাইয়াই বুঝিলেন যে ইঁহাদেরই কন্যা হারাইয়াছে। তিনি দাদামহাশয়কে নৌকা হইতে

ডাকিলেন। তখন দাদামহাশয়ের কত আনন্দ! আমারই বা কত আনন্দ; আমি এতক্ষণ কোন কান্নাকাটি করি নাই; কিন্তু যেই দাদামহাশয়কে দেখা, অমনি কাঁদিয়া আকুল হইলাম। সেই ভদ্রলোকটি তখন দাদামহাশয়ের নিকট আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যখন জানিতে পারিলেন যে আমি কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা, তখন আমার সেবা করিয়া তিনি কৃতার্থ হইয়াছেন মনে করিলেন। তৎকালীন কৌলীন্য প্রথা কিরূপ ছিল তাহা অনেকেই জানেন। যাঁহারা অকুলীন তাঁহারা কুলীনদের সেবা করা ধর্ম্মকর্ম্ম মনে করিতেন। যাহা হউক, সেই ভদ্রলোকটি চূড়ামণি যোগের দিনে কুলীন কুমারী পূজা করিতে ইচ্ছা করেন, দাদামহাশয়কে এরূপ জানাইলেন। কুলীন কুমারী পূজা করা সেকালে মহাধর্ম্মকার্য্য বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু দাদামহাশয় আমার পূজা করিতে দিতে স্বীকৃত হইলেন না। এইরূপ পূজা করা তিনি দোষণীয় মনে করিতেন। কাজেই, যোগের দিনে সেই ভদ্রলোকটি আমাকে শাঁখা, সাড়ী ও মিষ্টান্ন দান করিয়া কথঞ্চিৎ ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়াছেন ভাবিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। ... তিনি যাহাই করুন, বিপদের সময় তিনি আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই মাঘ মাসের শীতে, অপরিচিত লোকটি আমাকে শুষ্ক বস্ত্র পরাইয়া ক্রোড়ে বসাইয়া আমার অভিভাবকের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া আজিও কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয় ভরিয়া যায়।

পিতৃবিয়োগ

আমার গঙ্গাস্নানের পর বাড়ী ফিরিবার আট নয় মাস কাল পরেই আমার পিতৃবিয়োগ হয়। এখনও আমার স্মরণ আছে, পিতৃদেব যখন রোগশয্যায় শায়িত, আমার জননী দেবী অনেক সময়ই আমাকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন। আমি তখন পিতার অসুস্থতার বিষয় কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু অতি শান্ত ধীরভাবে মাতৃক্রোড়ে বসিয়া পিতাকে দেখিতাম। আমার ছোট ভগিনী বগলা তখন হামাগুড়ি দেয় মাত্র। তাহাকে পিতার ঘরে কম সময়ই নেওয়া হইত। তাহার কারণ সে হামাগুড়ি দিয়া অনেক সময়ই পিতার ঔষধপত্র ফেলিয়া দিত, অথবা কান্নাকাটি করিত। শিশু বালিকা কি জানিত যে সে অচিরেই পিতৃহীনা হইবে? এই সময়ে আমার দাদামহাশয়কে কোনও দূরবর্ত্তী গ্রামে দুর্গাপূজা করিতে যাইতে হইয়াছিল। দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া একাদশীর দিন তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসেন। তাঁহার নাড়ীজ্ঞান অত্যন্ত প্রখর ছিল। বাড়ী আসিয়াই পিতৃদেবের হাত ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া কপালে করাঘাত করিলেন। একটি প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াই আর একটি প্রাণপ্রতিমকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। দ্বাদশীর দিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার পিতৃদেব স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন।

আমার ঠাকুরমাতা (পিতামহী) ও পিসীমাতা আমার পিতৃদেবের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়াই আমার মাতুলালয়ে আসিয়াছিলেন। অদ্যাবধি আমার স্মরণ আছে, আমার পিতৃদেবের মৃতদেহ যখন প্রাঙ্গণে বাহির করিয়া শায়িত করান হইয়াছিল, আমার ঠাকুরমা তাঁহার মুখের উপর পড়িয়া কি মর্ম্মন্তুদ ক্রন্দন করেন! আমার পিসীমাতা এবং অন্যান্য সকলেই লুটাইয়া কাঁদিতেছিলেন, কিন্তু আমার মাতৃদেবী স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন। কেবল অঙ্গের অলঙ্কারভার উন্মোচন করিয়া চতুর্দ্দিকে ফেলিয়া দিলেন। জনৈক প্রতিবেশিনী তাহা এক এক করিয়া কুড়াইয়া লইলেন। দাদাও কাঁদিয়া আকুল হইতেছিলেন; কিন্তু মৃত্যু কি, আমি তখন বুঝিতাম না। দাদা

কাঁদিতেছেন, অতএব আমাকেও কাঁদিতে হইবে, তজ্জন্য কাঁদিতে চেষ্টা করিলাম মাত্র। হায়! তখন বুঝিতে পারি নাই যে পিতাকে চিরকালের জন্য হারাইলাম।

পিতা নারায়ণগঞ্জে 'টমাস' নামক জনৈক সাহেব সওদাগরের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। সওদাগরের কার্য্যে প্রভূত উপরি উপার্জ্জনের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তিনি কখনই সেই বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া উচিত বিবেচনা করেন নাই। এইজন্য তিনি সাহেবের অতিশয় বিশ্বস্ত ও প্রিয়পাত্র ছিলেন।

আমার পিতৃদেব ঘোর কুসংস্কারাপন্ন দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবান্ দয়া করিয়া তাঁহার হৃদয় জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন। কুলীন ব্রাহ্মণ হইলেও তিনি বহু-বিবাহকে পাপকার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। মৃত্যু সময়ে তিনি মাতৃদেবীকে বলিয়া গিয়াছিলেন, "কন্যাদের লেখাপড়া শিখাইও ও বড় করিয়া বিবাহ দিও।"

মাতৃদেবী লেখাপড়া শিখিয়া তাঁহার নিকট চিঠিপত্র লিখেন, ইহা তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল। তিনি বাড়ী হইতে ঢাকা যাইবার সময় আমার মাতুল কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের[২] নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, এক মাসের মধ্যে আমার মাতৃদেবীকে লিখিতে শিখাইয়া যদি তাঁহার নিকট পত্র লিখাইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি আমার মাতুল মহাশয়কে বিশেষ পুরস্কার দিবেন। আমার মাতুল মহাশয় অ, আ, ক, খ, হইতে শিখাইতে আরম্ভ করিয়া এক মাসের মধ্যে আমার মাকে দিয়া বাবার নিকট পত্র লিখাইয়াছিলেন। তাহাতে বাবা কিরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। আমার পিতৃদেব যদি আরও কিছুকাল জীবিত থাকিতেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া দীক্ষিত হইতেন। আমার স্বর্গস্থিত পিতৃদেবের আশীর্বাদেই মাতৃদেবী ভগবানের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক অসীম সাহসে হিন্দুসমাজের কুসংস্কারের জাল ভেদ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ-তরণীতে তিনটি অপোগণ্ড শিশু লইয়া ভাসিতে পারিয়াছিলেন।

পিতৃবিয়োগের পরেও আমার মাতৃদেবী মাতামহের আলয়েই বাস করিতে লাগিলেন। পিতার আদেশ ঐরূপই ছিল; কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার পিতার নিবাসগ্রাম তখন ঘোর কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। মাতৃদেবীকে তিনি সেখানে খুব কম সময়ই রাখিতেন। এখন আমার মাতৃদেবী তিনটি শিশু সন্তান লইয়া নিজ পিত্রালয়ে পিতামাতা, মামীমাতা, ভ্রাতা, ভগিনী ও অন্যান্য পরিজনের আদর যত্নে বাস করিতে লাগিলেন। আমরা তিনটি ভ্রাতা ভগিনী মাতুলালয়ে সকলের অতি স্নেহের ধন। কিন্তু মাতৃদেবীর শূন্য হৃদয়ের ক্ষুদ্রতম অংশও যেন এত সযত্ন আদর শান্তিপূর্ণ করিতে সমর্থ হইল না। তাঁহার অতি কোমল স্থানে অতি কঠিন আঘাত লাগিয়াছে। সেই মহা-মিলনদিনের পূর্ব্বে তাহা কিরূপে সারিবে?

শিক্ষারম্ভ

পিতৃদেব একটি পুত্র-সন্তান ও দুইটি কন্যার ভার মাতার স্কন্ধে রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে এই সন্তানদের কিরূপে মানুষ করিবেন ইহাই মাতার প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। মাতৃদেবী দাদাকে (গোবিন্দবন্ধু) সোহাগদল গ্রাম হইতে দূরের এক লৌহজঙ্গের স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দিলেন। আমার এক মাতুল ও আমার দাদা স্নানাহার অতি শীঘ্র সমাধা করিয়া স্কুলে যাইতেন। সেকালে সর্ব্বত্র ঘড়ি থাকিত না, কাজেই তাঁহারা সময় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য

একটি সঙ্কেতচিহ্ন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্কুলে রওনা হইবার সময়ে কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে যতদূর রৌদ্র আসিত, তথায় একটি কাঠি পুঁতিয়া রাখিতেন। সেই দিবস স্কুলে পৌঁছাইয়া ঘড়ি দেখিতেন। যদি ঠিক সময়ে পৌঁছাইতেন তাহা হইলে সেই স্থানেই কাষ্ঠখণ্ড পোঁতা থাকিত, অন্যথা কাষ্ঠখণ্ড সরাইয়া সময় অনুযায়ী পুঁতিয়া রাখিতেন। তখন বালকগণ কত কষ্ট করিয়া লেখাপড়া শিখিতেন, এখন তাহা ভাবিলেও অবাক হইতে হয়।

দাদা কত কষ্ট করিয়া এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে ঢাকা গিয়াছিলেন, তাহা এখনকার দিনে আশ্চর্য্য মনে হয়। সেই সোহাগদল গ্রাম হইতে ঢাকা সহরে হাঁটিয়া যাওয়া কত যে কষ্টকর, তাহা একালের লোকেরা হয়ত কল্পনাই করিতে সক্ষম হইবে না! তৎকালে পদব্রজে যাওয়া ছাড়া কোন উপায়ই ছিল না। অবশ্য বর্ষার সময়ে নৌকাযোগে লোক যাতায়াত করিত, কিন্তু জল শুকাইয়া গেলে হাঁটা ব্যতীত কোন উপায়ই ছিল না। এখনকার যুবকদের মোটর, বাস, ট্রাম ইত্যাদি ভিন্ন চলে না। দাদা সেই চৈত্রমাসের প্রখর রৌদ্রে মাঠের পর মাঠ চলিতে চলিতে ক্ষুৎপিপাসায় একেবারে অবসন্ন হইয়া আর চলিতে অক্ষম হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি নিজের মনে বলিতেছিলেন, "হায়! আমাদের বাড়ীতে এসময় কত লোক আহার করিতেছে, আর এই প্রান্তরমধ্যে রৌদ্রতাপে ও অনাহারে আমি প্রাণ হারাইতে বসিয়াছি।" ঘটনাক্রমে মাইজপাড়া রায়ের বাড়ীর একজন দাসী সেই সময়ে সেই মাঠ দিয়া যাইতেছিল। দাদার কাতর কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আমাদের ছেলে এই মাঠের মাঝখানে কেন?" পুষ্পদাসীকে দেখিয়া (পুষ্পের ডাকনাম ছিল পুষ্পি) দাদা বলিলেন, "পুষ্পি, তুই এখানে কেমন করিয়া আসিলি? আমাকে কিছু খেতে দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচা।" পুষ্পি তখন গ্রামের এক ব্রাহ্মণবাড়ী দাদাকে লইয়া গিয়া তাহাদের বলিল, "তোমাদের ঘরে যা' থাকে আমাদের ছেলেকে খেতে দাও; ক্ষিদে-তেষ্টায় ইনি অত্যন্ত কাতর হয়েছেন।" গ্রামের গৃহস্থ ঘরে অন্ন ব্যঞ্জন উদ্বৃত্ত হইলে তাহারা কখনও তাহা নষ্ট করে না, সযত্নে তুলিয়া রাখিয়া দেয়। ইঁহারাও আহারান্তে যে অন্ন উদ্বৃত্ত হইয়াছিল, তাহা জল দিয়া পরিষ্টি করিয়া রাখিয়াছিলেন। খানিকটা ভাজা মাছ ও কচি আমের অম্বল ছিল; তাঁহারা দাদাকে তাহাই খাইতে দিলেন। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর দাদার সেই পরষ্টি ভাত অতি উপাদেয় লাগিল। পরিতোষের সহিত আহার করিয়া, অল্প বিশ্রামান্তে, পুনরায় ঢাকাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। ... পুষ্পির সহিত যদি দাদার না সাক্ষাৎ হইত, তাহা হইলে তাঁহার কি অবস্থা হইত, তাহা ভাবিতেও শরীর কন্টকিত হইয়া উঠে। দাদার প্রাণরক্ষা করিবার জন্যই যেন ভগবান পুষ্পিকে সেইদিন সেই মাঠে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আজকাল ভৃত্যেরা অদ্য আছে ত' কল্য নাই। সে'কালে তদ্রূপ ছিল না। ভৃত্য ও দাসীরা পরিবারেরই এক একজন হইয়া চিরকাল থাকিত। বাড়ীর ছেলেমেয়েরা তাহাদের আপনার জন বলিয়াই জানিত। সেই অসময়ে দাদা পুষ্পিকে পাইয়া একজন আপনার জনকেই পাইয়াছিলেন। হায়! সেকাল গিয়াছে।

সোহাগদল গ্রামে সেই সময়ে ছেলেদের অথবা মেয়েদের শিক্ষা প্রদানের কোনরূপ বন্দোবস্ত ছিল না। আমার মাতুল (সোনাদিদির পুত্র) কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়, তদ্‌বন্ধু হরিমোহন দত্ত মহাশয় এবং আরও দুই একজন গ্রামের ভদ্রলোক দু-চারিটি বালিকা সংগ্রহ করিয়া একটি পাঠশালা খুলিলেন। সর্ব্বপ্রথমে আমাদের বাড়ীর প্রাঙ্গণে দর্‌মা পাতিয়া আমরা কয়েকটি

মেয়ে বসিয়া প্রভাতে কলাপাতায় অ, আ, ক, খ, লিখিতাম। তৎপরে আমাদের বহির্বাটীতে একটি আটচালা গৃহ প্রস্তুত হইল। তাহাতে টেবিল, বেঞ্চ ও চেয়ার ইত্যাদির দ্বারা রীতিমত স্কুলগৃহ সজ্জিত হইল। এই স্কুলে প্রভাতে মেয়েদের ক্লাস হইত, এবং দশটার পরে বালকদিগের স্কুল হইত। কিন্তু দেশের 'কুসংস্কার' ত মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা দেশকে 'উচ্ছন্নে যাইতে' দিতে পারে না। কাজেই মেয়েদের স্কুলে পড়া লইয়া গ্রামে হুলস্থূল বাঁধিয়া গেল। কেহ বলিতে লাগিলেন, "মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হইবে"। কেহ বা বলিলেন, "মেয়েরা লেখাপড়া শিখিয়া কি চাকরী করিবে?" গোলযোগ গুরুতর হইতে লাগিল বটে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ছোট্ট স্কুলঘরে তাহার কোন সাড়া আসিয়া পৌঁছিল না। একদিকে বচনবাগীশদিগের বচনের প্রকটতা যেমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অপরদিকে দুই একটি করিয়া বালিকার সংখ্যা বর্দ্ধিতই হইতে লাগিল।

একবার মুন্সিগঞ্জের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্য স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিলেন। তিনি বালিকাদ্গিকে পরীক্ষা করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। বিশেষ করিয়া আমাকে ১০্ দশ টাকা পুরস্কার দিবেন এই অঙ্গীকার করিলেন। তাঁহার সঙ্গে তখন টাকা ছিল না। 'বোটে' (boatএ) যাইয়া তিনি চাপরাশীর হাতে টাকা পাঠান, এবং বলিয়া দেন, যে বালিকা পুরস্কারের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তাহাকে ডাকিয়া যেন তাহারই হাতে টাকা দিয়া আইসে। অন্য একবার স্বর্গীয় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (যাঁহার নাম "অবলা-বান্ধব" রাখা হইয়াছিল) আমাদের গ্রামে আসিয়া আমাদের গ্রামের স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ করেন। তাঁহার মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতায় আমরা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছিলাম।

স্কুলের জনৈক ছাত্রী সম্বন্ধে একটি হাস্যস্কর ব্যাপার আজিও মনে পড়ে। একদিন স্কুলে অনুপস্থিত হওয়াতে শিক্ষক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল স্কুলে আস নাই কেন?" তাহাতে সেই বালিকা উত্তর করিল, "আমি আমার বাবার সঙ্গে দই দিয়ে ভাত খেয়েছিলাম, তাই স্কুলে আস্‌তে পারি নাই।" আমরা ত হাসিয়াই বাঁচি না। এইরূপ হাস্যস্কর উক্তি অনেক হইত।

কবিরাজ রাজমোহন সেন

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, আমাদের আটচালা স্কুলঘরটিতে বালকদেরও ক্লাস হইত। ক্রমে আমাদের বাড়ীতে দূর গ্রাম হইতে অনেক বালক আসিয়া থাকিতে লাগিল এবং স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করিল। রাজমোহন সেন নামক বিক্রমপুরস্থ একজন ডাক্তার (তিনি কবিরাজী ঔষধও দিতেন) আমাদের বাড়ীতে ডিস্পেন্সারী (dispensary) খুলিলেন। তিনি আমাদের বাড়ীতে থাকিয়া ডাক্তারী করিতে লাগিলেন। তিনি ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন এবং সেকালের ব্রাহ্মসমাজের 'তত্ত্ববোধিনী', 'অবলাবান্ধব' ইত্যাদি পত্রিকা আমাদের বাটীতে লইয়া যাইতেন। ক্রমশঃ আমার মাতুল ৺কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক ও পত্রিকা পাঠ করিয়া ব্রাহ্মভাবাপন্ন হইলেন। তিনি নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনায় মনোনিবেশ করিলেন। আমার মাতৃদেবীও তাঁহার সহিত পৌত্তলিক ধর্ম্মে অবিশ্বাসিনী হইয়া সনাতন সত্যধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্টা হইলেন। তিনি লুকাইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু তখনও প্রকাশ্যে শিবপূজা ছাড়িতে

মাঘমণ্ডল ব্রত

বাল্যকালে আমার পরম পূজনীয়া সোনাদিদি আমাকে দিয়া অনেক ব্রত নিয়ম করাইতেন। তখন আমি মাঘমণ্ডল, যম-পুকুর, মঙ্গলচণ্ডী ইত্যাদি ব্রত করিয়াছি। মাঘমণ্ডল ব্রতে সম্পূর্ণ মাঘ মাস প্রতি দিবস অতি প্রত্যুষে উঠিয়া পুষ্করিণীর ধারে উপবেশন করিয়া মন্ত্র পড়িতে হয়। পূর্ব্বকার দিন বৈকালে একখানি কাষ্ঠখণ্ডের উপর একটি মৃত্তিকার স্তূপ করিয়া তাহাতে ফুল দিয়া সাজাইতে হয়। ঐ স্তূপের নাম 'লাল' অর্থাৎ সূর্য্য। ছয় সাত হইতে নয় দশ বৎসর বয়স্কা বালিকারা সূর্য্য উঠিবার পূর্ব্বে দুরন্ত মাঘ মাসের শীতে শয্যাত্যাগ করিয়া পুকুরধারে যাইয়া বসে এবং সূর্য্যদেবকে উঠিতে অনুরোধ করে। তাহারা সেই লালটি সঙ্গে করিয়া পুকুরধারে লইয়া যায়, ও এইরূপ কয়েকটি মন্ত্র পড়িতে থাকে;

-- উঠ উঠ সূর্য্যঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া,
না উঠিতে পারি মোরা হিয়ণের [১] লাগিয়া;
হিয়ণের পঞ্চবটি শিয়রে থুইয়া
সূর্য্য উঠিবেন কোনখান দিয়া?
ব্রাহ্মণবাড়ীর ঘাটা দিয়া।
বামনদের মাইয়াটি [২] বড় সেয়ানা
পৈতা ধোয় বেহান বেহান [৩] ...
পৈতার কচ্‌লানো পানি পুকুরেতে ভাসে
তাই দেখে নাইকানী [৪] খিল্‌খিলিয়ে হাসে;
যা, যা, নাইকানী, তুই আমার সই,
মাঘমণ্ডলের ব্রত কর্‌তে ঘাট্ পাব কই—?

এইরূপে কয়েকটি মন্ত্র বলা হয়। তাহার অর্থ এই যে,— ব্রাহ্মণবাড়ীর ঘাটে পূজা করা হইল না; কারণ, তাহারা অতি প্রত্যূষে পৈতা ধুইয়া জল অপরিষ্কার করিয়াছে। এক্ষণে অন্য কোন বাড়ীর ঘাটে পূজা করিতে যাইতে হইবে। ধোবাবাড়ীর ঘাটে যাওয়া গেল; তাহারাও প্রত্যূষে উঠিয়া কাপড় কাচিতে আসিয়াছে। তজ্জন্য জল অপরিষ্কার। এইরূপে যেন বালিকারা পুকুরের চতুষ্পার্শে ঘুরিতেছে, এবং যথায় পরিষ্কার জল দেখিতে পাইতেছে, সেইস্থানে বসিয়া সূর্য্যের পূজা করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু মেয়েরা আপন বাড়ীর ঘাটেই একখানি চট্ পাতিয়া বসিয়া ঐরূপ মন্ত্র পাঠ করে। তৎপরে ফুল দিয়া সূর্য্যঠাকুরকে পূজা করে।

বালিকারা অনেক রকমের ব্রত করে এবং অনেক রকমের মন্ত্র পাঠ করে। ইহারই অপর একটি মন্ত্র —

লালের কলাবাগানে কেরে কাটো পাতা?
লালের ছোট ভাই সিপাই কাটে পাতা
না কাটিও সিপাই গো! না কাটিও পাতা,
আমরা সাত বোনে কাটিব পাতা।
পাতা কেটে গো ভাত খাবো,
ভাত খেয়ে গো জিকুটী খেলাবো,
জিকুটী খেলিয়ে গো পাব টাকা —

১। হিয়ণ = হিম; ২। মাইয়াটি = মেয়েটি; ৩। বেহান = প্রত্যূষ; ৪। নাইকানী = ন্যাকা

তাই দিয়ে দিব আমরা লালের বৌকে শাঁখা।—

আর একটি মন্ত্র এইরূপ (এ সকল অবশ্যই অর্থহীন) —

আমের বোল আসেরে লোচা লোচা
বাবাকে দিব আমরা গরদের কোঁচা

ইহার অর্থ এই যে, এই ব্রত করিলে আমাদের এত সৌভাগ্য হইবে যে আমরা বাবাকে গরদের কোঁচা অর্থাৎ ধুতী দিব। বারম্বার প্রত্যেকের নাম করিয়া ঐরূপ মন্ত্র গানের মতন সুর করিয়া বলা হয়। পাঁচ বৎসর পরে আমার দাদামহাশয় আমাকে এই ব্রত প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন সচরাচর এই ব্রত কেহই প্রতিষ্ঠা করে না। আমার দাদামহাশয় বলিলেন, "এক, রাজা রাজবল্লভের স্ত্রী এই ব্রত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,আর তিনি তাঁহার আদরের নাতনীকে দিয়া অতি সমারোহের সহিত এই ব্রত প্রতিষ্ঠা করাইলেন।" সেই দিবস পুরোহিত আসিয়া সূর্য্যের পূজা করিয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষে দাদামহাশয় ঘটা করিয়া লোকজন নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। এই ব্রতের আর একটি কথা আছে;—

-- শিব জিজ্ঞাসা করিলেন গৌরীকে, "এই ব্রত করিলে কি ফল হয়?" উত্তর পাইলেন, "কার্ত্তিক গণেশ পুত্র পায়, লক্ষ্মী সরস্বতী কন্যা পায়, শঙ্কর হেন স্বামী পায়, জয়া বিজয়া দাসী পায়।"

অর্থাৎ মেয়েরা আশা করে তাহারা এই ব্রতের ফলে শিবের মতন স্বামী, কার্ত্তিক গণেশের মতন পুত্র, লক্ষ্মী সরস্বতীর মতন কন্যা ও জয়া বিজয়ার মতন দাসী পাইবে। এই ব্রতের আরও একটি মন্ত্র এই —

মাঘমণ্ডল, সোনার কুণ্ডল
সোনার কুণ্ডলে ঢাইলা নাড়ু
শাঁখার আগে সোনার খাড়ু,
চন্দন কাঠে রাঁধি
জিরা তুঁষ ফেকি,
এঘর থেকে ওঘরে যাই
মাটুর মুটুর গুয়া খাই।

সমস্তই গ্রাম্য সৌভাগ্যের কথা। — মেয়েরা এই ব্রতের ফলে শাঁখার আগায় সোনার বলয় পরিবে। শুধু সোনার বলয় পরাই তাহাদের একমাত্র অভিলাষ নহে, তাহারা 'শাঁখার আগায়' স্বর্ণ বলয় পরিতে চায়। কারণ, সধবা ব্যতীত কাহারও শাঁখা পরিবার অধিকার নাই; তাহারা চির-সধবা থাকিবার অভিলাষিনী। গ্রামের মেয়েরা যতই ধনীকন্যা অথবা ধনীজায়া হউক না কেন, তাহারা রন্ধন করিয়া পিতা, মাতা, স্বামী, পুত্র, আত্মীয়স্বজনকে আহার করাইতে ভালবাসে। এই ব্রতের ফলে তাহারা এতই সৌভাগ্যবতী হইবে যে, সেই রন্ধন তাহারা চন্দনকাষ্ঠ দ্বারা সম্পন্ন করিবে। গ্রামের মেয়েরা ধানের তুঁষ মাঝে মাঝে কাষ্ঠের জ্বালে উনানে ফেলিয়া দেয়, তাহাতে আগুণ দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠে। এই ব্রতে তাহারা এতই ধনী হইবার আশা করে যে ধানের তুঁষের পরিবর্ত্তে আগুনে জিরা ফেলিয়া রন্ধন করিবে। সুপারী খাওয়াও সধবাদিগের একটি সৌভাগ্য, তজ্জন্য —

এঘর থেকে ওঘরে যাই,
মাটুর মুটুর গুয়া খাই।

যম-পুকুর ব্রত

বাল্যকালে আরও একটি ব্রত করিয়াছি, তাহার নাম 'যম-পুকুর'। এই ব্রতের উদ্দেশ্য যমরাজার মা'কে তুষ্ট রাখার এবং পরলোকগত গুরুজনদের জল দান করা। বাড়ীর প্রাঙ্গণে একটি ছোট পুকুর কাটিতে হয়। সেই পুকুরধারে মাটি দিয়া কতকগুলি কাক, চিল, কচ্ছপ, কুমীর তৈয়ার করিয়া বসাইতে হয়। একটি বৃহদাকার পুতুল গড়িয়া তাহাকে 'যমরাজার মা' আখ্যা দেওয়া হয়। যমরাজার মাকেও পুকুরধারে বসান হয়। পুকুরটি জলপূর্ণ করিয়া ফুল দ্বারা সাজানো হয়, এবং পুকুরধারে ধান, মান ইত্যাদি কিছু কিছু গাছও লাগানো হয়। তৎপরে বালিকা বসিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করে। এই ব্রতও মাঘ মাসে করিতে হয়। কিন্তু খুব প্রত্যূষে নহে। ইহার কথা এইরূপ —

জনৈক বধূর শ্বাশুড়ী মৃতা হইলেন, তিনি কিছুতেই জল পান না, তৃষ্ণায় অস্থির। তাহার পুত্রকে তিনি স্বপ্নে বলিলেন, "তোমার স্ত্রী যদি যমপুকুর ব্রত না করে, তা' হইলে আমি জল পাইব না। আমার তৃষ্ণায় প্রাণ কণ্ঠাগত। তোমাকে নতুন পুষ্করিণী কাটিতে হইবে;সেই পুকুরের ধারে কাক, চিল ইত্যাদি বসাইয়া, ধান, মান, ইত্যাদি গাছ পুতিয়া তোমার বৌকে ব্রত করিতে হইবে, তাহা হইলে আমি জল পাইব।" সেই দিবস প্রভাতে মৃতার পুত্র অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া রহিলেন। স্ত্রী বিষণ্ণ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "তোমাকে যম-পুকুর ব্রত করিতে হইবে, নচেৎ আমার মা' জল পাইবেন না।" স্ত্রী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, —

--- তোমার মা'র ঠোকরের ঘায়ে মান তলায়
না পাইয়াছিলাম ঠাঁই
তোমার মা'র ঠোকরের ঘায়ে ধান তলায়
না পাইয়াছিলাম ঠাঁই। —

অর্থাৎ, শ্বাশুড়ীর জীবদ্দশায় বধূ যখন এই ব্রত করিতে যাইত, শ্বাশুড়ী তখন বাধা দিতেন। সেই পাপে এখন তিনি জল পাইতেছেন না। স্বামী অনেক কান্নাকাটী করিয়া স্ত্রীকে অবশেষে ব্রত করিতে রাজী করাইতে সমর্থ হইলেন। স্ত্রী ব্রত করিলেন, তথাপিও শ্বাশুড়ী জল পান না। তখন একদিবস স্বপ্নাদেশ হইল, "তোমাকে দুধ দিয়া পুকুর ভরিয়া দিতে হইবে ও তোমার কোলের ছেলে কাটিয়া পুকুরে রক্ত দিতে হইবে।" পুত্র তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। সেইদিনই শিশুর অন্নপ্রাশন। লোকজন নিমন্ত্রিত হইয়াছে;ছেলের মা রন্ধনে ব্যস্ত। বহুক্ষণ হইয়া গিয়াছে, ছেলেকে স্তন্যপান করান হয় নাই, বধূর স্তন্য দুধে ভারাক্রান্ত। তিনি বারম্বার দাসীকে বলিতেছেন, "দাসী, ডাবর আন হাত ধুই, ছেলে আনো দুধ দিই।" দাসী কোথা হইতে সন্তান আনিবে? তাহাকে ত' কাটিয়া পুকুরে রক্ত দেওয়া হইয়াছে, পুষ্করিণীও জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। দাসী উত্তর দিল, "আজ ছেলে মামার কোলে, দাদার কোলে, সকলের আদরে রহিয়াছে; এখন কি তা'কে দুধ দেবে?" তথাপিও মা'র প্রাণে প্রবোধ মানে না। তিনি বলিতেছেন —

"ডাবর আনো হাত ধুই,
ছেলে আনো দুই দিই।"

কিন্তু ছেলেকে আর কেহ আনিয়া দিল না। মাতা রন্ধনে ও লোকজন খাওয়াইতে ব্যস্ত রহিলেন। সকল কাজ সমাধা করিয়া তিনি পুকুরে গাত্র ধৌত করিতে গেলেন। ইতিমধ্যে তিনি সংবাদ পাইয়াছেন, নূতন পুষ্করিণী জলপূর্ণ হইয়াছে। পুকুরে অবগাহনার্থে নামিতেই তাঁহার

পায়ে কি ঠেকিল, — তখন চমকিত হইয়া দেখিলেন, যষ্ঠীঠাকরুণ তাঁহার কাটা সন্তান জুড়িয়া কোলে করিয়া বসিয়া আছেন। পুত্রের মা'র দুই গালে দুইটি ঠোনা মারিয়া যষ্ঠীঠাকরুণ বলিলেন, "এই নে তোর ছেলে। তুই আমার ভক্ত; তাই আমি তোর কাটা ছেলে বাঁচাইয়া কোলে লইয়া বসিয়া আছি। আমি কি আমার ভক্তের কষ্ট সহ্য করিতে পারি?" তখন জননী পুত্র ক্রোড়ে লইয়া জল হইতে উঠিলেন। সর্ব্বজন এই দৃশ্য অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইল। মা'ষষ্ঠীর কৃপায় শ্বাশুড়ীও জল পাইলেন, পুত্রও জীবিত হইল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানে কখনও বিশ্বাস হারাইও না; এবং মনে রাখিও, ভগবান সর্ব্বদা ভক্তের অধীন, ভক্তের কষ্ট তিনি কখনও সহ্য করিতে পারেন না।

বাল্যকালে কোন কোন ব্রতে উপবাসও করিয়াছি। সমস্ত দিবস উপবাসে থাকিয়া সন্ধ্যায় ব্রতের পূজা হইয়া গেলে জলগ্রহণ করিয়াছি। একদিন কোন এক ব্রতের আয়োজন হইতেছে, হঠাৎ আমাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জানি না কেন ইহার পূর্ব্বেই ঐ সকল ব্রতকর্ম্মে আমার আস্থা চলিয়া গিয়াছিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, ব্রত আর করিব না। ব্রতের সময়ে আমাদের বাটীসংলগ্ন জনৈক প্রতিবেশীর গৃহে একটি মাচানের উপর চড়িয়া লুকাইয়া রহিলাম। আমাকে খুঁজিয়া কেহ বাহির করিতে পারিতেছে না। আমি পরিষ্কার শুনিতে পাইতেছি, বাড়ীর লোকেরা আমায় ডাকাডাকি করিতেছে। স্থির করিলাম ব্রতের সময় অতিক্রম না করিলে বাড়ী ফিরিয়া যাইব না। তজ্জন্য যতই গালাগালি খাই সহ্য করিব। পৌত্তলিকতায় যখন আমার বিশ্বাস নাই, নিরাকার ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের অঙ্কুর দয়াময় ঈশ্বরই যখন আমার শিশুপ্রাণে বপন করিয়াছেন, তখন মিথ্যা অভিনয়ে প্রয়োজন কি? মাতুল কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় স্নানান্তে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন, আমি তাহা দেখিতাম। মাতৃদেবীরও যেন একটু ভাবান্তর হইয়াছে, তাহাও অনুভব করিতাম। মাতৃদেবী প্রকাশ্যে উপাসনা করিতে বসিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু কোনও নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ভগবানকে ডাকিতেন। স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, আমাকেও ভগবান সেইদিকেই টানিতেছেন। যাহা হউক, সেই দিবস ব্রতক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেলে বাড়ী ফিরিয়া গেলাম। গুরুজনদের ভর্ৎসনা কিছু কিছু শুনিতে হইল। তবে কিনা বাড়ীতে সকলেরই আমি আদরের পাত্রী ছিলাম। আমার গুরু অপরাধ সত্ত্বেও তাঁহারা লঘু ভর্ৎসনা করিলেন; আমি তাহার জন্য প্রস্তুতই ছিলাম।

লক্ষ্মীপূজার দিন আমাদের বাড়ীতে খুব ঘটা হইত। জাতি নির্ব্বিশেষে গ্রামের সমস্ত লোককে লক্ষ্মীর ভোগ প্রসাদ লইবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইত। প্রত্যেক ব্রাহ্মণবাড়ীতেই প্রসাদ বিতরণ করিত। কিন্তু জানি না কেন, অন্য সকল বাড়ী হইতে আমাদের বাড়ীতেই অধিক লোক হইত। আমার বিশ্বাস, দিদিমাতা ও মাতৃদেবীর রন্ধন-নৈপুণ্যের জন্যই আমাদের বাড়ীর লক্ষ্মীদেবীর ভোগ গ্রহণের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে সকলেই আসিতেন। আমি যখন নয় দশ বৎসরের বালিকা — একবার লক্ষ্মীপূজার ভোগ রান্নায় সাহায্য ও পরিবেশন করিয়াছিলাম। আমাদের পাড়ায় আমরা একঘরই ব্রাহ্মণ ছিলাম। লক্ষ্মীর ভোগের জল ও বাট্‌না পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতির লোক ছুঁইতে পারিত না। সেইবার কাজ করিবার লোক কম হইয়া পড়িয়াছিল। আমার বেশ স্মরণ আছে, আমি ছোট একটি কলসি লইয়া পুকুরঘাট হইতে জল আনা ইত্যাদি অনেক কাজ করিয়াছিলাম। লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিবস রাত্রিতে চন্দ্রালোকে যখন সমস্ত প্রাঙ্গণ জুড়িয়া সকলে আহার করিতে বসিল, সে কি সুন্দর দৃশ্য! পরিবেশন করিতে

করিতে যখন হস্ত প্রক্ষালন করিতে একবার একাকিনী পুকুর-ঘাটে গিয়াছিলাম, তখন আমার মনে একটু গর্ব্ব উপস্থিত হইয়াছিল। আমি যেন মস্তবড় সাহসের কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছি। পুকুরঘাটের পথটিতে গাছের পাতার ভিতর দিয়া চাঁদের আলো পড়াতে অতি চমৎকার দেখাইতেছিল। সেই দৃশ্য আজিও নয়নে সজাগ রহিয়াছে।

লক্ষ্মীপূজা সংক্রান্ত আমাদের দেশের একটি সুন্দর নিয়মের কথা না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। দুর্গাপূজার পরের লক্ষ্মীপূজাকে কোজাগর লক্ষ্মীপূজা বলে। কোজাগর লক্ষ্মীপূজার পর দিবস হইতে একমাস পর্য্যন্ত প্রত্যেক বাড়ীতেই যথেষ্ট পরিমাণে জলখাবার প্রস্তুত রাখিতে হয়। যিনি যখনই কাহারো বাটীতে বেড়াইতে যাইবেন, তাঁহাকে নারিকেলের নাড়ু, ইত্যাদি মিষ্টান্নাদি খাইতে দিতে হইবে। এই নিয়ম ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য সকল জলচল বাড়ীতেই চলিত আছে। নিয়মটি বড়ই চমৎকার। ইহাতে প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের সৌহার্দ্দ্যের আদান প্রদান হইত।

জাতিরক্ষা ও মিথ্যা চাতুর্য্য

পৌত্তলিকতায় আস্থা না থাকার আরও একটি কারণ, ভণ্ডামির প্রতি বিদ্বেষ ও অনাস্থা। চাতুর্য্যের উপর যে ধর্ম্মের স্থিতি নির্ভর করে, মূল্য নিরূপণে তাহার স্থান খুঁজিয়া বাহির করা শক্ত নহে। সে ধর্ম্ম স্বর্গের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয় না, কুয়াসায় আচ্ছন্ন করে। যাহা বলিতেছিলাম, — আমার এক কায়স্থ বন্ধুর কাকা তাঁহার একজন বিদেশী বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। যাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তিনি জাতিতে বৈদ্য। সেকালের জাতিভেদ প্রথা কিরূপ ছিল, সকলেই অবগত আছেন। বৈদ্যজাতিরা কায়স্থের অন্নগ্রহণ করিতেন না।

তাঁহারা আমাকে ডাকিয়া লইয়া উনানের নিকট বসাইলেন, কিছু আমার দ্বারা রন্ধন করাইলেন, বাকী সমস্ত রান্না ও পিষ্টকাদি তাঁহারা নিজেরাই প্রস্তুত করিলেন। নয় দশ বৎসর বয়স্কা বালিকা আমি — তত রান্না ও মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করা তএকাকী আমার দ্বারা সম্ভবপর নহে — বয়স্কারাও অত বিভিন্ন প্রকারের জিনিষ অন্যের সাহায্য ব্যতীত একাকী প্রস্তুত করিতে পারেন না। যাহা হউক, সেই বৈদ্য ভদ্রলোক আহার করিতে বসিলেন। আমি একাকীই সমস্ত পরিবেশন করিলাম, কারণ কায়স্থবাড়ীর মেয়েরা ত তাহা স্পর্শ করিতে পারেন না। আমার পরিবেশন কালে তাঁহারা আমার বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এইটুকু বালিকা এত প্রকারের রন্ধন করিয়াছে, শ্রবণ করিয়া সেই বৈদ্য ভদ্রলোকটি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, রান্নার প্রশংসাও করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা, তজ্জন্য এত অল্প বয়সেই রন্ধনে সিদ্ধহস্তা। আমি কিন্তু এ সকল কথা শুনিয়া মনে মনে হাসিলাম, কিঞ্চিৎ অস্বস্তিও বোধ করিতে লাগিলাম। কারণ আমি সত্য সত্যই সবগুলি জিনিষ রন্ধন করি নাই। বাড়ীর লোকেরাও করিয়াছেন। অবশ্য আমি উপলক্ষ্য মাত্র। তাঁহারা কায়স্থ জাতি হইয়া বৈদ্য জাতিকে রাঁধিয়া খাওয়াইলেন। যদি ভাল করিয়া চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে সত্যই কি তাঁহারা অন্তরে অন্তরে জাতিভেদে আস্থা রাখিতেন? সেরূপ বিশ্বাস থাকিলে তাঁহারা কখনই তাঁহাদের তৈয়ারী জিনিষ বৈদ্য ভদ্রলোকটিকে খাওয়াইতে পারিতেন না। জাতি বৈষম্য তাঁহারা বাহিরেই বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেন, অন্তরের দ্বারা নহে। যাহা সত্য তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবেই।

দুইটি বাল্যবন্ধু

আমার দুইটি বাল্যসখী ছিল। একজন শিবসুন্দরী বক্সী, অপরজন হরকামিনী দত্ত। তাহাদের সহিত আমি খেলা করিতাম, ও তাহাদের অত্যন্ত ভালবাসিতাম। তাহারাও আমাকে বড় ভালবাসিত। আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, তাহারা ছিল কায়স্থ। ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহাদের সহিত একত্রে আহার করিতে পারিতাম না। অনেক সময়ই তাহাদের বাড়ীতে রান্না করিতাম ও এক জায়গায় বসিয়া খাইতাম। আমার কেবলই জানিতে ইচ্ছা হইত, উহাদের অন্ন ও ব্যঞ্জনের আস্বাদন কিরূপ। কিন্তু ইচ্ছা হইলেও তাহাদের বাড়ীর লোক খাইতে দিবে কেন? ভালবাসার খাতিরে তাহারা রান্নার আয়োজন করিয়া দিত মাত্র; কিন্তু আমি যাহা রন্ধন করিতাম সকলেই আহার করিত। আমার সেই দুইটি বাল্যসখীরই বিবাহ হইয়া গেল। শিবসুন্দরীর স্বামী জগৎচন্দ্র সরকার ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি পুনরায় হিন্দুসমাজে ফিরিয়া যান। কিন্তু আমার বাল্যসখীর (তাঁহার স্ত্রীর), আমরণ আমার প্রতি ভালবাসা অটুট ছিল। সুযোগ ঘটিলেই তিনি আমার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিতেন। বাল্যকালের ভালবাসা সত্যই অকৃত্রিম ও মধুর হয়।

আর একটি বাল্যবন্ধু

আমার আর একটি বাল্যবন্ধু ছিলেন। তিনি ছিলেন বিবাহিতা। আমার এই বাল্যবন্ধুর স্বামী হরিমোহন দত্ত মহাশয়কে আমি গ্রাম সম্পর্কে দাদামহাশয় ডাকিতাম। আমি তাঁহাদের পরিবারের সকলেরই স্নেহের পাত্রী ছিলাম। বিশেষতঃ, দাদা হরিমোহন দত্ত মহাশয় আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহার স্ত্রী আমার পরমা বন্ধু হইয়াছিলেন। তিনি বাড়ীর ছোট বৌ — আমি ভালবাসার খাতিরে তাঁহার অনেক কাজের সাহায্য করিতাম। তিনি যখন রন্ধন করিতেন, আমি তাঁহার কাছেই বসিয়া থাকিতাম। একটি করিয়া তরকারী রাঁধিয়া তিনি বলিতেন, "বাম্‌নি! চেখে দেখ্ না তরকারী কেমন হয়েছে।" সম্পর্কে আমি তাঁহার নাত্‌নী, তজ্জন্য আমার সহিত পরিহাস করিয়া কথা কহিতেন। আমার যদিও তরকারীগুলি চাখিয়া দেখিতে বড়ই লোভ হইত, কিন্তু কেহ দেখিয়া ফেলিলে রক্ষা নাই — তাঁহারা কায়স্থ, আমি ব্রাহ্মণকন্যা। কিন্তু জাতিভেদ প্রথায় আমার মোটেই বিশ্বাস ছিল না; উপরন্তু তরকারী খাওয়াইতে দিদিও আমায় ভালবাসিতেন। একদিবস তাঁহার তরকারী চাখিতেছি, এমন সময় তাঁহার শ্বাশুড়ী ঘরে আসিয়া দেখিয়া ফেলিলেন। তখন মা'কে ডাকিয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন, "নিত্যকালী, তোমার মেয়ে আমাদের মহাপাপে ঠেকিয়েছে।" পুত্রবধূকে ভর্ৎসনা করিলেন, "তুমি একি পাপের কাজ করিতেছ?" আমাকে বলিলেন, "বাম্‌নি, আমাদের কেন পাপে ঠেকাচ্ছ?" যাহা হউক, ব্যাপার ক্রমে মিটিয়া গেল।

তাঁহাদের ও আমাদের বাড়ী পরস্পর সংলগ্ন ছিল বলিয়া আমি মধ্যে মধ্যে অন্নব্যঞ্জন লইয়া তাঁহাদের সহিত বসিয়া আহার করিতাম। আমি যে তরকারীগুলি নিতাম, তাহা তাঁহাদের পাতে অনায়াসে তুলিয়া দিতাম, তাঁহাদের তরকারী কিন্তু আমায় দিবার উপায় ছিল না। এদিকে আমার বন্ধুর একান্ত ইচ্ছা, তাঁহার রান্না তরকারী আমায় খাওয়াইবেন। শ্বাশুড়ীর সম্মুখে তাহা হইবার যো নাই, কাজেই তিনি একটি উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তাঁহার শিশুপুত্রটি পার্শ্বের ঘরে ঘুমাইতেছিল। হঠাৎ শ্বাশুড়ীকে বলিলেন, "দেখে আসুন না, খোকা উঠেছে না কি?"

তিনি নাতির টানে তাড়াতাড়ি তাহাকে দেখিতে গেলেন। ভয় ছিল পাছে নাতি ঘুম ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। এই সুযোগে বন্ধু তাঁহার তরকারী আমার থালায় তুলিয়া দিলেন। ভালবাসা জাতিভেদের বেড়া ডিঙ্গাইয়া গেল।

বাল্যকাল হইতেই আমি ছোট শিশুদের বড় ভালবাসিতাম। আমার বন্ধু তাঁহার শিশুপুত্রকে আমার ক্রোড়ে দিয়া সংসারের অনেক কাজই সারিয়া লইতেন। শিশু কাঁদিলে আমি বারম্বার তাঁহাকে ডাকিতাম এবং বলিতাম, "খোকার ক্ষুধা পাইয়াছে, সেইজন্য কাঁদিতেছে।" তিনি কিন্তু আমার ডাকে কর্ণপাত করিতেন না। তাঁহার সংসারের কাজ লইয়াই তিনি ব্যস্ত। যখন আমি বারবার তাঁহাকে ডাকিয়া ব্যস্ত করিতাম, — উত্তরে তিনি বলিতেন, "দেখ্‌ব তোমার ছেলে হ'লে তুমি কি কর।"

তাহার পর আমি ব্রাহ্মসমাজে চলিয়া আসিলে তাঁহার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতি আমার প্রাণের টান চিরকালই সমভাবে বর্ত্তমান ছিল। অকালে গুটিকতক সন্তান ও স্বামীকে রাখিয়া তিনি পরলোকে চলিয়া যান। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া আমি এতই শোকাকুলা হইয়াছিলাম যে, আমার বাল্যকালের ভালবাসার গভীরতা অনুভব করিয়া আমার স্বামী পর্য্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন।

পার্ব্বতীমাসী

আমাদের বাটীসংলগ্ন জনৈক প্রতিবেশীর কন্যার নাম ছিল পার্ব্বতী। তাঁহাকে আমি পার্ব্বতী-মাসী ডাকিতাম। তাঁহারা ছিলেন জাতিতে কায়স্থ। কিন্তু গ্রামে ভিন্ন জাতি হইলেও প্রতিবাসীদের সঙ্গে এত আত্মীয়তা হইত যে, সম্পর্ক পাতাইয়া তাহাদের ডাকা হইত। পার্ব্বতীমাসী মা'কে দিদি বলিয়া ডাকিতেন, কাজেই আমরা তাঁকে পার্ব্বতী-'মাসী' বলিতাম। অভাগিনী পার্ব্বতী-মাসী বাল-বিধবা ছিলেন। আড়াই বৎসর বয়সে একটি বালকের সহিত তাঁহার বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল। পাঁচ বৎসর বয়সে তিনি বিধবা হইলেন। ইহার বিবাহই বা কি, এবং বিধবা হওয়াই বা কি?

অতি শিশুকালেই পার্ব্বতীমাসী মাতৃহীনা হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা পুনরায় বিবাহ করেন। একে মাতৃহীনা বালিকা, তাহাতে পঞ্চমবর্ষীয়া বিধবা — বিমাতা তাঁহাকে কিরূপ চক্ষে দেখিতেন তাহা সহজেই অনুমেয়। পার্ব্বতীমাসীর ও আমার বয়সে যদিও অনেক তফাৎ ছিল, তথাপি আমি তাঁহার বন্ধুর মতন হইয়াছিলাম। তাঁহার প্রতি বিমাতার গঞ্জনা ও অত্যাচার দর্শনে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইতাম। গৃহে আসিয়া মা'কে ও সোনাদিদিকে সেইসব কথা বলিতাম এবং আমার যথাসাধ্য তাঁহাকে একটু আরাম দিতে পারি কিনা তাহার চেষ্টা করিতাম। আমাদের বাড়ীর সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন। অবসর পাইলেই পার্ব্বতীমাসী আমাদের বাড়ী আসিয়া দুই একটি কথা বলিয়া তাঁহার কষ্টের লাঘব করিতেন। আমিও তাঁহাদের বাড়ী যাইয়া অনেক সময় তাঁহাকে দেখিতাম।

জন্মদুঃখিনী পার্ব্বতীমাসী আমার মাতুল কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিতে ইচ্ছুক হইলেন। আমার উপরোক্ত মাতুলের জনৈক আত্মীয় ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আমাদের বাড়ী মাতুল মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া পার্ব্বতীমাসীর দুরবস্থার কথা শুনিলেন এবং তাঁহাকে এই অন্ধকূপ হইতে

উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বেই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এস্থানে একটি কথা না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না;— আমার দিদিমাতাঠাকুরাণী, ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, ইনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এই ছেলেটি মা'র বুকে ছুরি দিয়াছে।" তিনি চেহারা দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেন যে ইনি ব্রাহ্ম হইয়াছেন।

সেই সময় যে সকল যুবকেরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সকলেই পিতামাতার বক্ষে শেল বিদ্ধ করিয়া বাটীর বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের, কখনো বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেও বাহিরে ভাত খাইতে হইত। এমন কি নিজের উচ্ছিষ্ট নিজেকেই উঠাইতে হইত। যে পিতামাতার স্নেহে এত বড় হইয়াছেন, তাঁহারা পুত্রের ছোঁওয়া অন্ন গ্রহণ করিবেন না, ইহা কি অল্প দুঃখের কথা! কিন্তু ধর্ম্মের জন্য এই সকল যুবকেরা যে কত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত।

আমি পার্ব্বতীমাসীর সহিত একত্রে নদীতে স্নান করিতে যাইতাম। নদীর ধারে যখন লোকজন থাকিত না তখন ব্রাহ্মসমাজের কথা প্রসঙ্গে পার্ব্বতীমাসী আমায় বলিতেন যে, সুযোগ পাইলেই তিনি এই অন্ধকারাচ্ছন্ন কারাগার হইতে ব্রাহ্মসমাজের মুক্ত বাতাসে চলিয়া যাইবেন। তিনি ইহাও বলিতেন যে, মাতুল মহাশয় ও মাতৃদেবী কিছুদিন পরে আমাদেরও লইয়া ব্রাহ্মসমাজে চলিয়া যাইবেন। এ সংবাদ শুনিয়া আমার প্রাণে বড়ই আনন্দ হইত। আমার বয়স অনুমান তখন দশ বৎসর। মাতুল-গৃহে আমি সকলেরই আদরের পাত্রী; আমার কোন কষ্টই ছিল না। বাড়ী ঘর, আত্মীয় স্বজনদের ছাড়িয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া মন একটু দুঃখিত হইয়াছিল বটে, তথাপি ব্রাহ্মসমাজে যাইব শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আনন্দ হইতেছিল এই ভাবিয়া যে, প্রিয় পার্ব্বতীমাসী এই নিদারুণ কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইবেন।

ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে আমার মামা হইতেন। ভগবানমামা যতদিন না পার্ব্বতী-মাসীকে উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহার প্রাণে শান্তি ছিল না। তিনি আমাদের বাড়ী হইতে ফিরিয়া যাইয়া আরও দুই তিনটি বন্ধুসহ আমাদের গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন এবং একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া লুক্কায়িত রহিলেন। এদিকে মাতুল মহাশয়ের সাহায্যে পার্ব্বতী-মাসীকে সংবাদ দিলেন যে অমুক সময়ে তিনি যেন নদীর ধারে যাইয়া নৌকায় চড়েন। তাঁহারা একটি সার্টও মাতুল মহাশয়ের সাহায্যে পার্ব্বতীমাসীকে পাঠাইয়া দিলেন, যেন তিনি পুরুষের বেশে যান। কিন্তু তাঁহারা একটি ভুল করিয়াছিলেন; নৌকাখানি যদি দূরগ্রাম হইতে আনিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কার্য্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা ছিল। পার্ব্বতীমাসী নৌকায় চড়িবামাত্রই মাঝিরা চিনিয়া ফেলিয়াছিল। পার্ব্বতীমাসীর পিতা নকড়ি ঘোষ গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। মাঝিরা আপত্তি করিয়া বলিয়া উঠিল, "আপনারা আমাদের ঘোষমহাশয়ের কন্যাকে লইয়া কোথায় যাইতেছেন?" তাহাদের মধ্যে একজন আবার ছুটিয়া গিয়া পার্ব্বতীমাসীর বাড়ীতে সংবাদ দিল। বলা বাহুল্য, এই সংবাদ শ্রবণমাত্রই পার্ব্বতীমাসীর ভাই, বন্ধুবান্ধব-সহ ছুটিয়া আসিয়া ভগবানমামা ও তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগকে অত্যন্ত প্রহার করিলেন এবং পার্ব্বতীমাসীকেও দু'চারি ঘা প্রদানপূর্ব্বক বাড়ীতে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। ইঁহারা সে যাত্রায় প্রহার খাইয়া ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু এত কষ্ট পাইয়াও পার্ব্বতীমাসীকে উদ্ধার করিবার

সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না। বস্তুতঃ, যতদিন না তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন ততদিন তাঁহাদের প্রাণে শান্তি ছিল না। তাঁহারা মাতুল মহাশয়কে চিঠিপত্র লিখিয়া পার্ব্বতীমাসীর সংবাদ জানিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার পরে পার্ব্বতীমাসীর যন্ত্রণা শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। পার্ব্বতীমাসী দেখিতে সুন্দরী ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার মাথার চুল খুব লম্বা ছিল। তাঁহার বিমাতা একদিন তাঁহার চুলের অর্দ্ধভাগ বঁটি দ্বারা কর্ত্তন করিয়া বলিলেন, "তোর রূপ নাই, তোর চুলগুলির জন্যই লোকে তোকে লইতে চায়; সেই চুলের অর্দ্ধভাগ কাটিয়া তোকে আরও কুরূপা করিয়া দিলাম। এখন আর কেহ তোকে লইয়া যাইবে না।" এমন কত দিবস হইত, আহার করিতে বসিলে পাত্র হইতে তাঁহার আহার্য্য বস্তু ফেলিয়া দিয়া ছাই আনিয়া তাহাতে ঢালিয়া দিতেন। পার্ব্বতীমাসী নীরবে সবই সহ্য করিতেন। তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনার স্থান ছিল আমাদের বাড়ী; সুযোগ পাইলেই আমাদের বাড়ী আসিয়া একটু হাঁপ ছাড়িয়া যাইতেন।

যাহা হউক, দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় ভগবানমামা ও তাঁহার কয়েকজন বন্ধু তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন। এইবার তাঁহারা দূর গ্রাম হইতে নৌকা ভাড়া করিয়া গ্রামের বাজারের ঘাটে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। আমার মাতৃদেবীর সহোদর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাজকুমার মুখুটী মহাশয় বাজার করিতে যাইয়া তাঁহাদের সাক্ষাৎ পান। তাঁহারা তাঁহাকে বলিয়া দিলেন যে, যেমন করিয়াই হউক এইবার পার্ব্বতীমাসীকে তাঁহারা উদ্ধার করিবেনই এবং তজ্জন্য মাতুল মহাশয়ের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি অতি দয়ালু ও পরোপকারী লোক ছিলেন। পার্ব্বতীমাসীর দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। তিনি নিজে হিন্দু হইলেও পার্ব্বতীমাসী ব্রাহ্মসমাজে গেলে তাঁহার এই দুঃখের অবসান হইবে মনে করিয়া ভগবানমামাকে সাহায্য করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন।

বাড়ী আসিয়াই তিনি পার্ব্বতীমাসীকে গোপনে এই সংবাদ দিলেন। সেইদিন গ্রামের একটি বধূর অত্যন্ত পীড়া হইয়াছিল। এমন কি তাহার জীবনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। গ্রামের বহু ভদ্রলোক, কবিরাজ ও মাতুল মহাশয় প্রায় সমস্ত রাত্রি রোগিণীর ঘরে জাগিয়াছিলেন। অতি প্রত্যূষে মাতুল মহাশয় পার্ব্বতীমাসীকে উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়েই রোগিণীর বাটী হইতে নির্গত হইয়া পড়িলেন। পার্ব্বতীমাসীর বাড়ী আমাদের বাড়ীর নিকটে ছিল। তিনি আসিয়া দেখিলেন পার্ব্বতীমাসী অন্ধকার থাকিতেই ফুল তুলিতেছেন। তাঁহাকে মিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "পোড়াকপালী, এখন ফুল তুলিতে হইবে না, শীঘ্র চলিয়া আইস। নদীর ধার দিয়া বাজারের ঘাটে চলিয়া যাও, আমি উপরের রাস্তা দিয়া যাইতেছি।" যাহা হউক, ভগবানের কৃপায় তিনি তাঁহাকে ভগবান্‌মামাদের নৌকায় তুলিয়া দিয়া বাড়ী আসিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া শয়ন করিলেন। অন্য দিবস হইলে হয়ত তিনি এই সময় শয়ন করিতেন না। কিন্তু পাছে তাঁহাকে কেহ পার্ব্বতীমাসীর বিষয় জিজ্ঞাসা করে তজ্জন্য শয়ন করিলেন; এবং রাত্রি জাগরণ হেতু যেন অনেক বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রিত হইয়া আছেন, এইরূপ ভান করিয়া পড়িয়া রহিলেন। এদিকে পার্ব্বতীমাসীকে লইয়া ভগবানমামারা পদ্মার ভাটিতে নৌকা ছাড়িয়া বরিশাল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বরিশালে নিরাপদে পৌঁছাইয়া তাঁহারা তাঁহাকে কোন এক ব্রাহ্মপরিবারে আশ্রয় দান করিলেন। অন্যদিকে, বিমাতা প্রথমে ভাবিলেন, পার্ব্বতী প্রাতঃকালের কাজকর্ম্ম ফেলিয়া রোগিণীর গৃহে তামাসা দেখিতে গিয়াছে।... "এত বেলা হইয়াছে এখনও

গোবরছড়া দেওয়া হয় নাই; এখনও ঘর নিকানো, বাসন মাজা হয় নাই। আসুক না আজ সে বাড়ী, আজ তাহার হাত | হাড় | কখানা আস্ত রাখিব না" — ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাকে গালাগালি দিতে লাগিলেন। এবং যে ব্যক্তিই রোগিণীর বাড়ীর দিকে যাইতেছে, তাহাকেই বলিয়া দিতেছেন যেন তাহারা পার্ব্বতীকে একথা জানায়। যখন সংবাদ পাইলেন যে পার্ব্বতী সেই বাড়ীতে নাই, তখন চতুর্দ্দিকে তাঁহার অনুসন্ধান পড়িয়া গেল। দেখা গেল ফুলের সাজী বাগানে পড়িয়া আছে। তখন তাঁহারা বুঝিলেন পার্ব্বতী পূজার ফুল তুলিতে গিয়াছিল। কিন্তু পার্ব্বতীমাসী যে পলায়ন করিয়াছে তাহা কেহই অনুমান করিতে পারিলেন না, অনেকেই বলিলেন পার্ব্বতীমাসীকে বাঘে খাইয়াছে। তাঁহার জন্য কাঁদিবার কেহ ছিল না, কাজেই আপদ চুকিয়া গেল। কিন্তু আমরা সকলেই জানিয়াছিলাম যে, তিনি এইবার মুক্তি পাইয়াছেন। আমার মাতুল মহাশয়ের অসীম দয়াতেই পার্ব্বতীমাসী উদ্ধার পাইলেন। অবশ্য, বহুদিবস পরে তাঁহার আত্মীয়েরা জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি বাঘের মুখে যান নাই, ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাল্যজীবন

বাল্যকালে আমি সকলেরই অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী ছিলাম। আপনার লোকের ত কথাই নাই — প্রতিবাসিগণ, স্কুলের মাষ্টার, পণ্ডিত, — সকলেই আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। আমার যতদূর স্মরণ আছে, আমি কখনই গুরুজনদিগের অবাধ্য হইতাম না। শুদ্ধ একটী বিষয়ে তাঁহাদের অবাধ্য হইতে বাধ্য হইতাম। আমার আম কুড়াইবার নেশা অত্যন্ত প্রবল ছিল। অন্য সময় আম কুড়াইতে অবশ্য গুরুজনদিগের মানা ছিল না, কিন্তু ঝড়ের সময় তাঁহারা আমাবে আম কুড়াইতে দিতেন না। তাঁহাদের ভয় ছিল পাছে ডাল ভাঙ্গিয়া পড়ে ও আমার আঘাত লাগে। কিন্তু ঝড় উঠিবার উপক্রম হইলেই আমি তাঁহাদের নিকট হইতে একটু দূরে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতাম, এবং সুযোগ পাইলেই আম কুড়াইতে ছুটিয়া যাইতাম। এই অবাধ্যতার দরুণ আমি দুই এক দিবস একটু আধটু শাস্তিও পাইয়াছি।

গ্রামদেশের নিয়ম এই যে, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বাগানে আম কুড়াইতে পারিবে। গাছতলা হইতে কুড়াইয়া আনিলে চুরি করা হয় না। গাছ হইতে আম পাড়িয়া আনিলেই চুরি করা হয়। সেইজন্য গ্রামের ছেলেমেয়েরা সমবেত হইয়া প্রত্যেকের বাগানে আম কুড়াইতে যাইতাম। একদিন আম কুড়াইতে যাইয়া একটি বেল কুড়াইয়া পাইলাম। অভ্যাসবশতঃ বেলটি হাতে তুলিয়া লইতেই আমার বুকের ভিতর দুর্‌দুর্ করিয়া উঠিল। অন্যের বাগানে আম কুড়াইবার নিয়ম আছে জানি, কিন্তু বেল কুড়াইবার নিয়ম আছে কিনা জানি না। আমি তখন নিতান্ত অপরাধীর মতন বেলটী লইয়া সেই বাড়ীর গৃহিণীর নিকট গেলাম এবং বলিলাম যে, আপনাদের বাগানে আম কুড়াইতে কুড়াইতে একটি বেল পাইয়াছি, এটি আপনি নিন্। ইহাতে তিনি আমাকে বলিলেন, "বেলটি বাড়ী লইয়া যাও, ঠাকুরকে উৎসর্গ করিয়া খাইও।" আমি ইহাতে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। বাড়ী আসিয়া প্রিয়তমা সোনাদিদিকে বলিলাম, —"বেলটি কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম এবং তাঁহাদের দিতে গিয়াছিলাম;কিন্তু তাঁহারা বেল নিলেন না, ঠাকুরকে উৎসর্গ করিয়া খাইতে বলিয়াছেন।" সোনাদিদি তদনুসারে ঠাকুরকে বেল নিবেদন করিয়া সকলকে খাইতে দিলেন। বাল্যকাল হইতেই আমি কোন কাজ অন্যায় করিয়া ফেলিলাম ভাবিয়া বিবেকের তাড়না খাইতাম। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিবেকবুদ্ধি আরও বাড়িতে থাকে। কোনও কাজ করিব বলিয়া যতক্ষণ না কাজটি সম্পন্ন করিয়াছি, ততক্ষণ মনে শান্তি পাই নাই।

অনেক বালকবালিকাদের দেখিতাম, বৃদ্ধ অথবা বৃদ্ধালোকদিগকে ঠাট্টা উপহাস করিয়া তাঁহাদিগকে একেবারে পাগল করিয়া তুলিত। আমি বাল্যকাল হইতেই ইহার বিরুদ্ধে ছিলাম। বুঝিতাম না কি করিয়া উহারা বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের উপর এইরূপ নির্ম্মম ব্যবহার করিতে পারে। কাহাকেও এইরূপ ব্যবহার করিতে দেখিলে আমার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিত। উঁহারাও একদিন রূপ লাবণ্যের অধিকারী ছিলেন। এখন উঁহাদের দেহের সৌন্দর্য্য চলিয়া গিয়াছে

বলিয়া কি প্রাণেও সুখ দুঃখের অনুভূতি নাই? হায়! উঁহাদের শরীর অশক্ত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া কি এইরূপ নির্ম্মম ব্যবহার করিতে হইবে? যাহারা বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিত, তাহাদিগকে সত্যই আমি ঘৃণা করিতাম।

আমাদের একটি প্রতিবেশীর বাটীতে তাঁহাদের জ্ঞাতি সম্পর্কীয়া জনৈক বৃদ্ধা বাস করিতেন। তাঁহার নিজের সন্তানাদি ছিল না। জ্ঞাতিদের বাড়ীতে মাথা গুজিবার স্থান হইয়াছিল বটে, কিন্তু অন্নের সংস্থান তাঁহার ছিল না বলিলেই হয়। অনেক সময়ই তাঁহার নিকট যাইয়া বসিতাম। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইতাম, এবং আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু পারিতাম, তাঁহাকে সাহায্য করিতাম। আমি আম কুড়াইয়া তাঁহাকে দিতাম। বাড়ী হইতে সোনাদিদির নিকট চাহিয়া চাল, ডাল, তরকারী লইয়া তাঁহাকে দিতাম। মাঝে মাঝে একটু অন্যায় কাজও করিয়া ফেলিতাম। সোনাদিদিকে বলিতাম, বাঁশতলার বুড়ীর আজ চাল নাই, তাঁহাকে কিছু চাল দিয়া আসি। দয়াশীলা সোনাদিদি তৎক্ষণাৎ আমাকে চাল দিতে অনুমতি দিতেন। আমি তাঁহাকে কত চাল দিব জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, — এক সের চাল দিয়া আইস, আমি কিন্তু এক সের হইতে অধিক চাল লইয়া যাইতাম। ইহাতে সোনাদিদির আদেশ অতিক্রম করার জন্য অপরাধ হইলেও আমি মনে করিতাম, বেচারী বৃদ্ধা! এ চাল কয়টি ফুরাইলে হয়ত অনাহারে থাকিবে; সোনাদিদির অগোচরে কিছু চাল বেশী দিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। যাহা হউক, এইরূপ ভাবে তাঁহাকে আমি অনেক সময়ই সাহায্য করিতাম।

দাদামহাশয় — পরম পূজনীয় গঙ্গাপতি মুখুটী

পরম পূজনীয় গঙ্গাপতি মুখুটী আমার দাদামহাশয়। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, আমরা মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া মাতুলালয়েই লালিতপালিত হই। মাতুলালয়ে কিরূপ স্নেহ এবং আদরে আমরা বর্দ্ধিত হইয়াছি তাহা আমার ক্ষুদ্র লেখনী বর্ণনা করিতে সক্ষম নহে। দিদিমাতারা তিন ভগিনী, মামা (পরম পূজনীয়া মাতৃদেবীর সহোদর ভ্রাতা ৺রাজকুমার মুখুটী মহাশয়), মাতৃদেবীর মাসতুতো ভ্রাতা কাশীচন্দ্র গাঙ্গুলী, সোনাদিদির পুত্র কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য মাতুলগণ, সকলেই আমাদিগকে অত্যধিক স্নেহ করিতেন। আমাদের কোন এক বন্ধু, কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে মাতৃদেবীর সহোদর ভ্রাতা বলিয়াই মনে করিতেন। যখন শুনিলেন যে তিনি মাতৃদেবীর মাতৃষ্বসা-পুত্র, তখন মাসতুতো ভ্রাতা এত আপনার হইতে পারে ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। মাতৃষ্বসা ও মামীমাতাদিগেরও স্নেহের পরিসীমা ছিল না। আমার মাতৃদেবীর সহোদরা যোড়শী দেবী, বড়দিদিমাতার কন্যাগণ — স্বর্ণময়ী, কুঞ্জমণি ও শরৎ-কুমারী (তিনি আমার সমবয়সী ছিলেন), ইঁহাদেরও ভালবাসার তুলনা ছিল না।

আমি যখন মাইজপাড়া পিত্রালয়ে যাইতাম, তখন আমার দিনগুলি যেন কাটিতে চাহিত না। তাঁহারা আমার রক্ত-সম্পর্কিত হইলেও, তথায় বাস না করার দরুণ তাঁহাদের প্রতি তত টান হয় নাই। কিন্তু 'ঠাকুরমা', 'পিসীমা' সকলকেই খুব ভালবাসিতাম। পিত্রালয়ে গেলে সর্ব্বদাই প্রাণে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইত যে, কাকারা বুঝি আমার প্রিয় জন্মভূমি মাতুলালয়ে, প্রিয়জনদের নিকট আর যাইতে দিবেন না। ঐ সকল কথা ভাবিতে অত্যন্ত কষ্ট হইত। মনে হইত, যাইতে না দিলে হয়ত বা প্রাণধারণ করিতে পারিব না। অনেক সময়ে এই বিষয়ে স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিতাম। এইস্থানে একটি ঘটনার উল্লেখ করিলে কতকটা সে-ভাব প্রকাশ

পাইবে। একবার মাতৃদেবীর সহিত মাইজপাড়া পিত্রালয়ে গিয়াছি, কিন্তু সেস্থানে প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, কবে মাতুলালয়ে যাইব। এক দিবস আমার বড় দাদামহাশয় (মা'র বড় মেশোমহাশয়) তাঁহার বাড়ীতে কোন কার্য্যোপলক্ষে আমাদের লইয়া যাইবেন বলিয়া আসিলেন। কাকারা কেহই সেই সময় বাড়ী ছিলেন না। বড়দাদাকে দেখিয়া যেন প্রাণ ফিরিয়া পাইলাম। আমার পিতামহী অতি ভালো লোক ছিলেন। তিনি মাতৃদেবীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। বড় বৈবাহিক মহাশয় আসিয়াছেন, পুত্রগণ কেহ বাড়ী নাই। তিনি উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। অবশেষে স্থির করিলেন, বৈবাহিক মহাশয়কে কিছুতেই ফিরাইয়া দিবেন না। তিনি মাতৃদেবীকে আমাদের লইয়া বড়দাদার সহিত যাইতে অনুমতি দান করিলেন। ঠাকুরমা'র অনুমতি পাইয়া অবিলম্বে আমরা প্রস্তুত হইয়া নৌকায় উঠিলাম। পাছে কাকাদের সহিত পথে দেখা হয় এবং আমাদিগকে বাড়ী ফিরাইয়া লইয়া যাইতে চাহেন, তজ্জন্য মাতৃদেবী আমাদিগকে নৌকার বাহিরে বসিতে বারণ করিলেন। মা'র কথামতন আমরা নৌকার ভিতর চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম। বড়দাদাদের বাড়ীর ঘাটে যখন নৌকা লাগিল, তখন আমাদের আহ্লাদ দেখে কে। মাসীদের সহিত মিলিত হইয়া যেন নবজীবন লাভ করিলাম।

একবার মাইজপাড়ার বিখ্যাত তারাপ্রসাদ রায়-এর বাড়ীতে একটি বিবাহে মাতৃদেবীকে আমাদের লইয়া যাইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু মাতৃদেবী আমাদের লইয়া যাইতে সাহস পাইলেন না। পুত্রবধূকে নিমন্ত্রণরক্ষার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে অঘোরদাদার স্ত্রী, শ্রীযুক্তা বরদাসুন্দরীর সহিত তাঁহার অত্যন্ত ভাব হইয়া গেল। বিক্রমপুরে নিয়ম এই যে, বিবাহাদি শুভকার্য্যের সময় সম্পর্কিত মানুষ যিনি যেখানে আছেন, সকলকেই সাদরে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। কাজেই সেই বিবাহে প্রসিদ্ধ বৈদ্যনাথ রায়ের বংশের সকলেই একত্রিত হইয়াছিলেন।

মাইজপাড়ার রায় বংশ

মাইজপাড়ার রায়েরা অতি সমৃদ্ধিশালী ও প্রতাপান্বিত জমিদার ছিলেন। আমরা যখন মধ্যে মধ্যে মাতার সহিত মাইজপাড়া যাইতাম, আমার ঠাকুরদাদার মামা, বিখ্যাত জমিদার তারাপ্রসাদ রায় আমাদের বাড়ীতে আসিয়া মাতৃদেবীকে ডাকিয়া বলিতেন, "মেয়েদের ত লেখাপড়া শিখাইতেছ, কিন্তু আমি ত চক্ষু বুজিয়া কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।" অর্থাৎ — ইহাদের উপযুক্ত পাত্র কোথায় পাইবে। মাতৃদেবী ইহা শ্রবণে ভীতা হইতেন, পাছে তিনি আদেশ করেন মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইবার প্রয়োজন নাই, অথবা মেয়েদের এখনই বিবাহ দিতে হইবে। তিনি আদেশ করিলে তাহা অমান্য করা মাতৃদেবীর সাধ্যাতীত হইত।

মাইজপাড়ার রায়েদের বাড়ী এবং আমাদিগের বাড়ী পুষ্করিণীর এপার ওপার ছিল। অতি ধনশালী হইলেও, তাঁহাদের নিয়ম ছিল, তাঁহারা কখনও পাচক ব্রাহ্মণের হস্তে প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জন আহার করিতেন না। বাড়ীর মেয়েরা ও বধূরাই রন্ধনকার্য্য করিতেন। তাঁহারা পালা করিয়া এক এক দিবস এক একজন রান্না করিতেন। রন্ধনকার্য্য সমাধা হইলে তাঁহারা যখন পুকুরঘাটে স্নান করিতেন, দাসীরা তাঁহাদের গাত্র মার্জ্জনা করিত। আমি পুকুরের অন্যধারে, আমাদের বাড়ীর ঘাটে বসিয়া ঐ সমস্ত দেখিতাম; ঐ সকল দেখিতে আমার বড়ই আমোদ লাগিত। মধ্যে মধ্যে আমাকে তাঁহারা আহার করিতে ডাকিতেন। রন্ধনে তাঁহারা অত্যন্ত নিপুণা ছিলেন। শুনিয়াছি, কখন কখন তাঁহারা সাহেবদের খাওয়াইতেন। তাঁহারা ইঁহাদের হস্তের

অন্ন, ব্যঞ্জন খাইয়া সুখ্যাতি করিতেন। একবার ইলিশ মৎস্য করমচা সংযোগে রান্না হইয়াছিল তাহা তাঁহাদের এতই ভালো লাগিয়াছিল যে উহা বোতলে করিয়া লইয়া যাইতে পারা যায় কি না, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

রায়বাড়ী

যখন রায়েদের বাড়ীতে যাইতাম, — কত প্রকাণ্ড বাড়ী, ভিন্ন ভিন্ন মহল; দুইদিকে উচ্চ অট্টালিকা উঠিয়াছে, এই সকল দেখিতাম এবং দুই অট্টালিকার মধ্যবর্ত্তী অন্ধকার সরুগলি দিয়া যাইতে ভয় পাইতাম। আবার বহির্বাটিতে প্রকাণ্ড মুক্ত আঙ্গিনা ছিল; দুর্গাপূজার সময় সেখানে কতই আড়ম্বর হইত। রায়মশায়দের বাড়ীতে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত দেবী প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রতি দিবস তাঁহার পূজা হইত। দেবীর নাম ছিল করুণাময়ী। আঙ্গিনায় দেবী করুণাময়ীর খণ্ডটি একেবারে পৃথক; সেটিও প্রকাণ্ড। দেবীপূজার পুষ্প এবং বিল্বপত্র সেই খণ্ডের একটি স্থানে স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া থাকে। ধূপ ও ধুনার গন্ধে সেই খণ্ডটি আমোদিত হইত। পবিত্রতা যেন মূর্ত্তিমতী সেস্থানে বিরাজ করিতেন।

পূর্ব্বকালে প্রায় প্রত্যেক সমৃদ্ধিশালী গ্রামে একটি করিয়া মঠ থাকিত। মঠ স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ; কোনও ভাগ্যবান ব্যক্তির চিতার উপরে তাহা প্রতিষ্ঠিত হইত। অনেক দূর হইতে সেই মঠ লক্ষ্য করিয়া নৌকা প্রভৃতি গ্রামাভিমুখে অগ্রসর হইত। মাইজপাড়া গ্রামস্থ মঠটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া আমরা আর পিত্রালয়ে যাই নাই। কিন্তু আমার স্বামীর সহিত কার্য্যোপলক্ষে একবার বিক্রমপুর গিয়াছিলাম। কিয়ৎদূর হইতেই মাইজপাড়া রায়েদের মঠ দেখিয়া নিজগ্রাম চিনিতে পারিলাম। তখন যে কিরূপ আনন্দিত হইয়াছিলাম, তাহা আমার বর্ণনার অসাধ্য।

যাহা হউক, দাদামহাশয়ের কথা বলিতেছিলাম। আমি ৭/৮ বৎসর বয়সেই রন্ধন করিতে আরম্ভ করি। আমার দাদামহাশয় যখন শিষ্যবাড়ী স্বস্ত্যয়ন করিতে যাইতেন, আমি তাঁহার সহিত যাইতাম। ব্রাহ্মণ জাতি ব্যতীত অন্য জাতির বাড়ীতে ত নিজেরই রান্না করিয়া খাইতে হইবে। দাদামহাশয় যখন স্বস্ত্যয়ন করিতে বসিতেন, আমি তখন রান্না করিতাম। বাড়ীর মেয়েরা দূর হইতে রান্নার যোগাড় করিয়া দিতেন এবং আমি একটি একটি করিয়া রাঁধিয়া তরকারীগুলি নামাইতাম। সময় মতন ভাত চড়াইয়া দিতাম, যেন দাদামহাশয় স্বস্ত্যয়ন সমাপন করিয়া আসিয়াই ভাত নামাইতে পারেন। অধিকাংশ সময়ই যখন ভাত টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিত, সেই সময়ে দাদামহাশয় উঠিয়া আসিতেন। পরিশ্রমে আমার মুখ শুকাইয়া যাইত, ক্ষুধাও অত্যন্ত পাইত। দাদামহাশয় আমাকে আশ্বাস দিয়া বলিতেন, "এই যে বৈরাগে ফাল্ উঠিয়াছে, এখনই ভাত নামাইয়া আমরা খাইতে বসিব।" পূর্ব্ববঙ্গে লাফ স্থলে ফাল শব্দ প্রচলিত। বৈরাগে ফাল, অর্থাৎ বৈরাগীরা যদ্রূপ সঙ্কীর্ত্তনের সময় লম্ফ দেয়, ভাতগুলিও সেইরূপ লাফাইতেছে। অতএব ভাত সিদ্ধ হইবার আর বিশেষ দেরী নাই। আমার দাদামহাশয় যেমন ধার্ম্মিক তেমনই রসিক লোক ছিলেন। কথায় কথায় সুন্দর তুলনা দিতেন। সময় হইলে দাদামহাশয় ভাতের ফেন গালিয়া লইতেন। ইতিপূর্ব্বেই আমি ঠাঁই করিয়া তরকারী সাজাইয়া রাখিতাম। তিনি ভাতের হাঁড়ী নামাইয়া আমাকে দিতেন, ও নিজে খাইতেন। খাইতে বসিয়া তিনি কথাবার্ত্তা বলিতেন না। কিন্তু ইসারায় বলিতেন তরকারীগুলি কি চমৎকার হইয়াছে। ওদিকে শিষ্যরা

প্রসাদের আশায় বসিয়া থাকিতেন। আহার সমাপনান্তে উঠিয়া বলিতেন, "এ'বার তোমরা নিয়ে গিয়ে সব খাও; দিদি কি উত্তম পাক করেছে খেয়ে দেখ।" আমি যাহা রন্ধন করিতাম তাহাই তাঁহার মিষ্টি লাগিত। অনেক সময়ে শিষ্যদের আমার রান্না খাওয়াইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেন। দাদামহাশয়দের স্নেহবশতঃ স্বভাবতই নাত্নীদের সবই মিষ্ট লাগে। একবার দাদামহাশয়ের এক শিষ্যবাড়ী রন্ধন করিয়া আমার ছোট ভগিনী বগলাকে চাখিতে দিলাম। সে সব তরকারীগুলিতেই লবণ ঠিক হইয়াছে বলিল, কিন্তু ভাতটাতে নুন দেওয়া হয় নাই, সেটা অনুনী হইয়াছে বলিল। বগলা আমা অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট ছিল। সে তখনও মনে করিত তরকারীগুলিতে যেমন নুন দিতে হয়, ভাতেও বুঝি তেমনি নুন দিতে হয়। আমার বয়সও তখন ৮/৯ বৎসরের অধিক হইবে না। আমি যখন সোনাদিদির নিকট রান্না শিখিতাম, তখন কতটা নুন দিতে হইবে, সোনাদিদি আমাকে দেখাইয়া দিতেন। আমি হাতের চেটোতে তাহা মাপিয়া রাখিতাম। রন্ধনের সময় তদনুসারে নুন দিতাম। অবশ্য অনেক সময় দ্রব্যের কম বেশী স্মরণ থাকিত না।

দাদামহাশয়ের সঙ্গে প্রায়ই মাসীমা'র বাড়ী যাইতাম। কতক্ষণে মাসীমাতার বাড়ী পৌঁছিব ও তাঁহাকে দেখিব, নৌকা চলিতে চলিতে অনবরত দাদামহাশয়কে ঐ প্রশ্ন করিতাম। কখনও বা অন্য একখানি নৌকা দেখিয়া দাদামহাশয়কে প্রশ্ন করিতাম, "আমি যদি ওদের নৌকার লোক হইতাম — ?" কিন্তু ভয়ে তৎক্ষণাৎ দাদামহাশয়কে জড়াইয়া ধরিতাম। একবার হাঁটিয়া মাসীমার বাড়ী যাইতে হইয়াছিল। খানিকটা হাঁটিয়া আমি আর চলিতে পারিলাম না। দাদামহাশয়ের অনুগত শিষ্য কাশীনাথ সঙ্গে ছিল। আমি কাশীনাথের কাঁধে চড়িয়া চলিলাম। ক্রমে রাত্রি হইয়া আসিল। অন্ধকার রাত্রি; বিদ্যুতের আলোকে আমরা পথ দেখিয়া চলিলাম। তৎকালে ঐ অঞ্চলে বাঘের ভয়ও ছিল। আমি ভয়ে কাশীনাথকে জড়াইয়া ধরিতেছিলাম। কাশীনাথ আমাকে অভয় দিয়া বলিল, "কুছ পরোয়া নেই, গুরুদেব ভরসা।" আমি 'কুছ্ পরোয়া নেই'-এর অর্থ বুঝিলাম না। মনে করিলাম 'খুব ভয় আছে'। কাশীনাথকে আরও শক্ত করিয়া জড়াইয়া ধরিলাম। মাসীমার বাড়ী যখন পৌঁছিলাম, স্নেহময়ী মাসীমাতার মুখ দেখিয়া রাস্তার সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া গেলাম। অনেক সময় মাসীমাতা ঠাকুরাণীকে শশুরালয় হইতে পিত্রালয়ে আনিতে যাইতাম। একবার মাসীমা'কে তাঁহারা ছাড়িয়া দিলেন না। তিনি সজল নয়নে যতক্ষণ আমাদের দেখা যাইতেছিল , একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। এখনও তাঁহার সেই করুণ মুখচ্ছবি আমার চোখে ভাসিতেছে। সে'কালে শ্বশুরালয়ে বধূরা প্রায় বন্দিনীর মতন থাকিতেন। শ্বশুর শ্বাশুড়ীর অথবা অভিভাবকদের অনুমতি বিনা পিত্রালয়ে আসিতে পারিতেন না। অনেক সময় পিতা কন্যাকে তাঁহার বাটীতে আনিতে গিয়া বিরস বদনে ফিরিয়া আসিতেন। এই সকল কারণে তৎকালে বালিকাবধূগণের পিতৃগৃহ ছাড়িয়া শ্বশুরগৃহে বাস করিতে যে কিরূপ কষ্ট হইত, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

আমার দাদামহাশয় সেকালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোক হইলেও তাঁহার মন অতি উদার ছিল। অনেক বিষয়ে তিনি দেশের প্রচলিত কুসংস্কার হইতে দূরে থাকিতেন। সে'কালে বিধবাদের নির্জ্জলা একাদশী করিবার নিয়ম ছিল। এই কুসংস্কারটি লোকের মনে এত দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল যে, একাদশীর দিন কোন বিধবার মৃত্যু হইলেও একবিন্দু জল দ্বারা তাঁহার কণ্ঠ ভিজাইতে পারিতেন না। এমন কি একাদশীর দিনে মৃতা হতভাগিনী বিধবার চিতাভস্মও ধুইবার নিয়ম

ছিল না। এই নিদারুণ মূঢ়তার ফলে কত বিধবাকে যে শুষ্ককণ্ঠে মরিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। হায়রে কুসংস্কার! পুরুষগণ স্ত্রীর মৃত্যুর পরে, এমন কি বর্ত্তমানে, যাহা খুসি তাহাই করিতে পারিবে; কিন্তু হতভাগিনী বিধবা, শুষ্ককণ্ঠে জল পাওয়া দূরে থাকুক, চিতাভস্মটুকু ধৌত করিলেও তাহার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে? এই কঠোর নিয়মটিতে আমার দাদামহাশয়ের অত্যন্ত আঘাত লাগিত। তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোক ছিলেন, কাজেই আমাদের গ্রামে নিয়ম করিয়া দিলেন যে বিধবারা একাদশী দিন নিরম্বু উপবাস করিবে না। তাঁহারা দুধ কলা মিষ্টি ইত্যাদি আহার করিবেন। ঐরূপ নিরম্বু উপবাস করিয়া শরীরকে কষ্ট দেওয়া তিনি পাপ মনে করিতেন। আমার মাতুলালয়েও সেই গ্রামের বিধবারা আমার দাদামহাশয়ের বিধি পাইয়া সকলেই একাদশীর দিবস জলযোগ করিতেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, আমার পিত্রালয় মাইজপাড়া গ্রাম তখনও কুসংস্কারের ঘন কুজ্ঝটীকায় আবৃত ছিল। আমার পিতার মৃত্যুর পর মাতৃদেবী যখন শ্বশুরালয়ে যাইতেন, আমার স্নেহশীল উদার-প্রকৃতি দাদামহাশয় আমার ঠাকুরমাতাকে চুপি চুপি বলিয়া আসিতেন, "আমার কন্যাকে একাদশীর দিনে উপবাস করাইবেন না।" আমার ঠাকুরমাতা বৈবাহিক মহাশয়কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার কথামতন একাদশীর দিবস মাতৃদেবীকে দুগ্ধ পান করাইতেন। পাছে বাড়ীর অন্য কেহ, অথবা প্রতিবেশীরা মাতৃদেবীকে দুগ্ধ পান করিতে দেখিয়া ফেলে, তাহা হইলে মহাহুলস্থূল কাণ্ড ঘটিবে, এই ভয়ে তিনি এক বাটি গরম দুধ দালানের কুলুঙ্গীর উপর ঢাকিয়া রাখিয়া মাতৃদেবীকে বলিতেন, "তুমি দালানের কুলুঙ্গীতে যে দুধ ঢাকা আছে, তাহা যাইয়া খাও।" এই বলিয়া তিনি বধূমাতাকে গৃহে প্রবেশ করাইয়া নিজে দরজার কাছে বসিয়া থাকিতেন।

এইরূপ উদারপ্রকৃতি ধার্ম্মিক পিতার কন্যা বলিয়াই আমার মাতৃদেবী ঘোর কুসংস্কারের আবরণ ভেদ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোকে আসিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এমন কি, যে সময়ে কুসংস্কার ছিল যে মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলেই বিধবা হয়, সেই সময় আমার মাতৃদেবী আমাদের লেখাপড়া শিখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি গ্রামের লোকের নিন্দাবাদ গ্রাহ্য করেন নাই; নিজে ত পূর্ব্বেই পিতৃদেবের ইচ্ছায় লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছিলেন।

দাদামহাশয়ের পরলোক গমন

আমার দাদামহাশয়ের কখনও অসুখ দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। তাঁহার মৃত্যুটি একটি আশ্চর্য্য ঘটনা। দেহত্যাগের পূর্ব্বদিবস পর্য্যন্ত তিনি সুস্থ শরীরে গ্রামান্তরে শিষ্যবাড়ী যাইয়া নিজে রন্ধন করিয়া আহার করিলেন। সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অপরাহ্নে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া পাড়ার সকলের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিলেন। বৌ, ঝিদের সহিত তাঁহার বড় ভাব হইত। ছোট ছোট বালিকাবধূদের এক একজনকে এক একটি নাম দিতেন, যেমন, 'বুধার মা' ইত্যাদি। বধূরা তাঁহাকে যেমন শ্রদ্ধাভক্তি করিত, তেমনি ভালবাসিত। তিনি প্রতিবাসীদিগের বাড়ী গেলেই বধূরা তাঁহার সম্মুখে বহির্গত হইত। সেদিন তিনি প্রতিবাসীদিগের সহিত সাক্ষাৎ সমাপ্ত করিয়া বাড়ী আসিয়া আমার মাতুলকে (তাঁহার একমাত্র পুত্র) কতকগুলি উপদেশবাক্য বলিলেন। সন্ধ্যার পর তাঁহার কন্যাসমা শ্যালিকাকে (আমার সোনাদিদি) বলিলেন, "আজ রাত্রিতে একটু দুধ ভিন্ন অন্য কিছুই গ্রহণ করিব না।" সামান্য একটু দুধ পান করিয়াই তিনি শয়ন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহার বক্ষে একপ্রকার বেদনা উপস্থিত হইল। ঘামও হইতে

লাগিল। দিদিমাতাকে বলিলেন, "আমার সময় অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, জানকীকে ডাক।" তাহার পর নিজেই জানকী (সোনাদিদি) বলিয়া ডাকিলেন। পরম স্নেহশীলা সেবাপরায়ণা জানকী দেবী তৎক্ষণাৎ ভগ্নীপতির শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন এবং যথাসাধ্য তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। প্রতিবাসীদের তাঁহার অসুখের সংবাদ পাঠান হইল। তাঁহারা সকলেই তাঁহার স্নেহের পাত্র। ঠাকুর মহাশয়ের অসুখের সংবাদ শ্রবণে সকলেই তাঁহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অল্পকাল বসিবার পর তিনি তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "বাবারা, এখনও ঘুমাও গিয়ে, সকালে এসে আমাকে বা'র ক'রো।" তাঁহারা, এমন কি আমার দিদিমাতা পর্য্যন্ত হাঁসিতে লাগিলেন যে, এত সামান্য অসুখে ঐরূপ বলিতেছেন! তাঁহার আদেশ মতন সকলেই শয়ন করিতে গেলেন। অতি প্রত্যুষে দাদামহাশয় প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বাড়ীর প্রাঙ্গণে একখানি জলচৌকীতে বসিয়া আহ্নিক করিতে লাগিলেন। পাশের বাড়ীর হরিমোহন দত্ত তাঁহার অতি স্নেহের পাত্র ছিলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন, "ঠাকুর মহাশয়, একটু একটু বৃষ্টি হইতেছে, আপনি বারাণ্ডায় উঠিয়া বসুন।" বারাণ্ডায় উঠিবামাত্রই সামান্য একটু বমন করিয়া তাঁহার মাথাটি ঢলিয়া পড়িল। তিনি যেন সশরীরে স্বর্গে চলিয়া গেলেন। সকলে প্রভাতে আসিয়া তাঁহার প্রাণশূন্য দেহ নিরীক্ষণ করিয়া অবাক্ হইয়া গেল। তাঁহার অতিশয় প্রিয়শিষ্য কাশীনাথকে তিনি পূর্ব্বদিনই বলিয়া আসিয়াছিলেন, "কল্য প্রভাতে আমার গৃহে আসিও।" কাশীনাথ গুরুদেবের আদেশ অনুসারে প্রাতঃকালে আমাদের বাড়ী আসিয়াই গুরুদেবের প্রাণহীন দেহ প্রাঙ্গণে শায়িত দেখিয়া কপালে করাঘাত করিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। তিনি কেমন করিয়া তাঁহার মৃত্যুর দিন, এমন কি সময় পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছিলেন, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। আমার মাতৃদেবী আমার ছোট ভগিনী বগলাকে লইয়া মাসীমাতার বাড়ী গিয়াছিলেন। দাদামহাশয়, "ছোট নাতিনীকে একবার শেষ সময়ে দেখিলাম না", ইহা বলিয়াই পুনরায় বলিলেন, "অনেক দেখিয়াছি, আর প্রয়োজন নাই।" মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে আমার দাদাকে (তাঁহার একমাত্র নাতীকে) দেখাইয়া পুকুরধারে একটি পঞ্চবটি প্রস্তুত করিয়া বলিয়াছিলেন, "দাদা, আমার মৃতদেহ এইখানে সৎকার করিও।" দাদা তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন, "দাদা, তোমার কিই বা বয়স হইয়াছে, তুমি এখনই কেন অমন কথা বলিতেছ?" পঞ্চবটি অর্থাৎ আমলকী, হরিতকী, বেল ইত্যাদি পাঁচটি গাছ যেস্থানে বপন করা হয়, আমার পুণ্যাত্মা দাদামহাশয়ের দেহ সেইস্থানেই দাহ করা হইল। আমরা স্কুলের আটচালা ঘরে বসিয়া পুণ্যকার্য্য দর্শন করিলাম। এমন পরম স্নেহশীল দাদামহাশয়ের অভাবে প্রাণে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। আমি অনেক সময়ই পুকুরঘাটে যাইয়া কাঁদিতাম। দাদা সেস্থান হইতে আমায় সান্ত্বনা দিয়া উঠাইয়া আনিতেন।

দাদার বিবাহ

দাদার বয়স যখন ১৫ বৎসর, তখন কাকারা একটি বংশজের (অর্থাৎ অকুলীন) কন্যার সহিত দাদার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া মাতৃদেবীকে জানাইলেন, "গোবিন্দবন্ধুর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছি, আপনি ছেলেমেয়েদের লইয়া আসুন।" নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাতাঠাকুরাণীকে পুত্রের বিবাহ দিতে যাইতে হইয়াছিল। ছেলের মাত্র ১৫ বৎসর বয়স, এখনই বিবাহ কেন?— এ-কথা বলাতে কাকারা বলিলেন যে একটি অকুলীন কন্যার ভার প্রথমে লইতে হইবে;পরে

ইচ্ছা করিলে কুলীন কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে। তাঁহারা ঐ যুক্তি দিয়া কেন যে দাদাকে এই অল্পবয়সে বিবাহ করাইলেন জানি না। তবে আমি জানি, আমার পিতামহ এক স্ত্রী বর্ত্তমানে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করেন নাই। আমার জেঠামহাশয় এবং এক কাকাও এক স্ত্রী বর্ত্তমান অবস্থায় অন্য বিবাহ করেন নাই। আশ্চর্য্য! তাঁহারা দাদার উপর কেন এ জুলুম করিলেন? মাতৃদেবীর মুখে গল্প শুনিয়াছি যে, আমার মাতৃদেবীর বিবাহের পরও ঘটকগণ বাড়ী ছাড়িত না। দলে দলে আসিয়া পিতৃদেবের স্কন্ধে আর একটি কুলীন কন্যা চাপাইবার প্রস্তাব করিত। এইস্থানে বলা আবশ্যক যে, আমার মাতৃদেবী কুলীন কন্যা নহেন। আমার পিতৃদেব গঙ্গোপাধ্যায় বংশীয় কুলীন ছিলেন। পূর্ব্বে কুলীনদের নিয়ম ছিল, প্রথমে একটি অকুলীন কন্যা বিবাহ করিয়া পরে যত সংখ্যক ইচ্ছা কুলীন কন্যা বিবাহ করিতে পারিবেন। আমার ঠাকুরমাতা নাকি বলিতেন, "পোড়া মাটির গন্ধে ঘটকেরা বাড়ী ছাড়ে না।" এ কথাটির অর্থ হয়ত অনেকেই গ্রহণ করিতে পারিবেন না। পল্লীগ্রামে কম বাড়ীই ইষ্টক-নির্ম্মিত; খড়, টিন, ইত্যাদিতে বাড়ী প্রস্তুত হয়। আমাদের বাড়ীটী ইষ্টক-নির্ম্মিত ছিল। তজ্জন্য আমার ঠাকুরমাতা ঐরূপ বলিতেন। পুত্রের পুনর্বিবাহ দিবার অভিপ্রায় ঠাকুরমা'র মোটেই ছিল না। ঘটক আসিয়াছে জানিতে পারিলে আমার পিতৃদেব বাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করিতেন। ঠাকুরমাতাকে অতিথি সেবা করিতেই হইত। মাতৃদেবী যখন ঘটকদের জন্য রন্ধন করিতেন, সেই সময় ঠাকুরমাতা বলিতেন, "বোকা মেয়ে, জান না তুমি কাদের সেবা করছ।" আমার ঠাকুরমাতা মাতৃদেবীকে অত্যন্ত ভালোবাসিতেন। যাহা হউক, পিতৃদেবের পলায়ন করাতে ঘটকেরা কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তজ্জন্য বলিতেছিলাম, আমার কাকারা কেন যে দাদার এত বাল্যকালে বিবাহ দিলেন জানি না। দাদারও অত অল্প বয়সে বিবাহ করিতে মোটেই ইচ্ছা ছিল না। তদুপরি সেই সময়ে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বিশেষ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। "বাল্যবিবাহ" নামক একখানি সংবাদপত্র সেই সময় ঢাকাতে বাহির হইয়াছিল। আমার যতদূর স্মরণ আছে, দাদা তাহাতে একটি প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন। তখন সংবাদপত্রে এইসব ছড়া বাহির হইত —

"অল্প বয়সে বিবাহ
সিংহ হয় বরাহ"—

অল্প বয়সে বিয়ে করা
কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরা"
ইত্যাদি।

অল্পবয়সে বিবাহ করাটা যে যথার্থ পাপের কাজ, দাদা তাহা সুস্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন। তিনি যথাসম্ভব স্ত্রীর নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিতেন। পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে স্ত্রী-সহ ময়মনসিংহে একটি চাক্‌রী লইয়া বাস করেন। কিন্তু তাহাও অতি অল্পকালের জন্য।

আমার দাদা এত প্রিয়দর্শন ছিলেন যে, যাঁহারা তাহাকে দেখিতেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন। দাদার বন্ধুদের আমরা 'দাদা' বলিয়া ডাকিতাম। শুদ্ধ ডাকা নয়, তাঁহাদের বাস্তবিকই আমরা আপন দাদার মত দেখিতাম। তাঁহার কয়েকটি বন্ধুর নাম করিতেছি, — 'ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সীতানাথ দত্ত (তত্ত্বভূষণ)'[৪]। দাদা বন্ধুদের আপন ভাইয়ের মতন দেখিতেন। বন্ধুরা সকলেই মাতৃদেবীকে

'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মৃত্যুকালে পর্য্যন্ত দাদা বন্ধুদের নাম করিয়া ডাকিয়াছিলেন, — "সীতানাথ, চন্দ্র, তোমরা কি এসেছ?" দাদার প্রতিও বন্ধুদের অকৃত্রিম ভালবাসা নিম্নের ঘটনা হইতে কথঞ্চিৎ বোঝা যাইবে।

আমার মাতাঠাকুরাণী ও ছোট ভগিনী বগলা একবার পশ্চিমে বেড়াইতে যান। দুই একটি স্থান দেখিবার পরেই মাতৃদেবী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। বিদেশে পীড়িত হইলে কিরূপ দুর্দ্দশা হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। মাতৃদেবীর মনে পড়িল গয়াতে পুত্রের বন্ধু, পুত্রসম ডাক্তার চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বাস করেন। সঙ্গের লোককে বলিলেন, যেমন করিয়া পার, আমাকে গয়াতে লইয়া চল। সেখানে চন্দ্রের বাড়ীতে যাইতে পারিলে আমার আর কোনও ভাবনা নাই। 'মা' গয়াতে চন্দ্রদাদার বাড়ী পৌঁছিবামাত্র অতি যত্নে তিনি মাতৃদেবীর বিছানা পাতিয়া দিয়া মাতাঠাকুরাণীকে শোয়াইলেন। তৎপরে যথাশীঘ্র সম্ভব ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করিলেন ও নিজহস্তে সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রদাদার স্ত্রীর সহিত মাতাঠাকুরাণীর পূর্ব্বে পরিচয় হয় নাই। তিনি 'মা'কে একজন আগন্তুক অতিথিই মনে করিয়াছিলেন। চন্দ্রদাদা তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, আমার মা, ভগিনী আসিয়াছেন। ইঁহাদের সেবার যেন কোনরূপ ত্রুটি না হয়।" তখন তাঁহার স্ত্রী বুঝিতে পারিলেন ইঁহারা কে।

চন্দ্রদাদা ও তাঁহার স্ত্রীর যত্নে মাতৃদেবী সুস্থ হইয়া বাড়ী ফিরিলেন। আমার দাদার বন্ধুদের মধ্যে এখন সীতানাথদাদাই বর্ত্তমান। তাঁহাকে দেখিলে এখনও কত আনন্দ হয়। মনে হয়, তবু এখনও দাদা সম্ভাষণ করিবার একজন আছেন। তিনি আমার নাতী নাতনীদের দেখিলে স্নেহ-ভরে কত কৌতুক করেন।

আমার দাদা ব্রাহ্মনিকেতনের সকলেরই প্রিয় ছিলেন। ভারতাশ্রমের[৫] মেয়েরা সকলেই দাদাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। দুইটি শিশুকন্যা — নলিনীবালা ও মৃণালবালাকে এবং স্ত্রীকে আমারি হস্তে সমর্পণ করিয়া মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে তিনি সকলের মায়া কাটাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। আমার দাদার মতন দাদা বোধ হয় পৃথিবীতে হয় না। ভগিনীদের প্রতি তাঁহার যে কিরূপ ভালবাসা ছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এইস্থানে একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যাইবে। আমি যখন বিবাহিতা হইয়া কৃষ্ণনগরে যাই, সেখানে আমি ও আমার স্বামী একসঙ্গে ম্যালেরিয়া রোগে পীড়িত হইয়া পড়ি। আমাদের তখন একটি চাকর ও একটি ঝি ছিল বটে, তাহারা বুদ্ধি করিয়া একজন ডাক্তার ডাকিয়াছিল মাত্র, ঔষধপত্রও আনিয়া দিত, কিন্তু পথ্য আমরা একেবারে কিছুই পাইতাম না। 'স্যার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের মাতাঠাকুরাণী' সেই সময়ে আমাদের দেখিতে আসিতেন। ইতিমধ্যে টেলিগ্রাম পাইয়া দাদা, ডাক্তার মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দীকে লইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত লইলেন। দাদা কি অবস্থায় আসিলেন তাহা বলা আবশ্যক। দাদা তখন প্রাইভেট টুইশনি করিয়া মাত্র কুড়িটি টাকা পাইতেন। মুদির দোকানে মাসের চাউল বাবদ দাদার কিছু ধার হইয়াছিল। টাকার জন্য মুদি সেই দিবসই কড়া তাগাদা দিয়াছিল। মনে অত্যন্ত আঘাত পাইয়া টুইশনের টাকা ক'টি আনিয়া সেই দিবসই মুদির ধার শোধ করিবেন ভাবিলেন। কিন্তু যখনই টাকা

৫। ভারতাশ্রমের জন্য দ্রষ্টব্য বর্ত্তমান বইয়ের সংযোজন অংশে পুনর্মুদ্রিত যোগেশচন্দ্র বাগলের প্রবন্ধ 'বামাহিতৈষিণী সভা ও ভারতাশ্রম'।

লইয়া বাড়ী ফিরিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তে পিয়ন আসিয়া দাদার হস্তে একখানি টেলিগ্রাম দিয়া গেল। সেই টেলিগ্রামে আমাদের অসুখের সংবাদ ছিল। তাহা পাইয়া সেই কুড়িটি টাকা মাত্র সম্বল করিয়া ডাক্তার মহেন্দ্র নন্দীর সাথে কৃষ্ণনগরে যাত্রা করিলেন। কেবলমাত্র ছোট ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র নন্দী মহাশয়কে একটি কথা বলিয়া গেলেন, "মুদীর ব্যবস্থা আপনি করিবেন।" তখন তাঁহার অন্য ভাবনা আর কিছুই রহিল না। যথাশীঘ্র ভগ্নী ও ভগ্নীপতির রোগশয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন, আমরা পথ্যের অভাবে একেবারে দুর্ব্বল হইয়া শয্যা হইতে উত্থানশক্তিরহিত অবস্থায় পড়িয়া আছি। তিনি তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে বার্লি প্রস্তুত করিয়া আমাদিগকে খাওয়াইলেন; দিবারাত্রি অক্লান্ত সেবাদ্বারা দুইটি রোগীকে তিনি বাঁচাইয়া তুলিলেন। নিজহস্তে তিনি আমাদের মলমূত্র পর্য্যন্ত পরিষ্কার করিতেন। কাহারো দাদা কখনও এমন সেবা করিয়াছে কিনা জানি না। আমাদের যে ঝিটি ছিল সে আমার সেবা করিত বটে, কিন্তু একদিন সে আমাকে বলিয়াছিল, "আমি স্নান করিতে যাইব, তুমি কাজ সারিয়া লও।" একথা দাদার কর্ণে প্রবেশ করাতে তিনি তাহাকে বলিলেন, "ঝি, তুমি এখন ওকে বিরক্ত করিও না; তুমি স্নান করিতে যাও, আমিই ও-সকল পরিষ্কার করিব।" স্যার আশুতোষ চৌধুরীর মাতৃদেবী আমার পরম স্নেহশীল দাদার, আমাদের প্রতি সস্নেহ ব্যবহার ও সেবাশুশ্রূষা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীতে এমন ভাই আর কাহারো হয় না।" চৌধুরী মহাশয়ের মাতৃদেবী আমাকে এবং আমার স্বামীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। যখনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইত, দাদার কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। অতি বৃদ্ধবয়সেও যখন দাদার কন্যা মৃণালবালাকে দেখিতেন তখন বলিতেন, "ভগ্নীর প্রতি দাদার ব্যবহার এখনও আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে।" দাদাকে যাঁহারাই দেখিয়াছেন তাঁহারাই তাঁহার সুমিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন।

দাদা আমার অবস্থাবান্ পিতার পুত্র হইয়াও ধর্ম্মের নামে সকল ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন। অর্থের অভাব তাঁহাকে যথেষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ধর্ম্ম-ধনে ধনী হইয়াছিলেন। মৃত্যুসময়ে করজোড়ে —"তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক" বলিয়া তিনি স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন। ভগবান আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমিও "তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক" বলিয়া চলিয়া যাইতে পারি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রাহ্মসমাজে আসিবার প্রস্তাব

আমার পরম পূজনীয়া মাতৃদেবী ব্রাহ্মসমাজের সংবাদ পাওয়া অবধি আমাদের লইয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। কয়েকজন ব্রাহ্মবন্ধুর সাহায্যে ও ব্রাহ্মসমাজের 'তত্ত্ববোধিনী' এবং আরও দুই একখানি পত্রিকা পাঠে মাতৃদেবীর হৃদয় ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। হিন্দুসমাজের তৎকালীন নানাপ্রকার কুসংস্কারের প্রতি তাঁহার মনে বীতরাগ উপস্থিত হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত পিতৃদেবের আদেশ ছিল, কন্যাদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়া বয়স্কা করিয়া সৎপাত্রস্থ করা। পিতৃদেবের আদেশ পালন করা হিন্দুসমাজে থাকিলে তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইত। দাদাকে অতি বাল্যে আমার কাকারা জোর করিয়া বিবাহ দেওয়ায় আমার মাতৃদেবী আরও ভীতা হইয়াছিলেন, পাছে তাঁহারা আমাদেরও কোন সপত্নীগৃহে শৈশবেই বিবাহ দিতে বাধ্য করান। আমরা কুলীন কন্যা ছিলাম, অতএব যাহার সহিতই বিবাহ হউক না কেন তাহার পূর্ব্বে একটি বংশজ কন্যা স্ত্রী থাকিবেই। এই সকল কারণেও মাতৃদেবীকে অনেকটা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকর্ষণ করিল। সর্ব্বোপরি পৌত্তলিকতায় তাঁহার মোটেই আস্থা ছিল না। সুতরাং আবাল্য যে হিন্দুসমাজে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, যে স্থানে তাঁহার সুখসমৃদ্ধি সকলই ছিল, যেস্থানে তাঁহার মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি সকল ভালবাসার জন ছিলেন, সেই মধুর জন্মস্থানকেও ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিবার জন্য তিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। আমার বয়স যখন ১০/১১ বৎসর, তখনই আমি এ ব্যাপারের কিঞ্চিৎ আভাষ পাইয়াছিলাম. পার্ব্বতীমাসীর নিকটে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলাম। কেন যে এত পুলকিত হইয়াছিলাম জানি না; হয়ত বা ইহা ভগবানেরই প্রেরণা। যাহা হউক, ব্রাহ্মসমাজে আসিবার ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। মাতুল কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় দুই তিনজন ব্রাহ্মবন্ধুর সহিত চিঠিপত্র লিখিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের নাম ক্ষণপরেই উল্লেখ করিব। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, রাজমোহন সেন নামক জনৈক ডাক্তার ভদ্রলোক আমাদের বাড়ীতে ডিস্পেনসারী (dispensary) খুলিয়াছিলেন। তিনি তখনও ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হয়েন নাই। কিন্তু তাঁহার নির্জ্জনে সাধনা করিবার অভ্যাস ছিল। তিনি আমাদের লইয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিতে মাতৃদেবীকে পরামর্শ দেন। কিছু দিবস পরে তিনিও সপরিবারে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় এবং ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়াছিলেন। মাতুল কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মসমাজে আসিবার জন্য ইঁহাদেরই সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইঁহারা আমাদের ব্রাহ্মসমাজে আসা সম্বন্ধে যেরূপ প্রাণপণ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহার জন্য আমরা চিরঋণী ও কৃতজ্ঞ।

কোনও একটি উপলক্ষ না হইলে বাড়ী হইতে বাহির হওয়া যায় না। তজ্জন্য অনুসন্ধান করিয়া একটি পথ আবিষ্কার করা হইল। মাতৃদেবী কিছুদিন যাবৎ অসুখে ভুগিতেছিলেন। কেহ কেহ পরামর্শ দিলেন গঙ্গাস্নান করিলে রোগ সারিয়া যাইবে। এই পরামর্শ

মাতৃদেবীর হিন্দুসমাজের কারামুক্ত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের সুনির্ম্মল বাতাসে আসিবার পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইল। বাড়ীর আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবাসী সকলেই জানিলেন মাতৃদেবী গঙ্গাস্নান করিতে কলিকাতা যাইতেছেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত অভিসন্ধির বিষয় কেহই কিছু জানিলেন না।

মাতৃদেবীর হাতে একটি কপর্দ্দকও ছিল না। পিতা মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছিলেন, "এত অর্থ রাখিয়া গেলাম, সন্তানাদি লইয়া তোমার কোনই কষ্ট হইবে না।" টাকাকড়ি যাহা ছিল সকলই খুল্লতাতগণের হস্তে পড়িয়াছিল। মাতৃদেবী দাদাকে তাঁহাদের নিকট কিঞ্চিৎ অর্থের জন্য পাঠাইলেন। কাকারা জানাইলেন, যাহাদের নিকট টাকা লগ্নী আছে তাহারা কেহই এখন টাকা দিতে সক্ষম নহে। দাদা শূন্যহস্তে ফিরিয়া আসিলেন। অগত্যা মাতৃদেবী গহনা-পত্র যাহা ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থ যোগাড় করিলেন এবং তাহাই সম্বল করিয়া তিনটি অপোগণ্ড শিশু-সন্তান লইয়া, বাহ্যতঃ গঙ্গাস্নান অভিলাষে, এবং অন্তরে অন্তরে নিরাকার ভগবানের আহ্বানে কলিকাতা যাত্রার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

কলিকাতা যাত্রা

গ্রামের একখানি ছোট নৌকাতে যাত্রা স্থির হইল। আমরা তিনটি ভ্রাতা, ভগিনী, দাদার স্ত্রী (তাহাকে ইতিপূর্ব্বেই মাতৃদেবী পিত্রালয় হইতে আনাইয়াছিলেন), মাতৃদেবী, পরম পূজনীয়া সোনাদিদি ঠাকুরাণী, এবং মাতুল কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় আমাদের অভিভাবক ও চালকস্বরূপ আমাদের সাথে চলিলেন। এতদ্ব্যতীত মাতৃদেবীর অপর একজন মাস্‌তুতো ভ্রাতা ফটিকচন্দ্র গাঙ্গুলী আমাদের সঙ্গী হইলেন। আমার দাদার বয়স তখন মাত্র যোল বৎসর, আমার বার বৎসর এবং আমার ছোট বোন বগলার বয়স দশ বৎসর ছিল। যাত্রাদিবস স্থির হইল ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে। নৌকাতে জিনিষ বোঝাই হইল। আমার ছোট ভগিনীর খেলনাপত্রেই নৌকার অর্দ্ধেক ভরিয়া গেল। কত যে পুতুল, কত যে হাঁড়ী-কুঁড়ী ঘরকন্নার জিনিষ তাহাতে ছিল, তাহার সংখ্যা ছিল না। অবশ্য ঐ সকল জিনিষপত্রের মধ্যে আমারও যে অল্প ভাগ ছিল না তাহা নহে। বলিতে ভুলিয়াছি, আমাদের বাড়ীর আটটি প্রাণী ব্যতীত ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও আমাদের সহযাত্রী ছিলেন। এই নয়জন ও দুইটি মাঝি লইয়া আমাদের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ছিল এগারটি। যাত্রাদিবসে আমার দিদিমাতা ঠাকুরাণীর ও আমার মাতুল রাজকুমার মুখুটী মহাশয়ের বিমর্ষ মুখ স্মরণ করিয়া অদ্যাবধি আমার হৃদয়ে ব্যথার সাড়া পাই। তাঁহাদের সেইদিন জন্মের মতন ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম। আমার মনে পড়ে, বাড়ী ছাড়িবার দিন দিদিমাতাদের জন্য আমি স্বহস্তে অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছিলাম। আমার হস্তের অন্নব্যঞ্জন তাঁহাদের ঐ শেষ খাওয়া। হায়, প্রিয় জন্মভূমি সোহাগদল গ্রাম! — যাহা হউক, নৌকাখানি যথোপযুক্ত আহার্য্যদ্রব্যে বোঝাই করা হইল। নৌকায় রন্ধন করিবার সুবিধা কখন হইবে, না হইবে কে বলিতে পারে? তদুপরি, আমরা তখন নিতান্ত শিশু। যথাসময়ে, শুভক্ষণে বাড়ীঘর, আত্মীয়-স্বজন এবং বিষয়পত্রের মায়া ছিন্ন করিয়া ভগবানের ডাকে নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। শিশুগুলিকে কিরূপে পালন করিবেন, অর্থ কোথা হইতে আসিব — এ সকল ভাবনা মাতৃদেবীর মনে তখন কিছুই আসিল না।

আমরা প্রথমে মুন্সিগঞ্জে গেলাম। সে স্থানে 'কার্ত্তিক বারুণী' নামক একটি মেলা

হইতেছিল। সেই মেলার ঘাটে নৌকা লাগান হইল। সেস্থান হইতে পথের আবশ্যকীয় কিছু দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিয়া আমরা ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ঢাকার বুড়ীগঙ্গাতীরে নৌকা লাগাইলে শ্রীযুক্ত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগের পৌঁছান সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া নৌকায় আসিয়া আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

সেই দিবস নৌকাতে রন্ধন করিয়াই আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজন হইয়াছিল। মাতৃদেবী ও সোনাদিদি ঠাকুরাণী কিছুই খাইলেন না। তীরে উঠিয়া রন্ধন না করিলে তাঁহারা কিছুই আহার করিতেন না। সমস্ত দিবস পরে তীরে উঠিয়া তাঁহারা রন্ধন করিলেন। শ্রীযুক্ত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের দুই ভগ্নীকে আহার করিবার জন্য তাঁহার বাসায় লইয়া গেলেন।

নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগেব ব্রাহ্মসমাজে আসা সম্বন্ধে আমার মাতুল কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়কে চিঠিপত্র লিখিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ইঁহাকে কখনও দেখি নাই, কিন্তু প্রথম দর্শনেই কত আপনার লোক বলিয়া মনে হইল। তখন ব্রাহ্মসমাজে যাঁহারা আসিতেন কেহ কাহাকেও পর ভাবিতেন না। আমার মাতৃদেবীর নাম ও নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এক ভগিনীর নাম এক হওয়াতে মাতৃদেবীকে তিনি দিদি সম্বোধন করিলেন। কাজেই আমরা তাঁহাকে মামা বলিয়া ডাকিতাম। আমার মাতৃদেবীকে তিনি সহোদরার ন্যায় ভালবাসিতেন। আমরাও তাঁহাকে আপন মামার ন্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতাম। পরে জানা গেল যে, 'মাইজপাড়ার' অর্থাৎ আমার পিতার দিকে তাঁহার সহিত সম্পর্ক বিদ্যমান আছে। সেই সম্পর্কে তিনি আমার ভ্রাতা হয়েন। রক্তের সম্পর্ক আছে বলিয়াই বোধ হয় আমাদিগের অজ্ঞাতসারে আপনার জনের ন্যায় ভালবাসা জন্মিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের নূতন সম্পর্কটি এত পাকাপাকি হইয়া গিয়াছিল যে, তাহার পরিবর্ত্তন আর কোন প্রকারেই সম্ভবপর হয় নাই। একবার ঢাকাতে আমাদের বাড়ীতে তাঁহার পিসী সম্পর্কীয়া একজন মহিলা আসিয়াছিলেন। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যখন আমাদের বাসায় আসিলেন, তাঁহাকে দর্শনমাত্রই 'মামা আসিয়াছেন' বলিয়া আমরা ছুটিয়া গেলাম। আমাদের সেই পিসিমাটি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "ওমা! তোরা মামা কি বলছিস্? নবকান্ত যে তোদের ভাই! তাকে মামা ডাকছিস্ কেন?" আমরা সেই সময়ের জন্য চুপ করিয়া গেলাম, কারণ তাঁহাকে বুঝাইব কেমন করিয়া। যেরূপেই হউক, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলের সহিত আমাদের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হইয়া গিয়াছিল। একবার কোন বাড়ীর বিবাহে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সপরিবারে নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। তখন আমরা সবেমাত্র নূতন আসিয়াছি। কাহারো সহিত পরিচিত হই নাই, কাজেই আমরা নিমন্ত্রিতের তালিকা হইতে বাদ পড়িয়াছিলাম। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদ্গিকে বলিয়া পাঠাইলেন, "সোহাগদল পরিবার আমারই পরিবার। আমাদের নিমন্ত্রণ হইলে তাহাদেরও নিমন্ত্রণ হইবে; অতএব তাহারা বিবাহে যাইবে।" ইহাতে আমরা অবশ্যই অত্যন্ত খুসী হইয়াছিলাম। তাঁহারা আমাদ্গিকেও নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দিদির নাম ছিল নিত্যকালী। আমার মাতৃদেবীর নামও তাহাই। এই নিত্যকালী দেবীর কন্যাই ছিলেন আমার স্বর্ণদিদি (পূর্ণিয়ার পার্ব্বতী দাস মহাশয়ের স্ত্রী)। স্বর্ণদিদি আমাকে সহোদরার ন্যায় স্নেহ করিতেন, আমিও তাঁহাকে আপন দিদির ন্যায় ভালবাসিতাম।

যাহা হউক, ঢাকা পৌঁছিবার পর নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের দুই ভগ্নীকে আহারের জন্য তাঁহার গৃহে লইয়া গেলেন। ইহাতে সোনাদিদি ঠাকুরাণী একটু বিমর্ষ হইলেন। তাহার কারণ, কিছুদিবস পূর্ব্বে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপবীত ছিন্ন করিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন তদ্ব্যতীত তাঁহার একটি জুতার দোকান ছিল। এই জাতি-নাশা ভদ্রলোকটির গৃহে কি বলিয়া আমাদের লইয়া গেলেন? তাঁহার গৃহে অন্নগ্রহণ করিলে যে আমাদের জাতি যাইবে, এই কথা ভাবিয়াই তিনি মনঃক্ষুন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অতিশয় সদাশয়া ও বুদ্ধিমতী নারী ছিলেন। মনের এই কথা প্রকাশ করিলেন না। অবশ্য তখন তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, আমরা কোন্ পথে যাইতেছি। অপরিচিতের গৃহে আহার করিতে গেলাম বটে, কিন্তু তাঁহাদের ব্যবহারে এবং আদর অভ্যর্থনায় নিমেষের মধ্যে আপনার লোক হইয়া গেলাম। নবকান্তদাদার একটি পুত্র ও একটি কন্যাকে দেখিলাম। তখন পুত্রটির বয়স অনুমান ৭/৮ বৎসর ও কন্যাটীর বয়স দুই বৎসর হইবে। পুত্রের নাম সীতাকান্ত ও কন্যাটির নাম নির্ম্মলা (ইনিই পরে সুবোধচন্দ্র মহলানবীশের[১] সহিত পরিণীতা হয়েন)। মনে পড়ে তাঁহাদের গৃহে একটি সুন্দর সাদা বিড়াল বাচ্চা দেখিয়াছিলাম। কন্যার নামানুসারে তাহার নামও নির্ম্মলা রাখা হইয়াছিল। আমরা এই দুইটি ভ্রাতাভগিনীর পরিচয় লাভ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলাম। পরে যখন সীতাকান্ত আমাদের দেখিতে নৌকায় আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমরা কি দিয়া অভ্যর্থনা করিব ভাবিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমাদের সঙ্গে বাড়ীর গাছের ডালিম ছিল। সেই ডালিমগুলির আকার অসাধারণ বৃহৎ ছিল। একটি ডালিম তাহাকে উপহার দিলাম। ডালিমটি পাইয়া সীতাকান্ত অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। সীতাকান্ত ডালিমটির বিষয়ে পরেও অনেকদিন গল্প করিতেন।

এই ডালিম গাছটির সামান্য একটু ইতিহাসও আছে। একবার আমার দাদামহাশয় জনৈক শিষ্যগৃহে গিয়াছিলেন। শিষ্য গুরুদেবকে একটি বৃহদাকার ডালিম উপহার দিয়া বলিলেন, "এটি আপনি বাড়ী নিয়ে যান, প্রসাদ করে বীচি আমাকে দেবেন।" দাদামহাশয় একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "এই কুমড়োটি আমি কেমন করে নিয়ে যাব?" যখন শুনিলেন এটি কুমড়ো নয়, ডালিম, তখন আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। যাহা হউক, সেই ডালিম-কুমড়োটির বীচিতে আমাদের বাড়ীতেও গাছ হইয়াছিল।

পর দিবস অতি প্রত্যুষে আমাদিগের ছোট নৌকাখানি ঢাকা হইতে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিল। এদিকে শ্রীযুক্ত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, আমরা পৌঁছিয়া কোথায় উঠিব, তাহার বন্দোবস্ত করিতে রেলপথে কলিকাতা গেলেন। ঐটুকু ক্ষুদ্র নৌকাতে আমরা নয়জন লোক ও দুইজন মাঝি জিনিযপত্র বোঝাই করিয়া কত বড় নদী, কত গ্রাম অতিক্রম করিয়া চলিয়াছিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই। আজ সেই সকল কথা ভাবিতে গেলেও হৃদয়ে ভয় জাগে। কার্ত্তিকপুর নামক একটি গ্রামে কিছু তরকারী ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে আমাদের নৌকাখানি লাগান হইল। তীরস্থ এক গৃহস্থের বাড়ী লাউগাছ দেখিয়া দাদা লাউ এবং লাউশাক ক্রয় করিবার মানসে তথায় গেলেন। লাউ কিনিবার সময় কথাপ্রসঙ্গে জানিতে পারিলেন যে তাঁহারা জেঠামহাশয়ের প্রজা এবং দুই চারি দিবসের মধ্যে তাঁহার সেই স্থানে আসিবার কথা আছে। দাদা সেই সংবাদ শ্রবণমাত্র ঊর্দ্ধশ্বাসে নৌকারোহণ করিয়া মাঝিদ্বয়কে বলিলেন, "যতশীঘ্র সম্ভব এই স্থান হইতে নৌকা ছাড়িয়া দাও।" জেঠামহাশয় সেখানে আসিবেন শ্রবণে সকলেরই প্রাণে ভয় হইল, পাছে তিনি আমাদিগকে ধরিয়া ফেলেন। হয়ত বাড়ী ফিরাইয়াও লইয়া

যাইতে পারেন। সেই দিবস আহারাদি ত্যাগ করিয়া নৌকা ভাসাইয়া দেওয়া হইল। আমরা যখন সুন্দরবনে পৌঁছিলাম তখন "জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ" ভাবিয়া ভয় হইতে লাগিল। প্রবল-স্রোতা অপরিসর নদী; নদীতে এত স্রোত যে মাঝিরা উজান চলিবার সময় অতিকষ্টে গুণ টানিয়া নৌকা চালাইতেছিল। শুনা গেল একটি নৌকার মাঝিকে গুণ টানিবার সময় বাঘে লইয়া গিয়াছে। এই সংবাদ শ্রবণে আমরা সর্ব্বদাই মাঝিরা গুণ টানিতে উঠিলে ভয়ে ভীত থাকিতাম। ঈশ্বরের কৃপায় আমরা নীরবে এবং নির্ব্বিঘ্নে সুন্দরবন অতিক্রম করিয়া গেলাম।

এক দিবস সমস্ত দিন পরে সন্ধ্যাকালে একটি বৃহৎ নদীতীরে আমাদের রন্ধনের আয়োজন করা হইল। সোনাদিদি ও মাতাঠাকুরাণী রন্ধনে ব্যস্ত, এমন সময়ে দেখা গেল কতকগুলি লোক সেই স্থানে একবার আসিতেছে ও একবার যাইতেছে। মনে হইল তাহারা যেন পরামর্শ করিতেছে। তাহাদের ডাকাতের দল বলিয়াই আমাদের সন্দেহ হইল। নচেৎ এইরূপভাবে আনাগোনা ও গোপন পরামর্শ করিবে কেন? ভয়ে সকলের প্রাণ উড়িয়া গেল; রন্ধনের আর প্রয়োজন রহিল না। যথাসম্ভব শীঘ্র জিনিষপত্রগুলি নৌকায় তুলিয়া মাঝিদের বলা হইল, তোমরা অবিলম্বে নৌকা ছাড়িয়া দাও; এবং নদী পাড়ি দিয়া অন্য তীরে চলিয়া যাও। রাত্রি তখন অনেক হইয়াছে; আমরা একেবারে সঙ্গীহীন। অন্যদিন অপর নৌকার সাথে সাথে আমাদের নৌকা চলিতেছিল। গুটিকতক নৌকা একসঙ্গে চলা ও একস্থানে রাত্রিযোগে সকল নৌকাগুলিকে বাঁধিয়া রাখাকে 'বহর' বলে। আমরা সেইদিন 'বহর' হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। যাহা হউক, অপর পারে আসিয়া একখানি নৌকা দেখিতে পাইলাম। সেই নৌকাখানিও সেইদিন বহর হারাইয়া ফেলিয়াছিল। নৌকাখানি দেখিয়া আমরা কত যে সাহস পাইলাম তাহা বোঝান শক্ত। নৌকার লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে তাহারাও কলিকাতার যাত্রী। শুনিয়া আমরা আরও নিশ্চিন্ত হইলাম। কথা হইল ঐ নৌকাখানি যখন ছাড়িবে, আমাদের নৌকাখানিও উহাদের সাথে ছাড়িয়া দিতে হইবে; পুনরায় যেন বহর না হারাইয়া যায়। অপর নৌকাখানি হাঁস ও মুরগী বোঝাই করিয়া বিক্রয়ার্থ কলিকাতা যাইতেছিল। শেষ রাত্রিতে যখন তাহারা নৌকা ছাড়িবার উপক্রম করিতেছে, হাঁসগুলির ডাকে আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মাঝিরা ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাহাদের সাথে নৌকা ছাড়িয়া দিল। সেই নৌকাখানির সাথে সেই দিবস দেখা না হইলে কি হইত বলা যায় না। একমাত্র ভগবানই আমাদের কাণ্ডারী। তিনিই অসময়ে আমাদের সঙ্গী জুটাইয়া দিলেন।

নৌকাখানির সহিত চলিতে চলিতে কিছুদূর যাইয়া বড় বহর পাওয়া গেল। এইবারে নৌকার এত ভীড় হইল যে এক নৌকার গুণ অন্য নৌকার দড়ির সহিত জট পাকাইয়া গেল। এই জট পাকানোকে মাঝিদিগের ভাষায় 'ভেজাল' বলে। ভেজাল ভাঙ্গিতে অনেক সময় লাগিল। ইতিমধ্যে আমরা কালীগঞ্জ নামক একটি স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখানকার হাট হইতে আহার্য্যদ্রব্য ক্রয় করা হইল। হাট হইতে একপ্রকার বৃহদাকার মূলা ক্রয় করা হইল ঐরূপ বৃহৎ মূলা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। দুই একটি মূলা কলিকাতা পর্য্যন্ত লইয়া আসা হইয়াছিল। কলিকাতার অনেকেই ঐরূপ মূলা দেখেন নাই। কাজেই তাহা অত্যন্ত কৌতুকের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বহু দিবস যাবৎ সেই মূলা আমাদের বারাণ্ডায় টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিলাম। সকলেই তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাইত। ক্রমে আমরা কলিকাতায় 'বেলেঘাটা'র খালে আসিয়া প্রবেশ করিলাম। দয়াময়, তোমায় প্রণাম করি। আমাদের ছোট

নৌকাখানি কত বাধা বিঘ্ন ও বিপদের পথ অতিক্রম করিয়া তোমারই কৃপায় গন্তব্যস্থানে আসিয়া পৌঁছিল।

কলিকাতা আগমন

শ্রীযুক্ত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, আমরা আসিয়া কোথায় উঠিব তাহারই বন্দোবস্ত করিতে পূর্ব্বেই রেলযোগে কলিকাতা রওয়ানা হইয়াছিলেন। আমরা পৌঁছিবার কিয়ৎকাল পরেই তিনি কয়েকজন ব্রাহ্মভ্রাতাসহ আমাদের নৌকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময়কার অপূর্ব্ব দৃশ্য বর্ণনা করিতে আমার লেখনী অশক্ত। তখনকার ব্রাহ্মদের আননে যে কিরূপ স্বর্গীয় ভাব ছিল তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। ভাষায় সে ভাবের পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নহে।

তৎকালে সকলেই আপন পিতা-মাতা ভ্রাতা-ভগিনীদের ত্যাগ করিয়া সত্যধর্ম্মের আকর্ষণে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় লইয়াছিলেন। পারিবারিক জীবনের সুখস্বচ্ছন্দতার অভাব তাঁহাদের অত্যন্ত ছিল। এইজন্য সেই সময়ে একজন ব্রাহ্ম অপর ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকাদের আপন সহোদর সহোদরার ন্যায় দেখিতেন। প্রত্যেকেই অপরের স্নেহ ভালবাসা এবং ভক্তি পাইবার নিমিত্ত লালায়িত থাকিতেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মরা সকলেই এক ঈশ্বরের পুত্রকন্যা; ভাই ভগিনীদের ত পর ভাবিলে চলিবে না। বহুকাল পরে বিদেশ হইতে জননী ও ভাই ভগিনীরা স্বদেশ প্রত্যাগমন করিলে আপনারজনেরা যেইরূপ তাহাদ্গিকে গ্রহণ করেন, যথার্থ সেইরূপ প্রাণের টানে আমাদ্গিকে ইঁহারা গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বরদানাথ হালদার, ইঁহারা আমাদ্গিকে নৌকা হইতে অশ্বযানে তুলিয়া বহুবাজারের একটী বাটীতে লইয়া গেলেন। আমি তখন নিতান্ত বালিকা ছিলাম। অশ্বযানের বৃহৎ অশ্বগুলি দেখিয়া একটু ভীতা হইলাম। আমি গ্রাম্য বালিকা; পদ্মাকূলে সোহাগদল গ্রামে আমার দ্বাদশবর্ষ অতিবাহিত হইয়াছে। পদ্মাতীরে অনেককে ঘোড়া দৌড়াইয়া যাইতে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু ঐরূপ বৃহদাকার অশ্ব পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। যাহা হউক, বহুবাজারের ফটকে আসিয়া যখন গাড়ী থামিল, আমাদিগের জন্য অনেক ভগ্নীরা আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা সমাদরে আমাদ্গিকে উপরে লইয়া গেলেন। জীবনে যাঁহাদ্গিকে পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, যাঁহারা কোন প্রকারে আমাদের রক্ত-সম্পর্কিতা নহেন, তাঁহারা কত আদরে কত যত্নে আমাদের তাঁহাদিগের মধ্যে স্থান দিলেন। সকলেই স্নেহভরে আমাকে বহু কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমরা পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়াছি ইঁহারা আমাদের 'বাঙ্গাল' ভাষা শ্রবণে যদি উপহাস করেন, সেই আশঙ্কায় কথা খুব কম ও অতি সাবধানে বলিতে লাগিলাম। অবশ্য অল্পদিনের মধ্যেই ভাষা শোধরাইয়া লইলাম।

আমরা মধ্যাহ্ন ভোজনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই বহুবাজারের বাটীতে পৌঁছাইয়াছিলাম। সেইস্থানে তাঁহাদের সহিত আমাদের আহারের ব্যবস্থা হইল। ইহাতে অবশ্যই সোনাদিদি ঠাকুরাণী প্রাণে আঘাত পাইলেন। আমরা ব্রাহ্মণ-কন্যা; এইখানে সকলের সহিত আহার করিলে যে আমাদের জাতি নষ্ট হইবে। শ্রীযুক্তা অন্নদায়িনী সরকার, রাধারাণী লাহিড়ী[৮], আমার সোনাদিদি ও মাতাঠাকুরাণীর জন্য আতপ চাউল ইত্যাদি আনাইয়া ছাতের উপরে একটি লোহার আংঠীতে রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিলেন। তাঁহারা রৌদ্রে সেই অনাচ্ছাদিত

ছাতে রন্ধন করিয়া আহার করিলেন। মেয়েরা সকলেই তাঁহাদের প্রসাদ পাইবার জন্য সেই ছাতে বাসিয়াছিলেন, কি সুন্দর দৃশ্য! তাঁহারা সামান্য ডালভাত রন্ধন করিয়াছেন, তাহাই সামান্য আহার করিবার জন্য ইঁহাদের এত আগ্রহ। কত আপনার জন হইলে মানুষ এইরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখাইতে পারে।

যে কয়েকজন ব্রাহ্ম মিলিত হইয়া এই বহুবাজারের বাটীটি ভাড়া করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা আবশ্যক। হরগোপাল সরকার ও তাঁহার পত্নী অন্নদায়িনী সরকার (সেই সময়ে তাঁহাদের একটিমাত্র শিশুকন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; তিনি পরে সুবালা নামে পরিচিতা হয়েন), প্রাতঃস্মরণীয়া কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী (অন্নদায়িনী ও রাধারাণী সহোদরা ভগ্নী ছিলেন)। ইঁহারা পূজ্যপাদ ৺রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী। ইঁহাদের দুই ভগিনীকে সেই সময় হইতে বড়দিদি ও ছোটদিদি বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলাম। সেই দিবস হইতে ইঁহাদের দুই ভগিনীর নিকট সহোদরার ন্যায় স্নেহ ভালবাসা পাইয়া ধন্য হইয়াছি। বিধুমুখীদিদি, যিনি পরে রজনীনাথ রায়[৯] মহাশয়ের সহিত পরিণীতা হয়েন; পূর্ব্বে তাঁহার সহিত পরিচিতা ছিলাম না। কিন্তু তিনি আমাদের স্বদেশীয়া। আমরা দেশে থাকিতেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম করিয়া আমাদের সকলে বলিত, "তোমরাও বিধুমুখীর মতন চলে যাবে" ইত্যাদি। তাঁহার সহিত আমরা দুর সম্পর্ক হইলেও সম্পর্কিতা ছিলাম। সকলের উপর ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্ক। তিনিও চিরকাল আমাদিগকে ছোট ভাইবোনের মতন ভালবাসিয়া গিয়াছেন। তাহার পর, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, যিনি 'অবলা-বান্ধব' নামে পরিচিত ছিলেন; তিনিও আমার স্বদেশবাসী এবং জ্ঞাতিভাই। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সপরিবারে। রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী মনমোহিনী বন্দ্যোপাধ্যায়। হেমাঙ্গিনী দেবী, পরে যিনি ভুবনমোহন সেন মহাশয়ের পত্নী হন; সেই সময়ে তাঁহারা বিবাহিত হয়েন নাই। অল্প কয়েকদিবস পরে এই বাটীতেই তাঁহাদের বিবাহকার্য্য সমাধা হয়। আমরা এই সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্ম বিবাহ দেখিলাম।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ

আমরা যে দিবস কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিলাম, সেই দিবস সৌভাগ্যক্রমে রবিবার ছিল। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে সকলে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আমাদিগকেও প্রস্তুত হইতে বলিলেন। তখন বুঝিতে পারি নাই আমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন। মন্দিরের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া যখন গ্যালারীর উপর উঠিলাম তখন এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিলাম। জীবনে এরূপ দৃশ্য ত কখনও দেখি নাই। আচার্য্য কেশবচন্দ্র বেদীতে উপবিষ্ট। তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে যেন জ্যোতি নির্গত হইতেছে। আমার সোনাদিদি পশ্চাৎদিকে পদদ্বয় রাখিয়া ভূমিতে উপবেশন করিলেন। তিনি কেন ঐরূপ বসিলেন জিজ্ঞাসা করাতে বলিয়াছিলেন, "ইনি ত মানুষ নহেন, ইনি দেবতা। দেখিতেছ না ইঁহার মুখ হইতে কিরূপ জ্যোতি বাহির হইতেছে? ঐদিকে চরণ রাখিয়া কি বসিতে পারি?" সোনাদিদি একজন বৃদ্ধা হিন্দু-রমণী, তিনি কেশবচন্দ্রের মুখমণ্ডল দেখিয়া ও তাঁহার মুখ-নিঃসৃত অমৃতবাণী শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। অন্যদিকে ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল[১০] মহাশয়ের সুমধুর সঙ্গীত এবং অর্গান বাদন; সকলই আশ্চর্য্য, সকলই স্বর্গীয়। এই স্বর্গশোভা দর্শন করিয়া আমরা মুগ্ধ এবং কৃতার্থ

হইয়া গেলাম। হে ঈশ্বর! সকল কুসংস্কারের জাল ছিন্ন করিয়া, সকল মাটির কল্পিত পুতুল-দেবতাগুলি চুরমার করিয়া ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া তোমার নিরাকার রূপে মুগ্ধ ও বিমোহিত করিতে এ তুমি কোথায় আনিলে? এ আনন্দ যে প্রাণে ধরে না! এ সুখ কোথায় রাখিব? হে দয়াময়! তোমাকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব জানি না। ... ব্রহ্মমন্দির হইতে যখন বাড়ী ফিরিলাম তখন যেন অন্য মানুষ হইয়া গিয়াছি, — যেন নূতন জীবন লাভ করিলাম।

মুসলমানপাড়া লেনের ছাত্রাবাস

আমরা বহুবাজারের ঐ বাড়ীতে বোধ হয় ২/৩ দিবস বাস করিয়াছিলাম। এই অল্প সময়ের মধ্যে কতগুলিন ভ্রাতা ভগ্নী লাভ করিলাম; তাহাদের স্নেহ ভালবাসা এ জীবনে ভুলিব না। আমাদের জন্য মুসলমানপাড়া লেনে একটি বাড়ী ভাড়া লওয়া হইল। এই বাড়ীটি ৩৩ নং মুসলমানপাড়ার ব্রাহ্ম ছাত্রাবাসের অতি নিকটে ছিল। সেই ছাত্রাবাসে আমাদিগের আত্মীয় এবং পরিচিত কেহ কেহ বাস করিতেন। তাঁহারা অনেক সময় আমাদিগের খোঁজ খবর লইতেন। জগৎচন্দ্র সরকার (আমাদের গ্রামের জামাতা ও আমার বন্ধুর স্বামী) আমাদের গৃহে বাস করিতেন।

আমরা প্রতি রবিবারে ব্রাহ্মসমাজে যাইতাম। তথায় আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের উপাসনা এবং উপদেশ শ্রবণ করিতাম। আমার বেশ স্মরণ আছে, একদিন উপাসনান্তে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি উপদেশ হইল বল ত?" আমি তাঁহার কথার উত্তরে কিছু বলিতে না পারিয়া বড়ই লজ্জিত হইলাম। কত বৃহৎ উপদেশ, অতগুলি কথা কি আমি স্মরণ করিয়া রাখিয়াছি, না বলিতে পারি? তাহার পরের রবিবার উপাসনার সময় ক্রমাগতই ভাবিতে লাগিলাম 'কি উপদেশ হইল' আজ কেহ জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দিব। আচার্য্যের কোন কথাটি স্মরণ করিয়া রাখি কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। অত্যন্ত ভাবনা হইল, আজও আমাকে বোকা বনিতে হইবে। উপাসনা সমাপ্ত হইলে ভিতর হইতে সম্মুখের ছাতে বাহির হইবামাত্র শুনিতে পাইলাম সকলে কথোপকথন করিতেছেন সেইদিনকার উপদেশ কি হইল। আমি তাহা শুনিলাম এবং মনে মনে স্থির করিয়া লইলাম, আজ কেহ জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দিব? সত্যই বাড়ী আসিবামাত্র একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ মন্দিরে কি উপদেশ শুনিলে?" আমি তাঁহাকে কি উপদেশ শুনিয়াছি বলিলাম। মনে মনে ভাবিলাম আজ বোকা বনি নাই; অবশ্য জানি না, আমার প্রশ্নকারী আমার উত্তর শুনিয়া কি ভাবিলেন। আমি কিন্তু অন্যের মুখে শুনিয়া তাহার উত্তর দিয়াছিলাম। তাহার পরে ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া ক্রমাগত ভাবিতাম, এতগুলি কথা আচার্য্য বলিতেছেন, তাহা হইতে কেমন করিয়া সারমর্ম্মটুকু গ্রহণ করিব। তখন আমার বয়স অল্প এবং অল্প কয়েক দিবসমাত্র ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা শুনিতেছি। কাজেই আসল কথাটুকু বুঝিয়া লওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর হইত। তজ্জন্য প্রতি রবিবারেই উপদেশের সারাংশ অন্যের মুখে শুনিয়া লইতাম। ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিতে ও গাহিতে আমি বড়ই ভালবাসিতাম। অভয়বাবু নামক এক ভদ্রলোক আমাদিগকে — আমাকে, ভগিনী বগলাকে ও ভ্রাতৃবধূকে —

"— আজি গাও গভীর স্বরে
প্রেমভরে নগরে —
মধুর ব্রহ্মনাম,"

এই নগর সঙ্কীর্ত্তনটি উচ্চৈঃস্বরে গাহিতে শিখাইয়াছিলেন।

অল্পদিনের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের সকলের সঙ্গেই আমরা পরিচিত হইলাম। সকলেই আমাকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। একদিবস লাখুটিয়ার জমিদার স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র রায়ের পত্নীর প্রকাণ্ড জুড়ীগাড়ী আমাদের দরজায় আসিয়া থামিল। তিনি আমাকে তাঁহার গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া আচার্য্য কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ভিক্টোরিয়া স্কুলের[১১] প্রাইজ বিতরণ দেখিতে লইয়া গেলেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেই সময় কাঁকুড়গাছির একটি বাগানবাড়ীতে ধর্ম্মবন্ধুদিগকে লইয়া "ভারতাশ্রম" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন (খুব সম্ভব ১৮৭১ সনে)। ভারতাশ্রমেই ভিক্টোরিয়া স্কুল হইত। এইরূপ ব্যাপার পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে; আমাদের বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাইজ দেখিয়াছি বটে, নিজেও প্রাইজ পাইয়াছি। কিন্তু তাহার সহিত ইহার তুলনা হয় না। আমার বিশেষ পরিচিতা এবং আত্মীয়া বিধুদিদির পার্শ্বে উপবেশন করিলাম। পূর্ব্বে লিখিয়াছি, তিনি আমাদের কিছু পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলেন। তাঁহার নাম আমাদের বিক্রমপুরের ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনিত হইত। বিধুদিদি সেই সময় আমার আদর্শ ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে কিরূপ চলিতে হয় সকলই তাঁহার জ্ঞাত ছিল।

আমি ব্রাহ্মসমাজে আসিবার পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, ব্রাহ্মরা গোরুর মাংস আহার করেন। ঐ জিনিযটির উপর আমার অত্যধিক ঘৃণা ছিল। দেখিলাম কতকগুলি লোক চাপকান পরিধান করিয়া কি একটি সামগ্রী সকলের সম্মুখে ধরিতেছে। অনেকেই তাহা হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক চামচ দ্বারা গলাধঃকরণ করিতেছেন। আমি মনে মনে স্থির করিলাম, বিধুদিদি যদি গ্রহণ করেন তাহা হইলে আমিও খাইব। তিনি সেই জিনিযটি কিন্তু লইলেন না। তখন আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল উহা সুনিশ্চিত গোমাংস, কাজেই আমিও লইলাম না। পরে যখন জানিতে পারিলাম উহা বরফ দিয়া জমান দুগ্ধ, তখন স্বীয় অনভিজ্ঞতা বুঝিতে পারিয়া হাসিলাম। অবশ্য আমার উহাতে কোনই দোষ ছিল না। যে জিনিষ জানা নাই তাহা কেহ না শিখাইলে কখনও শিক্ষালাভ করা যায় না। এখন কতই 'আইসক্রীম্' খাইয়া থাকি। প্রতিবার আইসক্রীম্ খাইবার সময় ঐ ঘটনাটি মনে পড়ে। যখন নাতী নাতনীদের নিকট ঐ ব্যাপারটি বলি, তখন তাহাদের হাসির ফোয়ারা ছুটিয়া যায়। যাহা হউক, রায়মহাশয়ের পত্নী আমাকে যথাসময়ে গৃহে পৌঁছাইয়া দিলেন। তাঁহার সস্নেহ ব্যবহারে কৃতজ্ঞতায় মস্তক তাঁহার নিকট অবনত হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেই সময়কার ব্রাহ্মগণ একে অপরকে এতই আপনার জন বলিয়া মনে করিতেন যে, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন বা ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারাই কেবলমাত্র বুঝিতে পারিবেন, অন্যের তাহা অনুভব করা অসাধ্য। আমার মাতৃদেবী অনেকেরই জননী এবং ভগিনী-স্থানীয়া হইলেন।

৩৩ নম্বর মুসলমানপাড়ার ছাত্রাবাসে আমাদিগের আত্মীয় রজনীনাথ রায় ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নন্দকুমার রায় বাস করিতেন। ছাত্রাবাসের আহারের ব্যবস্থা অতি কদর্য্য ছিল। এক্ষণে আমার মাতৃদেবী ও সোনাদিদিঠাকুরাণীকে পাইয়া তাঁহারা আরও দুই একজন বন্ধুসহ আমাদিগের বাটীতে আহারের ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। তাঁহাদিগের এম, এ, পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী

১১। দ্র। সংযোজন অংশে মুদ্রিত যোগেশচন্দ্র বাগলের প্রবন্ধ : 'স্ত্রী শিক্ষা আন্দোলনে কেশবচন্দ্র সেন'।

হইয়াছিল। ছাত্রাবাসের আহারের ব্যবস্থায় তাঁহাদিগের অত্যন্ত অসুবিধা হইত। সোনাদিদি এবং মাতাঠাকুরাণীর রন্ধন তাঁহাদের অমৃততুল্য মনে হইল।

মাঘোৎসবের সময় একদিন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাড়ী ফিরিয়া দেখি আমাদের বারাণ্ডাতে কপি, আলু, কড়াইসুঁটি ইত্যাদি তরকারী পর্ব্বতসমান স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া আছে। ভাবিয়া পাইলাম না, এ সমস্ত কোথা হইতে আসিল। পরে জানিতে পারা গেল যে, ছাত্রগণ এম, এ, পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন। তাঁহারা একটি ভোজ দিবেন। তজ্জন্য ঐ জিনিষগুলি আনীত হইয়াছে। আমার সোনাদিদিঠাকুরাণী ও মাতৃদেবীর অমৃততুল্য রন্ধন সকল ব্রাহ্মদের খাওয়াইতে হইবে। যাঁহাদের রন্ধন-নৈপুণ্যে তাঁহারা দেহে বল পাইয়াছেন এবং পরীক্ষায় উত্তমরূপে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন, অন্য সকল ব্রাহ্মভ্রাতাদের সেই অন্নব্যঞ্জন না খাওয়াইলে কি তাঁহারা তৃপ্ত হইতে পারেন? তাঁহারা যে মাতা ও ভগিনী লাভ করিয়াছেন, তাহাও ত সকলকে দেখাইতে হইবে।

আমরা সকলে অবিলম্বে আহারাদি সমাপন করতঃ তরকারী কুটিতে বসিয়া গেলাম। মাতৃদেবী ও সোনাদিদিঠাকুরাণী যথাসম্ভব শীঘ্র রন্ধনকার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। রাত্রিতে ৩৩ নম্বর মুসলমানপাড়া লেনে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অঘোরনাথ গুপ্ত[১২], কান্তিচন্দ্র মিত্র[১৩] প্রভৃতি প্রচারকগণ এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি অন্যান্য ব্রাহ্মরা আহারে নিমন্ত্রিত হইলেন। রন্ধনান্তে ছাত্রেরা নিজেরাই তরকারীর হাঁড়ী মাথায় করিয়া ৩৩ নম্বরে বহন করিয়া লইয়া গেলেন। কোথাও ভৃত্যের সাহায্য নাই। দৃশ্যটি বস্তুতঃ চমৎকার। রন্ধন করিলেন মাতা ভগিনী, বহনকার্য্যাদি ব্যাপার সম্পন্ন করিলেন ছাত্রেরা। তাঁহারা আমাদিগের জন্য অন্নব্যঞ্জন রাখিয়া বাকী সব ৩৩ নম্বরে লইয়া গেলেন। আমাদিগের জন্য কিছু মিষ্টান্ন এবং পাঁউরুটিও পাঠাইয়া দিলেন। আমরা দুই ভগিনী ও ভ্রাতৃবধূ আহার করিতে বসিয়া ঐ শেযোক্ত অদ্ভুত জিনিষটি কি, এবং কেমন করিয়া আহার করিতে হয়, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। উহা মুখে তুলিবার পূর্ব্বে একবার নাসিকাগ্রে ঠেকাইয়া দেখিলাম, উহাতে ভয়ানক দুর্গন্ধ। কাজেই উহা আর আহার করা হইল না। এক্ষণে অবশ্য ঐ জিনিষটি প্রতিদিবসই গ্রহণ করি। পূর্ব্বে যাহা দুর্গন্ধ ছিল, অভ্যাসক্রমে তাহাই সুগন্ধে পরিণত হইয়াছে। যাহা হউক, ৩৩ নম্বরে যাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, সকলেই অন্নব্যঞ্জনের প্রশংসা করিলেন। এবং অতি তৃপ্তির সহিত আহার করিলেন।

শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেন

শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায়ের সহিত তাঁহার সমপাঠী বন্ধু শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেন পরীক্ষার পূর্ব্বে আমাদের বাটীতে আহার করিতেন। তিনি মাতৃদেবীকে পেঁপের অম্বল রন্ধন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেই দিবস পেঁপের অম্বলটি এতই সুস্বাদু হইয়াছিল যে, সেইরূপ সুস্বাদু অম্বল পূর্ব্বে কেহ আহার করেন নাই। কোন একজন ব্রাহ্ম নাকি সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উদরস্থ করিবার পর আশীটি রসগোল্লা ভোজন করিয়াছিলেন। এই ব্যাপার লইয়া অত্যন্ত আমোদ হইয়াছিল।

ছাত্রগণ আপন গৃহে মাতা, ভগিনী, আত্মীয়াদের নিকট যেইরূপ আবদার করিতেন, আমাদের গৃহও তদনুরূপ তাঁহাদের আবদারের স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ

সেনের মাতাঠাকুরাণী গঙ্গাস্নান করিতে কলিকাতা আসেন এবং পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। শ্রীযুক্ত সেনমহাশয় তাঁহাদিগের ছাত্রাবাসে মাতার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া আমাদের বাটীতে তাঁহাকে আসিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার মাতাঠাকুরাণী পুত্রের কথামতন, যদিও আমরা তাঁহার অপরিচিতা ছিলাম,—আমাদের বাটীতে আসিয়া স্নানাহার করিয়া পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চলিয়া গেলেন। কে জানিত যে কালে তিনিই আমার শ্বশ্রূমাতা হইবেন? আমার শ্বশ্রূমাতার সহিত ঐ একদিন মাত্র দেখা হইয়াছিল, আমার বিবাহের সময় তিনি স্বর্গবাসিনী।

শিক্ষার ব্যবস্থা

এক্ষণে আমাদেব শিক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ হইবে, তাহাই সকলের ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। বেথুন স্কুলেব মেমসাহেব আমাদের ব্রাহ্মসমাজে আগমনবার্ত্তা পাইয়া আমাদের বাটীতে একদিন আসিয়া মাতৃদেবীকেধরিলেন, মেয়েদের বেথুনে দিতে হইবে। তিনি মা'কে বলিলেন, "কেশবের স্কুলে দিও না, আমার স্কুলে দাও।" কয়েকজন ব্রাহ্মবন্ধুর সহিত পরামর্শে মাতৃদেবী আমাদের বেথুনে দিলেন না। কিন্তু মেমসাহেবও ছাড়িবার পাত্রী নহেন। তিনি মাতৃদেবীকেই একটি বৃত্তি দিয়া বেথুনে টানিয়া লইয়া গেলেন। মাতৃদেবী দশটার সময় অল্প হবিষ্যান্ন আহার করিয়া বাস (bus)-এ চড়িতেন এবং অনেক মেয়েদের বাড়ী ঘুরিয়া বেথুনে যাইতেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়াতে তিনি তিনদিনের বেশী যাইতে পারেন নাই। বেথুন হইতে মাতৃদেবীকে তিনদিনের জন্য তিনটি টাকা বৃত্তি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ব্যাপারটি লইয়া আমাদের হাসির অন্ত ছিল না।

ব্রাহ্মবন্ধুগণ একত্রে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, নবাগতা মহিলাদিগের জন্য একটী স্কুল স্থাপন করিতে হইবে। স্কুল স্থাপন করিতে হইলে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে যাহারা একমাত্র ভগবানকে কাণ্ডারী করিয়া পিতামাতা, গৃহ, পরিজন, সম্পত্তি সমস্তই ত্যাগ করিয়া তৃণসম ভাসিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা অর্থ কোথায় পাইবেন? কিরূপে সামান্য অর্থ ব্যয় করিয়া একটী ভাল স্কুল স্থাপিত করিতে পারা যায়, সেই চিন্তাই তাঁহারা করিতে লাগিলেন। অবশেষে, যাহাতে মেয়েদের গাড়ীভাড়া ভিন্ন অন্য কোন খরচই হইবে না, তাহার বন্দোবস্ত হইল। স্থির হইল, লাখুটিয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র রায়ের বাটীতে তাঁহাদের ভোজন-প্রকোষ্ঠে, আহার সমাপনান্তে ক্লাস বসিবে। ঘরে যে সকল চেয়ার টেবিল ছিল তাহাতেই ক্লাস বসিতে লাগিল। ছাত্রীগণ সামান্যা হইলেও শিক্ষকগণ সামান্য নহেন। কয়েকজন বড় বড় বিদ্বান্ ব্যক্তি এক এক ঘন্টা করিয়া স্কুলে পড়াইবার ভার লইলেন। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন স্বর্গীয় রজনীনাথ রায়, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, অম্বিকাচরণ সেন ও শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দত্ত। এখন মনে হয়, তখন যদি একটু বেশী মেধাবিনী হইতাম, এইসব শিক্ষকদের পরিশ্রম বৃথা যাইত না। ছাত্রীদিগের মধ্যে বয়সে আমি অনেকের অপেক্ষা ছোট ছিলাম। প্রায় সময়ই বহু বিষয় আয়ত্ত করিতে পারিতাম না। কিন্তু যে সকল বিষয় বুঝিতাম, তাহাতে অত্যন্ত আনন্দ পাইতাম।

রাখালবাবুর বাড়ীতে সাহেবী ধরণে খাওয়া দাওয়া হইত। আমি সদ্য পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মণ-গৃহ হইতে আসিয়াছি; ঐ সকল দর্শন করিয়া আমার একটু অস্বচ্ছন্দতা বোধ হইত। পড়িতে পড়িতে তৃষ্ণার্ত্ত হইলে কলে জল খাইতে যাইতাম। একদিন দেখিলাম উহাদের বাবুর্চ্চী রন্ধনের

জন্য একটি মুরগী কলে ধুইতেছে। উহা দেখিয়া আমার জল পান করা বন্ধ হইয়া গেল। যাহা শিশুকাল হইতে অখাদ্য বলিয়া জানিতাম, তাহা দেখিয়া অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিল। সাধারণতঃ আমার ঘৃণাবৃত্তি একটু বেশী। আমার গলা শুষ্ক হইয়া যাইত, তথাপি ঐ কলে আমি কিছুতেই জল পান করিতে পারিতাম না। .. কালক্রমে আমি মুরগীও আহার করিয়াছি; কিন্তু উহা অভ্যাস করিতে আমার অনেকদিন লাগিয়াছিল।

ইহার পরে স্বর্গীয় ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীর মহাশয়ের দ্বিতল গৃহে আমাদিগের স্কুল উঠিয়া গেল। আজিও খাস্তগীর মহাশয়ের সস্নেহ ব্যবহারের কথা মনে পড়ে এবং তাঁহার উদ্দেশে ভক্তিশ্রদ্ধা অর্পণ করি। অনেক দিবসই ক্লাস বসিবার পূর্ব্বে স্কুলে পৌঁছিতাম। খাস্তগীর মহাশয় আমাকে স্নেহভরে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, "কি খেয়েছ, কি রকম রান্না হ'ল" ইত্যাদি। একদিন আমি নিজে রান্না করিয়া খাইয়া গিয়াছি শুনিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তাঁহার কন্যা সৌদামিনী ও মোহিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, এই মেয়েটি নিজে রান্না করিয়া খাইয়া স্কুলে আসিয়াছে; তোমরা পার?" তাঁহার মেয়েদের দেখিয়া আমার বড় ভাল লাগিল। সৌদামিনী (পরে Mrs. B. L. Gupta) আমার বয়োজ্যেষ্ঠা ছিলেন; মোহিনী আমার সমবয়সী। তাঁহার আরও দুইটি কন্যা ছিল, কুমুদিনী ও বিনোদিনী। বিনোদিনীর পুত্র অধুনা প্রসিদ্ধ মেয়র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। মোহিনীর সঙ্গে পরে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মে। সময়ে তাহা লিখিব।

ঢাকা গমন

ছয় মাস কলিকাতা বাসের পর আমাদের ঢাকা যাওয়া স্থির হইল। কলিকাতায় থাকিতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন। ঐ কারণে আমাদের 'ঢাকা' যাইয়া থাকাই স্থির হইল। ঢাকাতে তখন জিনিষপত্র অত্যন্ত সস্তায় পাওয়া যাইত। কাজেই অল্পব্যয়ে ঢাকায় স্বচ্ছন্দভাবে থাকা যাইবে।

আমরা ঢাকা যাইয়া শ্রীযুক্ত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে বাস করিতে লাগিলাম। ফরাসগঞ্জে একটি একতালা গৃহে তিনি থাকিতেন। তাঁহার সহিত আমাদের সম্পর্কের বিষয় অন্যত্র লিখিয়াছি, পুনরায় উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। এক পরিবার হইয়া আমরা তাঁহাদিগের সহিত বাস করিতে লাগিলাম। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সীতাকান্ত ও জ্যেষ্ঠা কন্যা নির্ম্মলাকে আমরা সহোদর ভাই-ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করিতাম। তাহারাও আমাদের তদনুরূপ ভালবাসিত। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা সুবলার এই সময়ে জন্ম হয়। মাতাঠাকুরাণী আপন ভ্রাতৃকন্যার ন্যায় তাহাকে যত্নে লালন করিতেন।

সেই সময়ে শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত হালদার (ইনি শ্রীযুক্ত বরদানাথ হালদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ হালদারের খুল্লতাত) মহাশয়ও কিছুদিন তথায় ছিলেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহার শরীর অসুস্থ ছিল; আমি তাঁর বক্ষে তেল মালিশ করিয়া দিতাম। আমাকে তিনি বক্ষস্থলে কোথায় কি যন্ত্র আছে বুঝাইতেন।

শ্রীযুক্ত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সহোদর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁহার পত্নী শিশুকন্যা সহ তথায় আসিয়া কিছু দিবস বাস করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, আমরা তাঁহাদের অকৃত্রিম ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হই নাই। তাঁহাদের শিশুকন্যা আমাদের অতিশয় আদরের পাত্রী ছিল।

ঢাকায় শিক্ষার ব্যবস্থা

ঢাকায় আমাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত বিষয়ে এইবার বলিব। কতিপয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের চেষ্টায় এডাল্ট ফিমেল স্কুল (Adult Female School) নামক একটি স্কুল স্থাপিত হইল। ব্রাহ্মসমাজে আগতা বিবাহিতা ও কুমারী কন্যারা তথায় বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিলেন। শিক্ষাদানের ব্যবস্থা অতি চমৎকার হইল। 'ফেণী' শিক্ষয়িত্রী নাম্নী একজন মাননীয়া খৃষ্টান মহিলা, এবং শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সেন, শ্রীযুক্ত কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আমাদের শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষক হইলেন। সেকালে শিক্ষাদাতা ও ছাত্রছাত্রীদিগের সম্বন্ধ অতি চমৎকার ছিল। শুদ্ধমাত্র শিক্ষা ও স্নেহের চক্ষে দেখিয়াই তাঁহারা কাজ সারিতেন না। কিরূপে ছাত্রছাত্রীদিগের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি এবং মঙ্গল হইবে সর্ব্বদাই তাঁহাদের সেই চেষ্টা ও চিন্তা ছিল।

বহুদিবস আমাদিগকে আহার না করিয়াই স্কুলে যাইতে হইত। তাহার কারণ, তৎকালে আমাদের নিজেদেরই রন্ধন করিতে হইত। রান্না করিয়া সকলকে পরিবেশনপূর্ব্বক নিজেদের আহার করিবার সময় প্রায়ই হইয়া উঠিত না। কোনদিন অল্প আহার করিবামাত্র গাড়ী আসিয়া পড়িত। কোনদিন বা আহারে বসিবামাত্র গাড়ীর শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইত। স্কুলের নিয়ম ছিল গাড়ী পৌঁছিলে ঝি অথবা স্কুলের 'দাই' একবার মাত্র ছাত্রীদিগকে ডাকিবে ;— অবিলম্বে ছাত্রীদিগকে আসিয়া গাড়ীতে উঠিতে হইবে। আমরা পুস্তকগুলি বগলে করিয়াই আহারে বসিতাম, এবং গ্লাসের পানীয় জলেই হাত ধুইয়া গাড়ীতে উঠিতাম। বড়ই চমৎকার করিয়া স্কুলের দাই আমাকে 'দাক্ষ্ণা' বলিয়া ডাকিত। আমাদিগকে সে অত্যন্ত ভালবাসিত।

স্কুলে যাইয়া ক্লাসে বসিতাম। কিছুক্ষণ পাঠের পরেই আমাদের মুখগুলি শুকাইয়া যাইত। স্নেহশীল ভক্তিভাজন শিক্ষক মহাশয় বিহারীলাল সেন তখন বুঝিতে পারিতেন যে আমাদের আহার হয় নাই। সেই সময় তিনি ও আমরা এক বাড়ীতেই বাস করিতাম। তিনি তৎক্ষণাৎ বাজার হইতে জলখাবার আনাইয়া আমাদের অন্য ঘরে যাইয়া জলপান করিয়া আসিতে বলিতেন। জলযোগের পরে পুনরায় আসিয়া পড়িতে বসিতাম।

কেহ স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিলে যাহাতে ছাত্রীগণ পারদর্শিতা দেখাইতে পারে তজ্জন্য শিক্ষকগণ ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। আজকাল যেরূপ ছাত্র ও ছাত্রীরা সমভাবে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে, তৎকালে সেরূপ ছিল না। সেই কারণে আমাদের অতি অল্প শিক্ষারই অধিক মর্য্যাদা ছিল। এক দিবস কোনও ইংলিশম্যান স্কুল পরিদর্শন করিতে আসেন। বোর্ডে তাঁহার নিকট ক্ষেত্রতত্ত্বের সাতচল্লিশ প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিতে পারায় তিনি সন্তুষ্ট হইয়া আমার প্রশংসা করেন। ইহাতে শিক্ষকগণ অতিশয় আনন্দিত হয়েন এবং গর্ব্ব অনুভব করেন।

এস্থানে একটি মর্ম্মব্যথা না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। বিদ্যাশিক্ষা করিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাল্যকাল হইতেই আমার প্রাণে অতিশয় বলবতী ছিল। কিন্তু অশেষ বাধাবিঘ্নবশতঃ যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও আমার সেই সাধ মিটিল না। তজ্জন্য দুঃখ রহিয়া গেল!

আমার গুরুতর পীড়া

ঢাকাতে এই সময়ে আমার গুরুতর পীড়া হয়। ডাক্তারগণ আমার পীড়া দুরারোগ্য ভাবিয়া মাতৃদেবীকে বলিলেন, "আমরা ত রোগের উপশম কিছুই করিতে পারিলাম না; আপনি

ইহাকে কিছুদিন নৌকায় রাখিয়া দেখুন। তাহাতে সুফল প্রদান করিতে পারে।" মাতৃদেবী স্থির করিলেন, ভাগ্যে যাহা থাকে তাহাই হইবে, ইহাকে একবার জন্মভূমি সোহাগদল গ্রামে লইয়া যাই, শিশুকাল হইতে যে কবিরাজ ইহার চিকিৎসা করিয়াছেন, তাঁহাকে দিয়াই চিকিৎসা করাইয়া দেখি। আমরা ব্রাহ্মসমাজে আসিবার পর সেই প্রথম মাতুলালয়ে গমন করিলাম। আমাদিগকে পাইয়া মাতুলালয়ের সকলেই যে কত আনন্দিত হইলেন তাহা বর্ণনাতীত। অবশ্য অভ্যন্তরে তাঁহাদের প্রাণে দুঃখও জাগিয়া উঠিল। আমাদের জাতি গিয়াছে, তাঁহাদের জন্মের মতন ছাড়িয়া আসিয়াছি — ইহা যে তাঁহাদের অসহনীয় দুঃখের কারণ। কিন্তু এত স্নেহ আমাদের জন্য তাঁহাদের বক্ষে সঞ্চিত ছিল যে, আমাদের পাইয়া যেন তাঁহারা সকল দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। অচিরে রামদুর্লভ কবিরাজ মহাশয়কে সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি আসিয়া আমার ঔষধ এবং পথ্যের ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার ঔষধ যেন মন্ত্রবৎ আমার দেহে কাজ করিল। শিশুকাল হইতে তিনি আমার ধাত জানিতেন। দিদিমাতা পথ্য ব্যাপারে অতি সিদ্ধহস্তা ছিলেন। তাঁহার যত্নে প্রস্তুত স্নেহমাখা পথ্য গ্রহণ করিয়া আমি অতি শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিলাম।

আমার আরোগ্য হওযার পরেই মাতুলালয়ের সকলে মাতৃদেবীকে ধরিয়া বসিলেন, আর ব্রাহ্মসমাজে ফিরিয়া যাইয়া কাজ নাই। প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় হিন্দুসমাজভুক্ত হও। কিন্তু মাতৃদেবী তাঁহার সংকল্প হইতে টলিলেন না। মাতুল কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত মাতৃদেবী পরামর্শ করিলেন যে, মেয়েদের অন্য জাতিতে বিবাহ দিতে হইবে, তাহা হইলে ইঁহারা আর হিন্দুসমাজভুক্ত হইতে অনুরোধ করিবেন না। কার্য্যতঃ তাহাই হইল। ইহার পর আমার বৈদ্যজাতিতে বিবাহ দিয়া মাতৃদেবী তাঁহার পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে হিন্দুসমাজে ইঁহাদের পুনরায় ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা বৃথা। — ইহাতে তাঁহারা প্রাণে যে কিরূপ আঘাত পাইয়াছিলেন তাহা বুঝান শক্ত। ব্রাহ্মণের কন্যার বৈদ্য ও কায়স্থকুলে বিবাহ তাঁহারা কিরূপে সহিবেন? তথাপি তুলাদণ্ডে তাঁহাদের স্নেহের ভারই গুরু হইয়া পড়িয়াছিল। অপরাধ করা সত্ত্বেও তাঁহাদের ব্যবহারের পরিবর্ত্তন হইল না। এমন কি, এই দুই অন্য জাতের জামাতৃদ্বয়কেও তাঁহারা অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। আমাদের সন্তানেরা তাঁহাদের অতি আদরের ধন হইয়াছিল। অদ্যাবধি তাঁহাদের অসীম স্নেহ ও উদারতার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের চরণে ভক্তিপুষ্পে অঞ্জলি দিই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভারতাশ্রম

স্বাস্থ্যের উন্নতি ও লেখাপড়া শিখাইবার অভিপ্রায়ে অভিভাবকেরা আমাকে কলিকাতা পাঠাইবেন স্থির করিলেন। আমার অগ্রজ গোবিন্দবন্ধু তৎকালে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মনিকেতনে বাস করিতেছিলেন। তিনি ঢাকায় আসিয়া আমাকে কলিকাতা লইয়া গেলেন। কোথায় আমাকে উঠাইবেন পূর্ব্বে কিছুই স্থির করেন নাই। পথিমধ্যে ট্রেণে আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথায় যাইতে চাও?" দুইটি স্থানের বিষয় আমাকে বলিলেন; তাহাদের মধ্যে যেস্থানে আমার ইচ্ছা সেইখানেই লইয়া যাইবেন। সেই সময়ে মিস্ একরয়েড[১৫] নাম্নী একজন ইংরাজ মহিলা একটি বোর্ডিং স্কুল স্থাপিত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে আগতা অনেক মেয়েরাই সেই বোর্ডিংএ থাকিয়া লেখাপড়া শিখিতেন। অপর স্থানটি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত ভারতাশ্রম। জানি না কেন, আমি ভারতাশ্রমেই যাইব, দাদাকে বলিলাম। দাদা কোন আপত্তি না করিয়া আমাকে সেইস্থানেই লইয়া গেলেন। আমাদের কলিকাতা আসিবার সংবাদ পাইয়া দাদার দুই তিনজন বন্ধু শিয়ালদহ স্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ দত্ত একজন। দাদা আমাকে ভারতাশ্রমে পৌঁছাইয়া দিয়া নিকেতনে চলিয়া গেলেন। আমি তখন বালিকা; চতুষ্পার্শ্বের সকলেই আমার অপরিচিত, কিন্তু ভারতাশ্রমের প্রত্যেকেই আমাকে এত আদরযত্ন করিতে লাগিলেন যে আমার কোন কষ্টই রহিল না।

মহামায়াদিদি

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর আমি ভারতাশ্রমে আসিয়াছিলাম। সেইদিনই শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্তা সারদাসুন্দরী চৌধুরীর শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। ইঁহাদের পুত্র ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ।[১৬] অপরাহ্ণে সকলেই বিবাহে যাইবার জন্য বেশভূষা করিতে আরম্ভ করিলেন। আমাকে একজন বয়স্থা মহিলা ডাকিয়া বলিলেন, "এস, তোমার চুল বেঁধে দি।" আমি একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলাম, "আমার চুল ত উঠিয়া গিয়াছে, এত অল্প চুলে খোঁপা বাঁধা হইবে না।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "ঐ চুলেই বেশ সুন্দর খোঁপা হবে, তুমি এস।" অতঃপর আমাকে সাজাইয়া গুছাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া বিবাহবাড়ী লইয়া গেলেন। যিনি আমার চুল বাঁধিয়া দিলেন তিনি নববিধান প্রচারক মহেন্দ্রনাথ বসুর[১৭] স্ত্রী মহামায়া দেবী। সেই স্নেহশীলা নারীকে আমরা সকলেই মহামায়াদিদি বলিয়া ডাকিতাম। প্রথম দিবসেই তিনি আমার প্রতি যে স্নেহ দেখাইলেন, জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। জানি না কেন, আশ্রমবাসী সকলেরই স্নেহদৃষ্টি আমার উপর পতিত হইল। সকলেই আমাকে আদর করিতে লাগিলেন। আমিও যথাসাধ্য

১৫। দ্র. সংযোজন অংশে মুদ্রিত যোগেশচন্দ্র বাগলের প্রবন্ধ : 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় ও বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়'।

তাঁহাদের প্রতিদান দিতে চেষ্টা করিতাম। সেই সময় আশ্রমটি গোলদীঘির পাড়ে ১৩ নম্বর বাটীতে ছিল। এখন সেইটি সিটি স্কুল (City School) হইয়াছে। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, সাধু অঘোরনাথ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রসন্নকুমার সেন প্রভৃতি প্রচারকগণ সেই বাটীতে বাস করিতেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শ্বশ্রূমাতাকে আমরা সকলে 'দিদিমা' বলিয়া ডাকিতাম।

রাজলক্ষ্মীদিদি

সেই সময়ে রাজলক্ষ্মীদিদির একটি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে। রাজলক্ষ্মীদিদির পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। রাজলক্ষ্মীদিদি প্রচারক প্রসন্নকুমার সেন মহাশয়ের পত্নী এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের ভাগিনেয়ী। তাঁহার পাঁচ ছয় বৎসর বয়স্কা একটি কন্যা ছিল। রাজলক্ষ্মীদিদির পুত্রের জন্ম হইলে তাঁহার মেয়েটিকে আমি অনেক সময় দেখিতাম, স্নানাহারও করাইয়া দিতাম; ইহা দর্শন করিয়া রাজলক্ষ্মীদিদির মাতুলানী যোগমায়া দেবী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের পত্নী ও তাঁহার মাতা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "তবে একে দেখাশুনার ভার তুমিই নাও।" আমার বয়স তখন চৌদ্দ বৎসর মাত্র। দুঃখের বিষয়, সেই কন্যাটি স্বামী এবং সন্তান রাখিয়া পরলোকবাসিনী হইয়াছেন। রাজলক্ষ্মীদিদির সেই পুত্রই প্রশান্তকুমার সেন[১১]।

এই বাড়ীটির নিম্নতলায় একটি ছাপাখানা ছিল। তাহাতে *Indian Mirror*[১২] নামক একটি পত্রিকা ছাপা হইত। এতদ্ব্যতীত ইহাতে এক পয়সা মূল্যের একখানি সুলভ সমাচার[১৩] প্রতিদিবস ছাপা হইত। এই এক পয়সা মূল্যের পত্রিকা কিনিতে কত বিভিন্ন প্রকারের যে লোক আসিত তাহার ইয়ত্তা ছিল না।

ঐ তলাতেই একটি বৃহৎ ঘরে আমাদের স্কুল বসিত। ক্রমশঃই আশ্রমের লোকসংখ্যা অধিক হইতে লাগিল। কাজেই বাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হইল। "ধরের বাগান" নামক বাগান ও পুকুরসহ একটি বৃহৎ বাটীতে আশ্রম উঠিয়া গেল। এই বৃহৎ বাটীটি বর্ত্তমান Lily Cottage এর সম্মুখে, পথের বিপরীত দিকে ছিল। আমরা বাগান ও পুকুরসহ এই প্রকাণ্ড বাড়ীটি স্কুলরূপে পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। উৎসবের সময় আমরা প্রত্যূষে উঠিয়া পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া হাঁটিয়া মন্দিরে যাইতাম।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কিছুদিন কলুটোলার বাড়ী হইতে স্নানান্তে উপাসনা করিতে ভারতাশ্রমে আসিতেন। তাঁহার গাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেই ঘন্টা পড়িত; তখন আমরা যে যেখানে থাকিতাম ছুটিয়া উপাসনাগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। সেই মধুর উপাসনা আজিও কানে বাজিতেছে। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আশ্রমে আসিয়া সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন।

প্রতিদিবস দুই বেলা উপাসনা ও সন্ধ্যায় ধর্ম্মালোচনা হইত। উৎসবের সময় সকলের কি উৎসাহ। একদিন স্থির হইল, কল্য অতি প্রত্যূষে উঠিয়া পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া সকলে হাঁটিয়া ব্রহ্মমন্দিরে যাইবেন। আমি সেই দিবস সন্ধ্যার সময় একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাঁহার দলবলসহ বসিয়া উপাসনান্তে আলোচনা করিতেছেন, হঠাৎ জাগ্রত হইয়া আমার মনে হইল, অপরাপর সকলেই ব্রহ্মমন্দিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন আমি ঘুমাইয়া রহিয়াছি, আমার বুঝি যাওয়া হইল না। অবিলম্বে উঠিয়া মাথায় তেল মাখিয়া সমবয়সীদের নাম ধরিয়া ডাকিতেছি, "তোমরা কি আমায় ফেলিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেলে নাকি? আমাকে ডাক নাই কেন?" — ইত্যাদি বলাতে সকলেই হাসিতে লাগিলেন। তাহারা

তখন জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেন স্নান করিতে যাইব? এখন ত সবে সন্ধ্যা হইয়াছে।" আমি লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হইলাম। তখন কাহারো আহারই হয় নাই। মাথার তেল গামছা দিয়া মুছিয়া আমি সকলের সঙ্গে আহার করিতে গেলাম। প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া সকলে একত্রে স্নানকার্য্য পুষ্করিণীতে সমাধা করিয়া ব্রহ্মমন্দিরে হাঁটিয়া গেলাম। উপাসনান্তে প্রাণ যেন আনন্দে এবং মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হইল। হায়! তৎকালে ব্রাহ্মদের কী উৎসাহ এবং উদ্যম ছিল! এখন যদি সেইরূপ থাকিত তাহা হইলে কতই সুখের হইত।

একদা ভারতাশ্রমে সমস্ত রাত্রি উপাসনা হইল। সন্ধ্যার সময় সকলে উপাসনায় বসিলেন, পরদিবস প্রাতঃকালে উপাসনা সমাপ্ত হইল। গভীর রাত্রিতে ধ্যানের সময় পড়িয়াছিল। আরাধনা, প্রার্থনা সকলই অতি সুন্দর। প্রত্যুষে ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় হঠাৎ একটি গান ধরিলেন।

— 'এবে জাগ সকলে অমৃতের অধিকারী' —

গানটির ভাব কি চমৎকার! তদুপরি তাঁহার সুমধুর কণ্ঠস্বরে সকলেই মুগ্ধ। যদিও তখন আমার বয়স অল্প ছিল, তথাপি উপাসনাটি আমার অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছিল।

শ্রীমতী সুনীতি[১১] ও সাবিত্রী

ভারতাশ্রমে আমরা একশত লোক বাস করিতাম। সকলের মধ্যে ভালবাসা এবং আত্মীয়তার সীমা ছিল না। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পত্নী ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পত্নী আমাকে কন্যাসম স্নেহ করিতেন। তাঁহাদের স্নেহ এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যখন কলুটোলায় বাস করিতেন, রবিবারে প্রাতঃকালে উপাসনার জন্য আমরা তথায় যাইতাম। আমার মাতৃসমা স্নেহময়ী জগন্মোহিনী দেবী[১২] পূর্ব্বদিন রাত্রিতেই আমাদিগের জন্য খাদ্যসামগ্রী ঠিক করিয়া রাখিতেন এবং উপাসনান্তে যথাশীঘ্র আমাদের পরিতোষপূর্ব্বক জলযোগ করাইয়া দিতেন। সেই আহার্য্যদ্রব্যে যেন স্নেহ মাখানো থাকিত — আমরা আহার করিয়া তৃপ্ত হইতাম। সর্ব্বাপেক্ষা তৃপ্ত হইতাম তাঁহাদের আদরে; এমন কি আমি মাতা ভগিনী হইতে দূরে থাকার কষ্ট পর্য্যন্ত অনুভব করিতাম না। তাঁহাদের ভারতাশ্রমে বাস করা কালীন যে শুদ্ধমাত্র তাঁহাদিগের স্নেহভাগিনী হইয়াছিলাম তাহা নহে, তাঁহাদের কন্যাদ্বয় শ্রীমতী সুনীতি এবং সাবিত্রী আমাকে আপন ভগিনীর ন্যায় ভালবাসিতেন। শ্রীমতী সুনীতি পরে মহামান্যা কুচবিহারের মহারাণী হ'ন এবং শ্রীমতী সাবিত্রী কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের পত্নী হ'ন। তাঁহারা বয়সে আমার কনিষ্ঠা ছিলেন। আমাকে দিদি বলিয়া ডাকিতেন এবং বেশী সময়ই আমার কাছে থাকিতে ভালবাসিতেন, এমন কি তাঁহারা অনেক সময়ই আমার কাছে শুইবার জন্য জেদ করিতেন। আমি বলিতাম, "দেখ তোমাদের কত ভাল খাট, ভাল বিছানা; আমার সামান্য তক্তপোষ ও সামান্য বিছানা। আমার কাছে শুইলে তোমাদের কষ্ট হইবে।" কিন্তু তাঁহারা আমার প্রতি ভালবাসার টানে তাঁহাদের উত্তম শয্যা ফেলিয়া আমার সামান্য বিছানায় শয়ন করিয়া সুখ অনুভব করিতেন। আমিও তাঁহাদের কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় ভালবাসিতাম। এই ধর্ম্ম সম্বন্ধ, বর্ত্তমানেও অক্ষুন্ন আছে; তাঁহারা এখনও আমাকে দেখিলে, 'সুদক্ষিণাদিদি' বলিয়া ডাকেন, আমিও ভগিনী-স্নেহদানে আনন্দিতা হই। ব্রহ্মানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র করুণাও আমাকে দিদি বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার আরও দুইটি ছোট ভাই ছিল, — নির্ম্মল এবং প্রফুল্ল। তাহাদের আমি সহোদর ভ্রাতার ন্যায় দেখিতাম। তাঁহাদের বাল্যের মধুর চিত্র অদ্যাবধি আমার চক্ষে ভাসিতেছে।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পত্নী আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় নিজেও অনেক সময়ই ডাকিয়া আমার সংবাদ লইতেন। তাঁহার পত্নী আমাকে গৃহে ডাকিয়া মিষ্টান্ন ও ফল খাওয়াইতেন। আমি যে বৎসর ভারতাশ্রমে ছিলাম, প্রতাপবাবু সেই বৎসরই আমেরিকায় গমন করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার পত্নী আমাকে এক বিছানায় শয়ন করিতে অনুরোধ করেন। তাহাতে আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। তিনি অত বড় লোকের স্ত্রী হইয়া আমাকে তাঁহার সহিত শয়ন করিতে অনুরোধ করিলেন। আমার প্রতি তাঁহার এতই স্নেহ। আমি অবশ্য সসঙ্কোচে তাঁহার কাছে যাইয়া শুইতাম।

সুচারু দেবীর[১৩] জন্ম ও শ্রীযুক্তা মণিকা মহলানবীশ

কলুটোলার বাড়ীতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের একটি কন্যার জন্ম হইলে তাঁহার পত্নী অসুস্থ হইয়া পড়েন। একদিন প্রতাপবাবুর স্ত্রী আমাকে বলিলেন, "সুকুর (কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র) একটি ভগ্নী হইয়াছে। তুমি কি আমার সহিত তাহাকে দেখিতে যাইবে?" একখানি পাল্কীতে তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া কলুটোলার বাড়ীতে গেলেন। ত্রিতলের একটি ঘরে ব্রহ্মানন্দের পত্নী ও কন্যা ছিলেন। প্রতাপবাবুর স্ত্রী আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং আমার ক্রোড়ে শিশুকন্যাটিকে দিয়া তিনি প্রসূতির শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিলেন। সেইদিন সমস্ত দিবস আমরা কলুটোলায় রহিলাম। এই ব্যাপারে অন্তরে আমি তাঁহার স্নেহের গভীরতার পরিচয় পাইলাম। এত মেয়ে থাকিতে আমাকেই তিনি সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছেন এবং শিশুকন্যার পরিচর্য্যার ভার দিয়াছেন। সেই শিশুকন্যাটিই এক্ষণে ময়ূরভঞ্জের মহামান্যা মহারাণী হইয়াছেন। অদ্যাবধি মহারাণী হইলেও তিনি আমাকে দিদি সম্বোধন করেন, আমিও তাঁহাকে ছোট ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করি। ব্রহ্মানন্দের পরিবারের সকলের সঙ্গেই আমার ভালবাসার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহার অপর একটি কন্যা ভগ্নীসমা শ্রীমতী মণিকা মহলানবীশ — আমাকে দিদি বলিয়া ডাকেন, শ্রদ্ধা করেন ও ভালবাসেন। ইঁহাদের সকলের সহিত শ্রদ্ধা ভালবাসার আদান প্রদানে আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করি।

নিম্নে ময়ূরভঞ্জের মহারাণী স্নেহের ভগিনী সুচারু দেবীর একখানি লিপি উদ্ধৃত করিলাম। তাহা হইতে আমার প্রতি তাঁহাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

Friday, 28th Nov., 1924

মাননীয়া সুদক্ষিণাদিদি,

আপনার স্নেহের চিঠিখানি পড়িয়া কত যে আনন্দ হ'ল। আপনার এই স্নেহ যেন চিরদিন পাই এমনি ভাবে। আপনার সঙ্গে সেই অতীতের সম্বন্ধ আজ নানা পরিবর্ত্তন পরীক্ষার ভিতর দিয়া জীবনের অপরাহ্ণে আরও কত প্রস্ফুটিত ও জীবিত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এখন তাই পুরাতন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে এত আপনার বলিয়া মনে হয়, এত ভাল লাগে। আর সত্যই একই শোকের আঘাতের ভিতর দিয়া ভগ্নপ্রাণগুলো বিধাতা আরও একটা সহানুভূতির ডোরে দৃঢ়তর করিয়া বাঁধেন। আজ মনে অনেক ভাব আসছে, কিন্তু সময়াভাবে তাড়াতাড়ি লিখিতেছি। ধ্রুবেন্দ্র'র কদিন জ্বরে বড় আবার ভাবাইল। এখন একটু ভাল।

১লা সোমবার এখান হইতে রওনা হইবার স্থির একরকম করিয়াছি। সব ভাল থাকিলে হয়। শীঘ্রই আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হইবে।

অনেক অনেক প্রণাম ----

আপনার চিরস্নেহের বোন্
সুচারু।

ভারতাশ্রমে আরও কতলোকের যে স্নেহভাগিনী হইয়াছিলাম তাহা লিখিয়া শেষ করিতে পারিব না। আমরা চারিটি প্রায় সমবয়সী মেয়ে এক ঘরে বাস করিতাম; — কুমারী, বিরাজ, মোহিনী ও আমি। প্রচারক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন মহাশয় আমাদের তিনটি মেয়েকে এক নাম ধরিয়া ডাকিতেন। কুসুম বলিয়া ডাকিলে আমরা তিনজনই ছুটিয়া যাইতাম --- কুমারী, সুদক্ষিণা ও মোহিনী। সেইসকল দিনের কথা মনে হইলে প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। আমাদের বাল্যকালের বন্ধুতা আজিও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। মোহিনীর সহিত পরে ব্রহ্মানন্দের পুত্র করুণার বিবাহ হয়।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, মাইজপাড়ার রায়বাড়ীর কোন বিবাহে অঘোরদাদার স্ত্রী শ্রীযুক্তা বরদাসুন্দরীর সহিত বৌদিদির পরিচয় হয়। ব্রাহ্মসমাজে আসিবার পর অঘোরদাদাদের সকলের সহিত সম্পর্কিত বলিয়া অত্যন্ত ভালবাসা জন্মায়। অঘোরদাদার ছেলেমেয়েরা এখনও দেখা হইলে পিসিমা বলিয়া আমাকে সম্বোধন করে। তাহাদের দেখিলে আমার বড়ই আনন্দ হয়। বরদাসুন্দরী সেই সময়ে ভারতাশ্রমে ছিলেন। তাঁহার অত্যন্ত অসুখ হয়। একদিবস আশ্রমবাটীর নিকটবর্ত্তী খড়োপাড়াতে আগুন লাগে; আগুনের তাপ আমাদের বাড়ী পর্য্যন্ত আসে। আমরা সকলেই ছুটিয়া Miss Pigotএর স্কুলে চলিয়া গেলাম। বরদাসুন্দরী তখন শয্যাশায়িনী। তাঁহার উত্থানশক্তি ছিল না। একজন মেয়ে তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া Miss Pigotএর স্কুলে চলিয়া আসিলেন। এই স্কুলবাটীই পরে "Lily Cottage" হইয়াছে। ঐ সময়েই ভারতাশ্রমে বরদাসুন্দরী ও সরলা দাস[২৪] (Mrs. P. K. Ray)-এর সহিত আমার বন্ধুত্ব হয়।

গভর্ণমেন্ট হাউসে নিমন্ত্রণ

ভারতাশ্রমে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নিকট নিমন্ত্রণপত্র আসিল ভিক্টোরিয়া স্কুলের ছাত্রীদের মধ্য হইতে বাছিয়া কয়েকজনাকে গভর্ণমেন্ট হাউসের গার্ডেন পার্টিতে পাঠাইবার জন্য। ব্রহ্মানন্দ পাঁচটি মেয়েকে বলিলেন, তোমাদের Government Houseএর পার্টিতে যাইতে হইবে তাহাদের মধ্যে আমিও একজন পড়িলাম। আমাকেও আবার লাটসাহেবের বাড়ী নিমন্ত্রণে যাইতে হইবে? ভাবিয়া আমি অবাক হইলাম। বাল্যকাল হইতেই আমরা স্বাধীন প্রকৃতির বালিকা ছিলাম; কোন প্রকাশ্যস্থানে যাইতে সঙ্কোচের ভাব আসিত না। পর্দ্দাতে কখনও থাকি নাই। যথা সময়ে আমরা পাঁচটি মেয়ে Government Houseএ উপস্থিত হইলাম। আমি একটি বিষয়ে একটু ঠকিয়াছিলাম। একজন মেমসাহেব স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন, ক্ষণিকক্ষণের জন্য তাঁহার চক্ষের পলকও পড়ে নাই। মর্ম্মর প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া তাঁহাকে আমি ভ্রম করিয়াছিলাম। কিন্তু পরে যখন তিনি নড়িয়া উঠিলেন, আমার ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়া মনে মনে হাসিলাম। আমরা বাগানে চা ও মিষ্টি খাইয়া উপরে ড্রয়িংরুমে গেলাম। ড্রয়িংরুমটি চমৎকার সাজান।

তাহার বিশেষত্ব এই দেখিলাম, ঘরটির প্রাচীরের দুই ধারে দু'টি এত বড় আয়না রাখা হইয়াছে, তাহাতে প্রাচীর আর দেখা যায় না। যেন আয়নারই প্রাচীর। আমরা ঘরটীতে যতগুলি লোক বসিয়াছিলাম, প্রাচীরে তাহার প্রতিবিম্ব পড়িয়া আরও দুইসারি লোক দেখা যাইতেছিল। আমি ত গ্রাম্য বালিকা, এই অল্প কয়দিবস কলিকাতা আসিয়াছি; আমার সমস্তই অতি চমৎকার লাগিল।

কোন্নগরে ঁশিবচন্দ্র দেব[২০] মহাশয়ের বাটীতে নিমন্ত্রণ

ইহার কয়েকদিন পরেই আমরা আশ্রমবাসী অনেকেই ঁশিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া একখানি বৃহৎ বজরা করিয়া কোন্নগর গেলাম। বজরায় যাইতে আনন্দের পরিসীমা রহিল না। কোন্নগর পৌঁছিবার পর উপাসনাদি হইল এবং তৎপরে আহারকার্য্য সম্পন্ন হইল। শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের পুত্র সত্যপ্রিয় দেবের[২১] বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল ঁকালীনাথ দত্ত মহাশয়ের কন্যা শরৎকুমারীর[২২] সহিত। এই উৎসবে শরৎকুমারীও আমাদের সহযাত্রী হইয়াছিলেন। তাঁহাকে লইয়া তাঁহার ভাবী শ্বশুরালয়ের সকলেই খুব আমোদ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় পুনরায় বজ্‌রা কবিয়া আমরা ভারতাশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলাম। সতাই সেই দিবসটি অতি আনন্দে কাটিয়াছিল, — উপাসনা, আহার, আমোদপ্রমোদ সকলই হইল। শরৎকুমারীর মাতা ও শরৎকুমারী আমাকে বড়ই ভালবাসিতেন। এখনও শরৎকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে কতই আনন্দিত হন।

ভারতাশ্রমে আহারের ব্যবস্থা

প্রচারক উমানাথ গুপ্ত মহাশয় ভারতাশ্রমের আহারের ভার লইয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি ছিলেন ম্যানেজার। প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া বাজার করিতে যাইতেন। প্রতিদিনই ঝুড়ী ঝুড়ী মাছ তরকারী ও কলাপাতা ক্রয় করিয়া আনিতেন — প্রতিদিনই ভোজ। এতগুলি লোকের দুইবেলা আহারের আয়োজন করা সহজ ব্যাপার ছিল না। রান্নাবাড়ীটি একটু দূরে পৃথক ছিল। সেটিও নিতান্ত ছোট নহে। দুইবেলাই আহারের জন্য ঘন্টা পড়িত। ঘন্টা শ্রবণমাত্র আমরা নিজ নিজ গ্লাসে করিয়া একগ্লাস জল লইয়া রান্নাবাটী অভিমুখে ছুটিতাম। দুই তিনজন ব্রাহ্মণে রন্ধন করিত, ও দুই তিনজনে পরিবেশন করিত। কলাপাতা ও আসন বিছান থাকিত। আমি একখানা কলাপাতা মেঝেতে বিছাইয়া খাইতে পারিতাম না; অথচ দুইখানি পাতা বিছাইবার নিয়ম নাই। আমি একটী উপায় স্থির করিলাম। ঝিয়েরা যে স্থানে কলাপাতাগুলি কাটিত সেখানে অনেক কুচি পাতা পড়িয়া থাকিত। সেইগুলি অবশ্যই কোন কাজে লাগিত না। আমি সেই কুচি কুচি পাতা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া মেঝের উপর পুরু করিয়া বিছাইতাম। তাহার উপর ভাল পাতাখানি বিছাইতাম। ইহা দেখিয়া অনেকেই হাসিত এবং আমাকে বাঙ্গাল্ বলিয়া ঠাট্টা করিত। কিন্তু তাহাতে সঙ্কল্প হইতে টলিবার পাত্রী আমি ছিলাম না। বাল্যকাল হইতেই আমার স্বভাবটি ছিল একটু 'পিট্‌পিটে'। আমি যখন দশ বৎসর বয়সে রন্ধন করিতাম, আমার দিদিমা বলিতেন, "দেখ, এ কেমন হেঁসেলটি পরিষ্কার করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে; হাঁড়ীকুঁড়ীগুলি কি পরিষ্কার করিয়া ধুইয়াছে, আমরা ত অতটা পারি না।"

যাহা হউক, আশ্রমের কথাই বলি। আমাদের ভারতাশ্রমের নিয়ম ছিল প্রত্যেক মেয়ে একদিন করিয়া একটি তরকারী রন্ধন করিবেন। আমি একদিবস একটি ব্যঞ্জন রন্ধন করিব বলিয়া ভাণ্ডার হইতে আলু, নারিকেল, কিছু ছোলা ও তদুপযোগী তেল, ঘি, মস্‌লা ইত্যাদি জোগাড় করিয়া লইলাম। ব্যাপার দেখিয়া অনেকেই হাসিতে লাগিলেন। একজন বলিলেন, "ও মাগো, এ কি রকম তরকারী রান্না গো বাঙ্গালদের; আজ আব তরকারী খাওয়া যাবে না।" আমি কিন্তু তাহাতে বিচলিত হইলাম না, নিজের ইচ্ছামতনই রান্না করিলাম। ইহাও নিয়ম ছিল, যিনি যে দিবস রন্ধন করিবেন, তাহাকেই সেই ব্যঞ্জনটি পরিবেশন করিতে হইবে। সেইদিন আমি পরিবেশন করিলে সকলেই ব্যঞ্জন আস্বাদন করিয়া বলিলেন, "তরকারীর স্বাদটি সুন্দর হইয়াছে, আমরা ত ভাবিয়াছিলাম তরকারী খাওয়াই যাইবে না।" যাহা হউক, সকলেই তবকারীটি খুসী হইয়া খাইলেন এবং প্রশংসা করিলেন। আমার মাতৃদেবী রন্ধনে সিদ্ধহস্তা ছিলেন। তাঁহার হস্তের ব্যঞ্জন যাঁহাবা খাইয়াছেন, তাঁহারা কখনও ভুলিতে পারেন নাই। যদিও মাতৃদেবীর তুল্যা রন্ধনপটু আমি নহি, তথাপি মাতাব গুণ সন্তানে কিছু কিছু বর্ত্তাইয়াছিল। আমার মাতৃদেবী যখন আশ্রমে আসিতেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শ্বশ্রূমাতা আমার মাতৃদেবীর উপরেই তাঁহাদের (বিধবাদের) রন্ধনের ভার দিতেন এবং তাঁহার প্রস্তুত ব্যঞ্জন আহার করিয়া বলিতেন, "সুদক্ষিণার মা শুদ্ধমাত্র কাঁচালঙ্কা দিয়া যে ডাল, তরকারী রান্না করেন, তাহাই কেমন চমৎকার হয়। আমাদের ত মসল্লাদি দিয়াও এত ভাল হয় না।"

সঙ্গীতাচার্য্য ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় ভারতাশ্রমে অতি সুন্দর উদ্যান প্রস্তুত করিয়ছিলেন। তাহাতে বিভিন্ন প্রকারের পুষ্প প্রস্ফুটিত হইত। একটি পুষ্প ছিল সন্দেশের মতন দেখিতে। পূর্ব্বে ঐরূপ পুষ্প দেখি নাই। চমৎকার শ্বেতবর্ণ গোলাকৃতি — উহার নামও ছিল সন্দেশফুল। বৈকালে আমরা সেই উদ্যানে বেড়াইয়া কত আনন্দ পাইতাম। মধ্যে মধ্যে বাগানে বসিয়া কচি ভুট্টা খাইতাম। তখন তাহাই কত উপাদেয় মনে হইত, আর আজ?

আমরা কখন কখন পুষ্করিণীতে সাঁতার দিতাম। ভারতাশ্রমের অনেক মেয়েরাই সাঁতার জানিতেন না। আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে; বাল্যকালেই সাঁতার দিতে শিখিয়াছিলাম। কার্য্যতঃ আমিই সর্ব্বাপেক্ষা সন্তরণপটু ছিলাম। একদিন আশ্রমের পুষ্করিণীটি আমি সাতবার সাঁতার দিয়া পার হইয়াছিলাম। সেইসব আনন্দের দিন আর ফিরিয়া আসিবে না! স্মৃতির ঘরেই তাহাদের অনুলিপি সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।

আমাদের ভারতাশ্রমের ডাক্তার ছিলেন দুকড়ি ঘোষ মহাশয়। তিনি প্রত্যহ সকলের ঘরে যাইয়া কে কেমন আছেন সংবাদ লইতেন। কাহাকেও অসুস্থ দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। তাঁহার সুচিকিৎসায় আমাদের অসুখে পড়িলেও কখনও চিন্তিত হইতে হয় নাই।

সর্ব্বাপেক্ষা প্রচারক কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় সকলকে স্নেহ করিতেন। তজ্জন্য সকলে তাঁহাকে 'মা' আখ্যা দিয়াছিলেন। কি ছেলে কি মেয়ে সকলকেই ইনি মায়ের মতন ভালবাসিতেন। প্রচারক মহাশয়ের বধূরাও ইঁহাকে শ্বশ্রূমাতার স্থানে পাইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায় ও শ্রীযুক্তা বিধুমুখী মুখোপাধ্যায়

আমার ভারতাশ্রমে বাসকালীন ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায় মহাশয়ের সহিত শ্রীযুক্তা বিধুমুখী মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। এই বিবাহ ভবানীপুরস্থ একটি বাটীতে সুসম্পন্ন হয়। ভারতাশ্রম হইতে আমরা অনেকেই এই বিবাহে গিয়াছিলাম। সেই সময়ে অতি অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মবিবাহ হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে আমি আর একটিমাত্র ব্রাহ্মবিবাহ দেখিয়াছিলাম, — বহুবাজারের বাটীতে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন ও হেমাঙ্গিনী দেবীর বিবাহ। আচার্য্য কেশবচন্দ্র ঐ বিবাহের পরেই আমোদচ্ছলে শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায়কে বলিয়াছিলেন, "রজনী, তোমার শ্রাদ্ধটি কবে করাব?" তখন রজনীনাথ রায় মহাশয়ের বিবাহ সবেমাত্র স্থির হইয়াছে। বিবাহ স্থির হইলেও তাহার একটী প্রতিবন্ধক ছিল; তখনও বিধুমুখীদেবীর একুশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। একুশ বৎসর পূর্ণ না হইলে পিতামাতার অনুমতি ব্যতীত বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। তাঁহার পিতামাতার এই বিবাহে অনুমতি ছিল না, কারণ তিনি হিন্দুসমাজ ছাড়িয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলেন। এস্থলে কিরূপে তাঁহারা মত দিবেন? কাজেই নির্দ্দিষ্ট বয়সের অপেক্ষায় বিবাহ স্থগিত ছিল। রজনীনাথ রায় মহাশয়ের বিবাহ গ্রীষ্মাবকাশে হয়। তাঁহাদের বিবাহে কোন কোন বন্ধু দূরদেশ হইতে যোগদান করিয়াছিলেন। রজনীবাবুর বিশেষ বন্ধু শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেন তখন কৃষ্ণনগরে Chemistryর অধ্যাপকের কার্য্য করিতেছিলেন। তিনিও বন্ধুর বিবাহে সেই স্থান হইতে আসিয়া যোগদান করেন। এস্থলে জানান আবশ্যক, শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায়, শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দত্ত এবং শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেন, ইঁহারা তিনজন একসঙ্গে M. A পরীক্ষা দেন এবং ইঁহারা পরস্পরের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন।

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেন

শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের স্নেহের বিষয় পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। তিনি অম্বিকাচরণ সেন মহাশয়কে আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ভালবাসিতেন। শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায়ের বিবাহে তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া ইনি বড়ই আনন্দিত হইলেন। তাঁহাকে ভারতাশ্রমে ফিরিবার সময় নিজের গাড়ীতে বাসায় পৌঁছাইয়া দিলেন এবং সেইসঙ্গে তৎ-পরদিবস ভারতাশ্রমে যাইয়া মধ্যাহ্ন-ভোজন করিতে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন।

পরদিবস মধ্যাহ্নে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর গৃহে আমি বেড়াইতে যাইয়া দেখি শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহার আদরের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেনকে সাথে লইয়া আহারে বসিয়াছেন। আমি না জানিয়া হঠাৎ তথায় উপস্থিত হওয়াতে অপ্রস্তুত হইয়া সেই স্থান হইতে ফিরিয়া আসিতে উদ্যত হইলাম। তদ্দর্শনে শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "চলে যাচ্ছ কেন, এস না; এই যে তোমার মাষ্টার মহাশয়।" আমি তাঁহার অনুমতি পাইয়া ঘরের ভিতর যাইয়া দাঁড়াইলাম। শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় অতিশয় লাজুক ছিলেন। তিনি আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। শ্রীযুক্ত মিত্র মহাশয়কে আমার স্বাস্থ্য ও পড়াশুনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, আমরা বাল্যকাল হইতে কখনও পর্দ্দানসীন ছিলাম না। মাষ্টার মহাশয়কে দেখিয়া পলায়ন করিবারও কোন দরকার ছিল না। ভারতাশ্রমের নিয়ম ছিল বাহিরের কোন লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে অভিভাবকের অনুমতি লইয়া দেখা করিতে হইবে। আমি সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করিব না বলিয়াই চলিয়া

যাইতে উদ্যত হইয়াছিলাম। তখন জানিতাম না যে উক্ত সেনমহাশয়ই কালে আমার 'বর' হইবেন। বিধাতাপুরুষ অবশ্যই জানিতেন।

শ্রীযুক্তা অন্নদায়িনী সরকার ও শ্রীযুক্তা রাধারাণী লাহিড়ী

যখন ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া বহুবাজারের বাটীতে উঠি, তখনই অতিশয় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্তা অন্নদায়িনী সরকার ও শ্রীযুক্তা রাধারাণী লাহিড়ীর সহিত পরিচিত হই। তাঁহাদের স্নেহের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ভারতাশ্রমে তাঁহাদের সহিত বাস করিয়া যে স্নেহ ভালবাসার অধিকারিণী হইয়াছি, তাহারই কথা কিঞ্চিৎ লিখিব। শ্রদ্ধেয়া অন্নদায়িনী সরকারকে বড়দিদি বলিয়া ডাকিতাম। প্রথম বহুবাজারের বাটীতে তাঁহার ক্রোড়ে একটি শিশুকন্যা দেখিয়াছিলাম। প্রাতঃস্মরণীয়া রাধারাণী লাহিড়ীকে ছোটদিদি বলিয়া ডাকিতাম। কতই স্নেহ যে তিনি আমাকে করিতেন তাহা বর্ণনাসাধ্য নহে। প্রতিদানে আমি তাঁহাকে কি দিব ভাবিয়া পাইতাম না। তিনি ফুল বড়ই ভালবাসিতেন। কখনও হয়ত বাগান হইতে একটি গোলাপফুল তুলিয়া তাঁহার ঘরে তাঁহাকে দিতে যাইতাম। তিনি সস্নেহ হাস্যে আমার প্রদত্ত গোলাপ ফুলটি গ্রহণ করিতেন। তাঁহার ঘরটি অতি সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত। একটি কোণে টেবিলে খানকয়েক পুস্তক, একটি ফুলের তোড়া ও একটি বাতিদান থাকিত। ঘরটিতে প্রবেশ করিলেই মনে হইত যেন পবিত্রতার সুগন্ধে ঘরটি আমোদিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি চিরকুমারী থাকিয়া স্বীয় দেবীতুল্য চরিত্রে সকলকে মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

ভারতাশ্রমের স্কুলের নিয়ম ছিল, উপরকার ক্লাসের কোন কোন মেয়ে নীচের ক্লাসে কোন কোন বিষয় পড়াইবেন। আমি নীচের ক্লাসে অঙ্ক কষাইতাম। ছোট মেয়েরা সময় সময় বড় গোলমাল করিত। আমি তাহাদের গোলমাল থামাইতে পারিতেছি না দেখিয়া তিনি আমার ক্লাসে ছুটিয়া আসিতেন এবং বলিতেন, "তোমাকে ছেলেমানুষ পেয়ে ওরা অত গোল কচ্ছে। ব'স, আমি ওদের চুপ করিয়ে দিচ্ছি।" তাঁহার গম্ভীর মূর্ত্তি দর্শনে ও ঐরূপ ভর্ৎসনাবাক্য শ্রবণ করিয়া মেয়েরা চুপ হইয়া যাইত।

এস্থলে তাঁর সম্বন্ধে আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিব। অবশ্য পরে আরও দুই একবার তাঁহার কথা না তুলিয়া পারিব না। বহু বৎসর পরে বিধবা অবস্থায় তিনি যখন আমায় প্রথম দেখেন, তখন এই বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন, "আমার কপালে এই ছিল যে তোমার শুধু হাত দেখ্‌তে হ'ল।" এইরূপ কথা নিতান্ত আপনার লোক না হইলে কেহই বলিতে পারেন না। গিরিডিতে একটি নির্জ্জন কুটিরে তিনি শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। আমি গিরিডিতে বেড়াইতে যাইয়া সেই পবিত্র কুটির দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। তাহা দেখিয়া মন অত্যন্ত খারাপ হইয়া যায়। জীবিতাবস্থায় গৃহে গেলে যিনি আনন্দে আলিঙ্গন করিতেন, আজ তিনি কোথায়? তাঁহার পবিত্র সমাধির প্রতি ভক্তি ও দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রণাম করিয়া অন্তরে বিষাদমাখা স্মৃতি লইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়[২৮] ও নিস্তারিণী দেবী

ভারতাশ্রমে থাকিতে যত লোকের স্নেহ পাইয়াছি, প্রত্যেকের নাম করা সম্ভবপর নহে। তথাপি উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় ও তাঁহার পত্নী নিস্তারিণী দেবীর স্নেহ ভালবাসার কথা উল্লেখ না

করিয়া থাকিতে পারিলাম না। উপাধ্যায় মহাশয় আমার কনিষ্ঠা ভগিনীকে মাতা সম্বোধন করিয়াছিলেন। সেই সম্পর্কে আমি তাঁহার 'মাসীমা' হইতাম। তিনি যখন বগলার বিবাহ দিতে ঢাকা গমন করেন, তখন বলিয়াছিলেন, "মার বিয়ে দিতে এসেছি।" নিস্তারিণী দেবী অতি শান্ত ও নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি অতিশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতেন। তাঁহার বাসনগুলি এত পরিষ্কার রাখিতেন যে পিপাসা পাইলেই জলপান করিবার জন্য তাঁহার ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইতাম।

জগন্মোহিনী দেবী

ভারতাশ্রমে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের পত্নী পরমপূজনীয়া জগন্মোহিণী দেবী আমাকে মাতার ন্যায় কত স্নেহ করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছি। আমার বিবাহের পর কিছুদিন আমি Lily Cottageএর নিকটে একটি বাড়ীতে ছিলাম। সেই সময়ে আমার বাড়ীর গোরুর দুধ দিয়া সময় সময় স্বহস্তে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে পাঠাইতাম। তিনি আদরের সহিত তাহা গ্রহণ করিতেন। আমি অত্যন্ত সুখী হইতাম। যেখানে স্নেহের টান থাকে, সেখানে সামান্য জিনিষও অতি আদরের বস্তু হয়। তাঁর অসীম স্নেহের প্রতিদানে আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি ব্যতীত দিবার কিছুই ছিল না।

তাঁহার অসুস্থতার সময় আমি প্রায়ই তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম। তাঁহার সেবা-শুশ্রূষাকারিণীরা আমাকে বলিতেন, "ডাক্তার রোগিণীর ঘরে কাহাকেও যাইতে মানা করিয়াছেন, আপনি ড্রয়িংরুমেই বসুন।" আমি তাঁহাদের অনুরোধ করিতাম, "কেবল একটিবার আপনারা তাঁহাকে আমার নাম জানাইয়া বলুন যে আমি তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছি, ততক্ষণ না হয় আমি ড্রয়িংরুমেই বসিতেছি।" তিনি আমার নাম শুনিলেই তাঁহাদের বলিতেন, "ওকে আমার কাছে ডাক, কেন বাইরে বস্‌তে বল্‌লে?" আমি তখন অতি ধীরে তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিতাম প্রথমে তাঁহার সম্মুখে মিনিট দুই দাঁড়াইয়া পরে তাঁহার শিরোদেশে উপবিষ্ট হইয়া পাখা দিয়া হাওয়া করিতাম। তখন তাঁহার স্নেহ এবং আমার ভক্তিশ্রদ্ধা একত্র মিলিত হইয়া এক অপূর্ব্বভাবের সৃষ্টি হইত।

হায়, সেই কাল-রোগ তাঁহাকে ছাড়িল না, ডাক্তারদিগের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। বোধ হয় ভালই হইল, নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া তিনি অমরধামে দেবতা স্বামীর সহিত যাইয়া মিলিত হইলেন। দেবলোকে দুন্দুভি বাজিল, মর্ত্ত্যের লোক হাহাকার করিল। সেই সময়ে তাঁহার বড় দুইটি কন্যার বিবাহ হইয়াছে; অপর তিনজন অবিবাহিতা ছিলেন। মাতৃশোকে ইঁহারা অতিশয় কাতরা হইয়া পড়েন। তন্মধ্যে সুচারু দেবীই সর্ব্বাপেক্ষা অধীরা হন। আমি ইঁহাদের সান্ত্বনা দিতে প্রায়ই যাইতাম;-- শোকসন্তপ্ত পরিবারের সহিত আমার শোকাশ্রু মিশাইয়া ব্যথাভার লাঘব করিতে চেষ্টা করিতাম।

ভারতাশ্রমে যাইবার সার্থকতা

দাদা যখন ঢাকা হইতে আমায় কলিকাতা লইয়া আসেন, তখন কোথায় উঠিব জিজ্ঞাসা করাতে আমি আচার্য্য কেশবচন্দ্রের ভারতাশ্রমে যাইব বলিয়াছিলাম। তখন আমি বিশেষ কিছু বুঝি নাই। মিস্ একরয়েডের বোর্ডিংএ যে কেন গেলাম না, তাহাও ঠিক বলিতে পারি না। ভগবানই

যেন আমার পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। চিন্তা করিয়া যখন দেখি, তখন মঙ্গলময়ের শুভ-ইচ্ছার কথা ভাবিয়া আশ্চর্য্য হই। কত সাধু মহাপুরুষ ও তাঁহাদের সাধ্বী স্ত্রী, কন্যাদের সহিত বাস করিলাম, তাঁহারা কত আপনার লোক হইলেন; তাঁহাদের স্নেহ মমতা লাভ করিয়া ও ভগবানের নাম শুনিয়া জীবন কৃতার্থ হইল।

অন্যত্র গমন করিলে কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র ও অন্যান্য সাধুগণের স্নেহলাভে বঞ্চিত হইতাম; আমি তাঁহাদেরই একজন, একথা ভাবিয়া আজ গর্ব্ব অনুভব করি। তাঁহাদের সহিত বাস করিয়া আমি যে ধর্ম্ম-সম্পদ লাভ করিয়াছি, তাহা অপেক্ষা মূল্যবান সামগ্রী নাই। হয়তো, অন্যত্র গমন করিলে বিলাসিতার স্রোতে ভাসিতাম। ধর্ম্মের বীজ যাহা আমার বালিকা-হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহাও হয়ত শুকাইয়া যাইত, -- আমি ভিন্ন নারী হইয়া যাইতাম। ভগবান! তোমায় ধন্যবাদ। মঙ্গলময়! তোমার মঙ্গল-ইচ্ছা যেন আমার জীবনের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত পথের সাথী হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ঢাকার আশ্রম

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে আমি ভারতাশ্রম হইতে ঢাকায় গমন করিলাম। ঢাকাতেও ভক্তিভাজন বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়[২৯] আচার্য্য কেশবচন্দ্রের অনুকরণে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই আশ্রমে প্রচারক মহাশয়গণ ও বহু ব্রাহ্ম পরিবার বাস করিতেন। আমার মাতৃদেবী পুত্র, পুত্রবধূ ও ছোট কন্যাসহ তথায় বাস করিতেছিলেন। আমি ঢাকা যাইয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলাম।

আমার মাতৃদেবী তথায় ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকাদের মাতা ও ভগিনীর স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। রন্ধনে তিনি যেরূপ সিদ্ধহস্তা ছিলেন, — অতি সামান্য জিনিষ দিয়াও অতি সুখাদ্য ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া আশ্রমবাসী সকলকে পরিতোষের সহিত আহার করাইতেন। সাধারণ রান্না মেয়েরা এক একদিন পালা করিয়া রন্ধন করিতেন। তাঁহারা পাচক ব্রাহ্মণ অথবা ভৃত্য রাখিতেন না। সকলেই যথাশীঘ্র রন্ধনকার্য্য সমাধা করিয়া উপাসনায় যোগদান করিতেন। ভক্তিভাজন বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় উপাসনার কার্য্য করিতেন। সুগায়ক দুর্গানাথ রায়[৩০] মহাশয় সুমধুর কণ্ঠে ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিয়া সর্ব্বহৃদয়ে ভগবদ্‌ভক্তি জাগাইয়া তুলিতেন। তিনি অনেক সময় সময়োপযোগী গান তৎক্ষণাৎ রচনা করিয়া গাহিতেন।

এদিকে প্রচারক শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র সেন মহাশয় বাজার হইতে সর্ব্বোত্তম দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিয়া সকলের আহারের সুব্যবস্থা করিতেন। সকলে মিলিয়া একটি পরিবার। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের স্বর্গীয় স্নেহ ও ভালবাসা। প্রচারকদের আমরা দাদা বলিয়া ডাকিতাম। শুদ্ধমাত্র ডাকা নহে, বাস্তবিকই আমাদের মধ্যে ভ্রাতা ভগিনী সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র সেন, সকলকেই আমরা দাদা বলিয়া ডাকিতাম। যাঁহারা মাতৃদেবীকে দিদি বলিয়া ডাকিতেন, তাঁহাদের আমরা মামা বলিয়া সম্বোধন করিতাম। জালাল মিঞা নামক একজন মুসলমান ভদ্রলোক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনিও এই আশ্রমে ছিলেন। মাতৃদেবীকে তিনি দিদি বলিয়া ডাকিতেন। আমরা তাঁহাকে মিঞামামা ও তাঁহার পত্নী প্যারীবিবিকে মিঞামামী বলিয়া ডাকিতাম। জাতিভেদের আবরণ কিছুই ছিল না। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সেন মহাশয়ও আশ্রমে বাস করিতেছিলেন। মাতৃদেবী তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায়[৩১]

এই সময়ে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায় মহাশয় সপরিবারে ঢাকাতে একটি বাড়ীভাড়া করিয়া বাস করিতেছিলেন। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সেন মহাশয় তাঁহাদের সহিত একত্র বাস করিবার প্রস্তাব করেন। আমরা তদনুসারে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায় মহাশয়ের বাড়ীতে গেলাম। তাঁহারা মাতৃদেবীকে 'মাসিমা' বলিয়া ডাকিতেন। আমরা কেদারবাবুর স্ত্রীকে সৌদামিনীদিদি বলিয়া

ডাকিতাম। তাঁহাদের রন্ধন করিবার একটি লোক ছিল। আমরা তাঁহাদের বাড়ী যাইয়া দুই তিন দিবস সেই লোকটার রান্নাই খাইলাম। আমার মাতৃদেবী বলিলেন, "আমরা এতগুলি স্ত্রীলোক থাকিতে ভৃত্যের হস্তের রন্ধন খাওয়ার আবশ্যক কি? নিজেরা রান্না করিলে যেরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুখাদ্য হইবে, ভৃত্যের দ্বারা কি তেমন হইবে?" মাতৃদেবীর প্রস্তাবে সকলেই আনন্দিত মনে সায় দিলেন। তিনি প্রতিদিবস তাঁহার পাকে নিরামিষ তরকারিগুলি রন্ধন করিতেন। আমরা পালা করিয়া এক একদিন এক একজন আমিষ রন্ধন করিতাম। মৎস্যাদি রন্ধন করিতে আমরা চারিজন ছিলাম, -- আমি, আমার ছোটবোন বগলা, ভ্রাতৃবধূ হরবালা দেবী ও সৌদামিনী দেবী। আমরা রান্না করিয়া সকলকে খাওয়াইয়া, নিজেদের আহার তাড়াতাড়ি সারিয়া স্কুলে যাইতাম।

এখানেও প্রতিদিবস পারিবারিক উপাসনা হইত। সেই সময়কার ব্রাহ্মদের ধর্ম্মোৎসাহ ও উদ্যম কত ছিল! উপাসনা না করিয়া কেহ অন্নগ্রহণ করিতেন না। সেই ভাব এখন অনেক শিথিল হইয়া গিয়াছে। সেই জ্বলন্ত উৎসাহ যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা কখনই সেকথা ভুলিতে পারিবেন না। মাতৃদেবী কিঞ্চিৎ রন্ধন করিয়া উপাসনায় যোগ দিতেন; বাকী রান্না উপাসনার পরে করিতেন। অবশ্য তাঁহাকেই বেশী তরকারী প্রস্তুত করিতে হইত। একদিন দাদা এবং আমি পরামর্শ করিলাম, 'আজ মা উপাসনায় গেলে আমরা মা'র অবশিষ্ট রান্নাগুলি করিয়া রাখিব'। মাতা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উপাসনায় বসিয়াছেন, আমরা ভাইবোন দু'জনে উপাসনার মাঝখানে উঠিয়া আসিয়া মাতার পরিত্যক্ত ব্যঞ্জনগুলি রন্ধন করিতে বসিলাম। তিনি ফুলকপির ডাল্না কুটিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা সেইগুলি ভাজিতেছি, এমন সময় উপাসনা শেষ হইল। মাতৃদেবী উঠিয়া আসিয়া আমাদের ভাইবোনের কাণ্ড দেখিলেন। কপিগুলি যতটা ভাজা উচিত, তদপেক্ষা অধিক ভাজিয়া ফেলাতে খুব খানিকটা হাসি হইল।

সৌদামিনীদিদি

আমরা রান্না করিতে করিতে পড়া শিখিতাম। বইগুলি একটি পিঁড়ির উপর রাখিয়া, ডাল কিম্বা ভাত চড়াইয়া দিয়া পড়া করিতাম। মধ্যে মধ্যে বইয়ের পাতাগুলি খুলিয়া রাখিয়া দিতাম। যে সময় বই হাতে লইয়া পড়িবার সুবিধা হইত না, অর্থাৎ হলুদ ইত্যাদি মাখাইতে হইত, সেই সময় খোলা পাতা দেখিয়া পড়া মুখস্থ করিতাম। সৌদামিনীদিদি যে দিবস রান্না করিতে যাইতেন, সেইদিন দেখিতাম তিনি রান্না করিতেছেন, আর তাঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায় একখানি কাষ্ঠাসনের উপর উপবেশন করিয়া পুস্তক হাতে তাঁহাকে পড়াইতেছেন। ব্যাপারটি দেখিয়া আমরা খুবই হাসিতাম। সৌদামিনীদিদি শিশুপুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথকে লইয়াই স্কুলে যাইতেন। আরও দুই একজন তাঁহাদের শিশু সন্তানদের লইয়া স্কুলে আসিতেন। কারণ, অত সময়ের জন্য বাড়ীতে তাহাদের কাহারই বা কাছে রাখিয়া আসিবেন? একটি ঘরে শিশুদের রাখা হইত — তাহাদের মাতারা মাঝে মাঝে যাইয়া দেখিয়া আসিতেন। সৌদামিনীদিদি ও আমি এক ক্লাসে প্রথম শ্রেণীতে পড়িতাম। তিনি যদিও বয়সে আমাপেক্ষা বড় ছিলেন, তথাপি আমাদের দুইজনের যথার্থ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। আমরা সন্ধ্যার সময় বাড়ীর প্রাঙ্গণে দৌড়াদৌড়ি খেলিতাম। তাহাতে আমাদের খানিকটা ব্যায়াম হইত। রবিবার দিবস আমরা হাঁটিয়াই ব্রহ্মমন্দিরে যাইতাম।

সৌদামিনীদিদি একদিন কোথায় যাইতেছিলেন। জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "আমার একজন আত্মীয়ের বড় অসুখ। তিনি দেশ হইতে ঢাকাতে চিকিৎসার জন্য আসিয়াছেন; তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছি।" এইরূপ কিছুদিন তিনি তাঁহাকে দেখিতে প্রায় প্রতিদিবসই যাইতে লাগিলেন। একদিন তিনি তাঁহাকে দেখিতে যাইয়া বিষণ্ণমুখে অশ্রুসিক্ত নয়নে বাড়ী ফিরিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিলাম কি হইয়াছে, আর প্রশ্ন করিলাম না। কিয়ৎকাল পরে তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আহা! তারিণীদাদা কি ভাল ছিলেন। এই অল্পবয়সে স্ত্রীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া এবং একটি পুত্র ও শিশুকন্যার ভার দিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন।" মৃত্যু ত বয়সের মাপকাঠির হিসাবে চলে না। যখন যাহার প্রতি তাহার শুভ-ইচ্ছা উদ্বুদ্ধ হইবে, তখনই তাহাকে তাহার শরণাপন্ন হইতে হইবে। ... তখন কি জানিতাম ইনি আমার স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা!

আমার বিবাহ

আমি পড়াশুনা করিতে বড়ই ভালবাসিতাম। স্কুলে মনোযোগ সহকারে পড়িতে আমি বড়ই আনন্দ পাইতাম। কিন্তু ভাগ্যদেবতা আমার কপালে 'পড়াশুনা' বোধ হয় লেখেন নাই। বেশ বুঝিতে পারিলাম মাতৃদেবী আমার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। যোগ্য পাত্রের সন্ধান করিতে বন্ধুবান্ধবরা অনুরুদ্ধ হইলেন। মাতৃদেবীর আমার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। তিনি আত্মীয়স্বজন, ঐশ্বর্য্য, বাড়ীঘর সমস্ত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলেন একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া। এক্ষণে আমাকে সুযোগ্য পাত্রের সহিত বিবাহ দিতে সমর্থ হইলে তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, তাঁহারও আশ্রয় এবং অবলম্বনের একটি স্থান হয়। মাতৃদেবী জাতিভেদ অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছিলেন; বিশেষতঃ জাতিতে বিবাহ হইলে হিন্দুসমাজে ফিরিয়া যাইবার আশঙ্কাও তাঁহার মনে ছিল। দুই একজন ব্রাহ্মণ সন্তান প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন। মাতৃদেবীর তাঁহাদের প্রতি তেমন আগ্রহ দেখা যায় নাই। তথাপি তিনি আমার মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমার কিছুতেই মত হইল না। অবশ্য আমার মতে কি, বিধাতার যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই হইবে।

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেন ও কেদারনাথ রায় একই সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেন তখন অবিবাহিত; কেদারনাথ রায়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার পত্নী সৌদামিনী দেবী অম্বিকাচরণ সেন মহাশয়ের সম্পর্কে ভগিনী ও এক গ্রামবাসী। ইঁহাদের ভ্রাতা-ভগিনীতে অত্যন্ত ভালবাসা ছিল। এক্ষণে তাঁহার স্বামী ও ভ্রাতা একসঙ্গে ব্রাহ্ম হইলেন কাজেই ভালবাসা ও সহানুভূতি মিলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। তিনি তাঁহার স্বামীর কাছে আসিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন, কিন্তু কোন প্রকারেই সে সুযোগ পাইতেছিলেন না। তাঁহার দুঃখের কাহিনী জানাইয়া দাদাকে কত যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তখনকার ব্রাহ্মব্রাহ্মিকাদের অনেক প্রকার নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইত; বিশেষতঃ যাঁহাদের স্বামীরা ব্রাহ্ম হইয়াছেন কিন্তু স্ত্রীরা হিন্দুসমাজের গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ রহিয়াছেন। শুনিয়াছি সেই সময়ে ব্রাহ্ম স্বামীরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না স্ত্রীদিগকে হিন্দুসমাজের আবেষ্টন হইতে বাহির করিয়া লইয়া আসিতে পারিতেন, ততদিন তাঁহাদের দেখা সাক্ষাৎ করিবারও অধিকার থাকিত না। আপন বাড়ীতে উপস্থিত হইলে তাঁহাদের বাহিরে অন্নগ্রহণ করিতে হইত। এমন কি

উচ্ছিষ্ট বাসনগুলি নিজেদের পরিষ্কার করিতে হইত। সৌদামিনী দেবীর অনেক চিঠিই, মুক্ত আকাশে উড়িবাব জন্য ব্যাকুল পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর ন্যায়, স্বামীর নিকট আসিবার জন্য ব্যাকুলতায় পরিপূর্ণ থাকিত। কত চিঠিতে দেখিয়াছি তিনি লিখিয়াছেন, "দাদা, একটু উপাসনা করিবারও সুবিধা পাই না; মন বড়ই খারাপ। কবে যে দুঃখ দূর হইবে," ইত্যাদি। অনেক কথাই তিনি তাঁহার দাদাকে লিখিতেন।

কোন বন্ধু শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেনের নাম করাতে মাতৃদেবী অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং এই বিবাহ যাহাতে সম্পন্ন হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। শীতের ছুটিতে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেন মহাশয় তাঁহার বন্ধু ও ভগ্নীপতি কেদারনাথ রায় মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া অতিথি হইলেন। তিনি জানিতেন না যে, আমরাও সেই বাটীতে আছি। তাঁহার ধারণা ছিল আমরা মাতুল নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে রহিয়াছি। অতিথির জন্য আলাহিদা শয়নের ঘর ছিল না। কাজেই, তাঁহার ভগিনীর ঘরে একখানি খাট আনিয়া তাঁহার বিছানা হইল। সৌদামিনীদিদি একখানি খাটে তাঁহার নবজাত শিশুটিকে লইয়া শয়ন করিলেন। একটু দূরে তাঁহার স্বামী শ্যালকসহ শায়িত হইলেন। সেই রাত্রি তাঁহারা গল্প করিয়াই কাটাইলেন। আমাদের স্কুল তখনও ছুটি হয় নাই। প্রভাতে উঠিয়া নিত্যকার্য্য সমাপন করিয়া অতিথিকে এবং বাড়ীর সকলকে আহারাদি করাইয়া নিজেরা আহার করিলাম। তৎপরে স্কুলে চলিয়া গেলাম। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেন মহাশয় একদিবস আমাদের স্কুল পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায়ের বাড়ীতেও নিত্য পারিবারিক উপাসনা হইত। একদিন উপাসনার শেষভাগে রায়মহাশয় শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেনকে বলিলেন, "আপনি আমার নবজাত শিশুটির একটি নাম দিন।" তিনি একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায় কি যে নাম দিবেন স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায় সেই সময় জ্ঞানচর্চ্চায় নিযুক্ত ছিলেন। তজ্জন্য, হঠাৎ তাঁহার মনে হইল শিশুর নাম জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় রাখা যাইতে পারে। তিনি শিশুকে জ্ঞানেন্দ্রনাথ নাম দিয়াই আশীর্ব্বাদ করিলেন। কালে জ্ঞানেন্দ্রনাথ I. C. S. হইয়াছিলেন।

সেইবারেই আমাদের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া যায়। মাতা ঈপ্সিত জামাতা পাইলেন, কাজেই তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। দাদা আমাকে ক্ষেপাইতে আরম্ভ করিলেন। ছোট ভগিনী বগলাও ভাবী ভগ্নীপতির সহিত নানারূপ কৌতুক করিতে আরম্ভ করিল।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায়ের মাতৃদেবীও সেই সময়ে পুত্রের সহিত বাস করিতেছিলেন। তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছিল। শুনিয়াছি তাঁহার দুই তিনটি সন্তান মারা যাওয়াতেই ঐরূপ হয়। তিনি আমাকে ও আমার ছোটবোন বগলাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন। বগলাকে তিনি মুক্তকেশী বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার একটি কন্যার নাম মুক্তকেশী ছিল। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেন মহাশয় যে-দিবস ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, তিনি যে খাটখানিতে শয়ন করিতেন, ইনি তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহার ক্রন্দন শ্রবণে ছুটিয়া তাঁহার নিকট গেলাম। অচিরেই ক্রন্দনের কারণ বুঝিলাম। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছিলেন, "তুমি এখানে শুয়ে থাকতে, দেখতে কেমন ভাল লাগত! কেন চলে গেলে? ইত্যাদি।" তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইলেও অন্তরে স্নেহ ভালবাসা পূর্ণমাত্রায়ই ছিল।

তিনি তাঁহার পুত্র কেদারনাথকে 'কেদ্রু' বলিয়া ডাকিতেন, পুত্রবধূ সৌদামিনীকে 'সদু' বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহারা তাঁহার চক্ষের অন্তরাল হইলেই তিনি ক্ষেপিয়া যাইতেন। কাছে কাছে থাকিলেই তিনি সুস্থির থাকিতেন। এমন কি আমাদেরও তিনি চক্ষের অন্তরাল করিতে চাহিতেন না। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেন মহাশয়ের সঙ্গে আমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, একথা তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইলেও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার পুত্র কেদারনাথকে তাঁহার কন্যা মুক্তকেশীর (আমার ভগ্নী বগলার) বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছিল যে, আমার ভগিনী বগলাই তাঁহার পরলোকগতা কন্যা মুক্তকেশী।

গ্রীষ্মাবকাশে আমাদের বিবাহ হইবে স্থির হইল। আর পাঁচ মাস মাত্র স্কুলে পড়িতে পারিব, মনে হইলেই আমার বড় দুঃখ হইত। লেখাপড়া শিখিবার আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয়ে বড়ই প্রবল ছিল। একবার সংসারে প্রবেশ করিলে কি আর পড়াশুনা করা সম্ভবপর হইবে? অন্যদিকে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। এইরূপ দেবতার মতন পতি কয়জনার ভাগ্যে লেখা আছে? ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন, বাঙ্গলা ২০শে জ্যৈষ্ঠ, আমাদের শুভবিবাহের দিন ধার্য্য হইল। মাতৃদেবী অল্পে অল্পে বিবাহের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রদ্ধেয় প্রচারক কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় আমাদের বিবাহে পৌরোহিত্য করিবেন স্থির হইল। তাঁহার অতিশয় স্নেহের পাত্রের বিবাহ তিনি না আসিলে কি হইতে পারে? বিবাহের দুই তিন দিবস পূর্ব্বে তিনি ঢাকা পৌঁছিলেন। গোয়ালন্দ হইতে বৃহদাকার দুই তিনটি তরমুজ ক্রয় করিয়া আনিলেন। দাদার দুই তিনজন বন্ধুও বিবাহ উপলক্ষে ঢাকা আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে আমরা দাদা বলিয়া ডাকিতাম। বাস্তবিকই তাঁহারা আমাদের নিজ দাদার মতন হইয়াছিলেন। সেকালে ভ্রাতাভগিনীর পবিত্র ভালবাসার আদানপ্রদানে কত আনন্দের সৃষ্টি হইত। এখন আর সেইরূপ দেখা যায় না।

বিবাহের জন্য একটি বাড়ী ভাড়া করা হইল। সমস্ত আয়োজন, নিমন্ত্রণাদি হইয়া গিয়াছে, এমন সময় সংবাদ আসিল বরের ভ্রাতুষ্পুত্র প্রফুল্লচন্দ্র অত্যন্ত পীড়িত। পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রের তিনিই পিতার ন্যায় ছিলেন। পীড়িতের শয্যাপার্শ্বে যাইবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইলেন; কিন্তু তখন কি যাওয়া সম্ভব? দিন পরিবর্ত্তন করাও সম্ভবপর নহে, কাজেই বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন, নিজে না যাইয়া ডাক্তার পাঠাইতে, যাহাতে তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থাও হইবে এবং সকল দিক রক্ষা পাইবে। তখন বন্ধুবর ও ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সেন মহাশয় একজন প্রবীণ ডাক্তার ও ভৃত্যসহ তাঁহার বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। ভগবানের কৃপায় এবং চিকিৎসার গুণে প্রফুল্লচন্দ্রের অবস্থা ভালর দিকে চলিয়াছে দেখিয়া শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সেন মহাশয় ডাক্তার ও ভৃত্যসহ বিবাহের পরদিবস ঢাকায় ফিরিয়া আসিলেন। ভৃত্যটি মনিবের বিবাহ দেখিতে পায় নাই এবং আমোদ আহ্লাদ করিতে পারে নাই, তজ্জন্য তাহারা মনে অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মিল। মনের দুঃখ কথঞ্চিৎ লাঘব করিবার মানসে সে এক ফন্দি আঁটিল। দোকানদারের নিকট হইতে মনিবের নাম করিয়া কতকগুলি বাজী লইয়া আসিল। বিবাহের পরদিবস সভামণ্ডপে চেয়ার বেঞ্চিগুলি তখনও সাজান ছিল; বাদ্যকরেরা বিদায়ের পূর্ব্বে অত্যন্ত উদ্যমের সহিত বাজাইতেছিল। অনেকেই বসিয়া বাজনা শুনিতেছিলেন। শ্রদ্ধেয় কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় ও নব-বিবাহিত বর তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। মিত্রমহাশয় ঢাকার ঢুলীদের প্রশংসা করিতেছেন,

এমন সময় সমস্ত বাড়ী ধূমেতে অন্ধকার হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর শব্দ আরম্ভ হইল। আমরা দৌড়াইয়া ঘরে পালাইলাম। পরে জানা গেল এক বাণ্ডিল বাজীতে ভৃত্য আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল;তাহা হইতেই শব্দ ও ধূমোদ্গম হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র ও বর অতি নিকটেই বেঞ্চে বসিয়াছিলেন। পশ্চাতে থাকাতে বেঞ্চিতে বাজীগুলি বাধা পাইয়াছিল। ভগবানই তাঁহাদের রক্ষা করিলেন। যাহা হউক, বাজীর আগুন নির্ব্বাপিত করা হইল। কাহারও কোন ক্ষতি হয় নাই বা আঘাত লাগে নাই, তাহা হইলে বিবাহের আনন্দ বিষাদে পরিণত হইত।

আমাদের বিবাহের পূর্ব্বে ঢাকাতে বোধহয় দুই তিনটিমাত্র ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়াছিল। সকলেই একবাক্যে বলিলেন, এমন বিবাহ ঢাকাতে ইতিপূর্ব্বে হয় নাই। ধনের জন্য বা জাঁকজমকের জন্য নহে; তাহাতে কেহ মোহিত হন নাই। এমন গম্ভীরভাবে এমন হৃদয়স্পর্শী অনুষ্ঠান নাকি আর হয় নাই। শ্রদ্ধেয় বঙ্গচন্দ্র রায় ও শ্রদ্ধেয় কান্তিচন্দ্র মিত্র অতি স্নেহের পাত্র ও পাত্রীর বিবাহে পৌরোহিত্য করিলেন এবং শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সুমধুর কণ্ঠে সঙ্গীত করিলেন। অনেকগুলি ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়াছিল; আজকাল বিবাহ অনুষ্ঠানে অতগুলি গীত গাহিতে দেখা যায় না।

তৎপরে আহারাদি চমৎকার হইল। মেয়েরা অনেকেই স্বহস্তে রন্ধন করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত[৩২] (Sir K. G. Guptaর[৩৩] পিতা) মহাশয়ের মদন নামক পাচকও রন্ধনে সাহায্য করিয়াছিল। বিবাহবাটীর আঙ্গিনাতে একটি বাঁধান কূপ ছিল। তাহার উপর একটি গোল টেবিল বসাইয়া সাহেবদের আহারের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। পূর্ণিমারাত্রির চন্দ্রালোকের উপর আর অন্য কোন আলোকের প্রয়োজন হয় নাই। চন্দ্রদেবও যেন বিবাহের দিন সকলের সহিত হাসিতেছিলেন। বিবাহের কয়েকদিবস পূর্ব্ব হইতেই আমোদ আহ্লাদ চলিতেছিল। বিবাহের পরের দিবসও সমাগত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন হর্ষ ও আনন্দে মগ্ন রহিলেন। দ্বিতীয় দিবসে বিবাহবাটী ত্যাগ করিয়া আমরা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায়ের বাড়ী আসিলাম। তৃতীয় দিবস শ্বশুরালয়ে যাইবার দিন ধার্য্য হইল। সেইদিন সকলের মুখেই বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া আসিল। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সকলে আমাদের বুড়ীগঙ্গার ঘাটে নৌকায় তুলিয়া দিয়া বিষণ্ণমুখে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। বলাবাহুল্য, আমি অনেকক্ষণ কাঁদিয়াছিলাম পরে ঘুমাইয়া পড়িলাম।পরদিবস দ্বিপ্রহরে মত্তগ্রামে শ্বশুরালয়ে পৌঁছিলাম। শ্রীমান্ প্রফুল্লচন্দ্রের মাতা ও ননদিনী শশীমুখী গুপ্ত আমাদের নদীর ঘাট হইতে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। দলে দলে লোক নববধূ দেখিতে আসিতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজের মেয়ে না জানি কেমন? অদ্ভুত কিছু হইবে বোধ হয়। নূতন বধূ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া থাকিবে;কেহ দেখিতে আসিলে মুখের কাপড় তুলিয়া কোন আত্মীয়া নববধূর মুখ দেখাইবেন, সেই সময় নববধূ চক্ষু বুঁজিয়া থাকিবে, এই ত তাহারা জানে। কিন্তু এই ব্রাহ্মবধূর ত মুখ ঢাকা নাই; যে আসিতেছে সেই তাহার মুখ দেখিতে পাইতেছে। ইহা যে তাহাদের নিকট কিছু নূতন ধরণের মনে হইবে তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। উপরন্তু বয়স্থা বধূ, ব্রাহ্মণকন্যা, বৈদ্য-বর এই সকল কি তাহাদের নিকট কম আশ্চর্য্যের বিষয়। অবশ্য সমস্ত বিচিত্রতা সত্ত্বেও শ্বশুরালয়ে আদর অভ্যর্থনা যথেষ্টই পাইলাম। তিন চার দিবস শ্বশুরালয়ে থাকিয়া আমরা কৃষ্ণনগরাভিমুখে (আমার স্বামীর কার্য্যস্থল) যাত্রা করিলাম। নৌকাযোগে মত্ত হইতে গোয়ালন্দ যাইয়া ট্রেণে উঠিলাম। আমরা যে ট্রেণে উঠিয়াছিলাম, সেই ট্রেণে দুইটি ভদ্রলোক উঠিয়াছিলেন; তাঁহারা আমাদিগকে

বেশ ঔৎসুক্যের সহিত দেখিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহারা অতি ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সম্প্রতি ঢাকায় যে একটি ব্রাহ্মবিবাহ হইয়াছে সংবাদপত্রে দেখিলাম, আপনাদেরই কি -- ?" আমার স্বামী বলিলেন, "হ্যাঁ।" সেই ভদ্রলোক দুইটির ভাগ্যে ছিল সংবাদপত্রে-পড়া বরকন্যার দর্শনলাভ করা, তজ্জন্য তাঁহারা সেই ট্রেণে আমাদের কম্পার্টমেণ্টেই (Compartment) উঠিয়াছিলেন।

যাহা হউক, শ্বশুরালয় হইতে স্বামীর কর্ম্মস্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম। বাড়ীতে একটি পুরাতন ঝি ছিল, সেই আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে লইয়া গেল। চাকর আমাদের সঙ্গেই ছিল। শুনিয়াছি চাকরটি নাকি ভদ্রলোকের সন্তান। সে রন্ধনকার্য্য করিত এবং ঝি অন্যান্য কাজ করিত। আমার উপর ঝি বেশ একটু কর্ত্তৃত্ব করিত। তিনি যেন আমার শ্বাশুড়ী বিশেষ হইয়া দাঁড়াইলেন। আমি তাহাকে একটু ভয় করিয়াই চলিতাম। আমার ভয়ের কারণ ছিল পাছে সে চলিয়া যায়;স্বামী কলেজে চলিয়া গেলে কেমন করিয়া একেলা থাকিব। কারণ বাড়ীটি সহরের অল্পদূর বাহিরে অবস্থিত ছিল। অবশ্য সেই বাড়ী আমার স্বামী শীঘ্রই পরিবর্ত্তন করিলেন। ঝিটি কিন্তু আমাকে হাতের মুঠার ভিতর রাখিতে চেষ্টা করিত।

শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী খাঁ

এক দিবস পাল্কী চড়িয়া দুইটি মেয়ে আমাকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহারা আদর করিয়া তাঁহাদের বাটীতে আমাকে লইয়া গেলেন এবং আহারাদি করাইয়া বাড়ীর ভৃত্যসহ পাল্কী করিয়া আমাকে ফিরাইয়া পাঠাইলেন। শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী খাঁ আমার স্বামীকে ভ্রাতৃতুল্য ভালবাসিতেন। তাঁহার মাতৃদেবীও তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। এক্ষণে আমিও তাঁহাদের বাটীতে কন্যাসম স্নেহলাভ করিলাম। তাঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ, হিন্দু। আমরা তাঁহাদের নিকট জাতিহীন ব্রাহ্ম। কিন্তু তাঁহাদের সেই আদর জীবনে কখনও ভুলিব না। তাঁহাদের বাড়ীতে গেলে সকলের আগে আমাকে রান্নাঘরে লইয়া যাইতেন এবং --- 'তোমাকে রন্ধন করিতে হইবে' বলিয়া সকল জিনিষ স্পর্শ করাইয়া দিতেন। যাহাতে জাতিভ্রষ্ট বলিয়া আমার সঙ্কোচের ভাব না আসে। কলেজ ছুটির দিবস আমরা যাইয়া তাঁহাদের বাড়ী সমস্তদিন কাটাইয়া আসিতাম। তাঁহারা আমাদের কি বলিয়া আদর করিবেন, কি খাওয়াইবেন, যেন ঠিক করিতে পারিতেন না। এইরূপ উদারতা ও অকৃত্রিম ভালবাসা পাওয়া সৃষ্টিকর্ত্তা সকলের ভাগ্যে লিখেন নাই।

স্যার আশুতোষ চৌধুরীর মাতৃদেবীর স্নেহের কথা ইতিপূর্ব্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি। আমাদের তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। আমার স্বামী কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্যের কাজ করিতেন। স্যার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনী প্রসন্নময়ী দেবী রবিবার সন্ধ্যার সময় তাঁহাদের ঘরের গাড়ীতে আমাদের বাড়ী আসিয়া আমাদের সমাজে লইয়া যাইতেন। পুনরায় উপাসনা সমাপন হইলে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতেন। বলাবাহুল্য, আমাদের তখন গাড়ী ছিল না। স্বামী যখন একাকী ছিলেন তখন হাঁটিয়াই মন্দিরে যাইতেন। কিন্তু আমার তাহাতে অসুবিধা হইবে, সেইজন্য অনুগ্রহ করিয়া এবং ভালবাসার টানে প্রসন্নময়ী দেবী তাঁহার গাড়ীতে আমাদের লইয়া যাইতেন। তাঁহাদের স্নেহ ভালবাসা এ-জীবনে ভুলিতে পারিব না।

পূজনীয় রামতনু লাহিড়ী

কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী আমাকে সহোদরাতুল্য ভালবাসিতেন, একথা পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত পূজনীয় রামতনু লাহিড়ী ও তাঁহার পত্নী আমার স্বামীকে পুত্রসম স্নেহ করিতেন। এক্ষণে আমিও তাঁহাদের স্নেহের অংশীদার হইলাম। তাঁহাদের স্নেহ-ভালবাসার কথা কি লিখিব; আমি যেন শ্বশুরালয় হইতে পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিয়াছি। কি করিবেন, কি খাওয়াইবেন তাহা ভাবিয়া পাইতেন না। মধ্যে মধ্যে পূজনীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয় রবিবারে পাল্কী করিয়া আমাদের গৃহে আসিতেন। আমার স্বামীর সহিত ধর্ম্ম ও জ্ঞানালোচনা করিতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। সমস্ত দিবস থাকিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেন এবং আমার স্বহস্ত প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন অতি আনন্দের সহিত আহার করিতেন। পূজনীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের মতন সাধুব্যক্তির স্নেহ ভালবাসা লাভ করা আমার পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা নহে।

কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ

আমার বিবাহের চারি মাস পরে আমার কনিষ্ঠা ভগিনী বগলাসুন্দরীর, কালীকচ্ছ গ্রামনিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র নন্দীর সহিত বিবাহ হয়। আমার স্বামীর ইচ্ছা ছিল বগলাকে আমাদের কাছে লইয়া আসেন ও তাহার বিবাহ দেন। কিন্তু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাইবে? বিধাতা তাহার জন্য যে পাত্র স্থির করিয়াছিলেন, শারদীয়া পূজার ছুটির কিছু পূর্ব্বে তাহারই সহিত বিবাহের দিন ধার্য্য হইল। দাদা ভগিনীর বিবাহে আমাকে লইয়া যাইতে কৃষ্ণনগর আসিলেন। আমি বড়ই সমস্যায় পড়িলাম। সবেমাত্র চারি মাস স্বামীগৃহে আসিয়াছি; কিরূপে তাঁহাকে একাকী রাখিয়া যাই, অথচ, দাদাকেই বা কেমন করিয়া ফিরাইয়া দিই? সমস্যা বড়ই কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। অবশেষে ভগ্নীর বিবাহে যাওয়াই স্থির করিলাম; দাদাকে ফিরাইতে পারিলাম না। অল্প দিন কয়েক পরেই পূজার অবকাশ। সেই সময় ঢাকায় আসিয়া স্বামী আমার সহিত মিলিত হইবেন। যদিও তাঁহাকে এই অল্প কয়েক দিবসের জন্য ছাড়িয়া আসিতেও আমার সবিশেষ কষ্ট হইল, কিন্তু স্নেহময় দাদাকে ফিরাইয়া দিলে তাঁহার প্রাণে আঘাত লাগিবে, এই ভাবিয়া আমি দাদার সহিত কলিকাতা হইয়া ঢাকা যাইতে বাধ্য হইলাম। মাতৃদেবী আমাকে পাইয়া আনন্দিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার বড় জামাতা বিবাহে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না শুনিয়া মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। আর কয়েকদিবস পরে হইলেই বড় জামাতা বিবাহে উপস্থিত থাকিতে পারিতেন এই ভাবিয়াই তাঁহার বেশী দুঃখ হইল। বরপক্ষের ইচ্ছামতন এবং সুবিধামতন বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়াছিল। মাতৃদেবীর তাহাতে প্রতিবাদ করিবার উপায় ছিল না।

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহে পুরোহিতের কার্য্য করেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ইনি বগলাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতেন। শুভকার্য্যের সময়ও মাতৃ-সম্বোধন করিয়া তাহার বিবাহ দিলেন।

অল্প কয়েক দিবস পরেই আমার স্বামী ঢাকায় আসিলেন। কিছুদিন থাকিয়া পুনরায় আমায় লইয়া কৃষ্ণনগরে চলিয়া গেলেন। আমরা ভগবানের কৃপায় কৃষ্ণনগরে সুখে সংসার করিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে প্রচারকগণ কৃষ্ণনগরে আসিতেন; তাঁহারা আমাদের ছোট্ট সংসার দেখিয়া আনন্দিত হইতেন। একবার Mr. & Mrs. A. M. Bose কৃষ্ণনগরে বেড়াইতে আসিলেন এবং আমাদের সুন্দরভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ছোট বাড়ীটি দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কন্যা সরযূর জন্ম

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর আমার কন্যা সরযূবালার জন্ম হয়। আমার স্বামী কন্যাই চাহিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হওয়াতে তিনি অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেন। কন্যার একমাস পূর্ণ হইলে ঘটা করিয়া জাতকর্ম্ম হইল। এই অনুষ্ঠানে অনেকেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। পূজনীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয় ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী মাননীয়া কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী (এই স্নেহশীলা নারীর বিষয় আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, তাঁহাকে আমি ছোট্‌দি বলিতাম) এই পর্ব্বে যোগদান করিয়াছিলেন। 'ছোট্‌দি' সমস্তক্ষণ খুকীকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়াছিলেন। উপাসনান্তে সকলে আহার করিয়া বাড়ী ফিরিলেন। এস্থলে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। তাহাতে তখনকার আত্মীয়তার ও ভালবাসার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। আমার কন্যার জন্মের সংবাদ পাইয়া অনেকেই তাহার জন্য দুধ পাঠাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ছাগলের দুধও একজন পাঠাইয়াছিলেন। সদ্যজাত শিশু কতটুকুন দুধই বা খাইবে।

কন্যার দুইমাস বয়সের সময় মাতৃদেবী আমাকে লইয়া ঢাকা যাইবেন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ঢাকায় আমার ভগিনী বগলা থাকিত। মাতৃদেবী তাহাকেও বেশীদিন ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না; অথচ আমিও একাকী শিশুকন্যা পালনে সক্ষম হইব না, এই কারণে আমাকে লইয়া ঢাকা যাত্রা করিলেন। ঢাকায় সেই সময় বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় অন্য কয়েকজন ব্রাহ্ম ও ভগ্নীপতি কৈলাশচন্দ্র নন্দী মহাশয় মালীটোলা নামক স্থানে বাটী ভাড়া করিয়া বাস করিতেছিলেন। বঙ্গবাবু প্রভৃতি সকলে আমার শিশুকন্যাকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। এদিকে আমার স্বামীর ইচ্ছা ছিল না যে, আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া ঢাকা যাই; আমারও তদ্রূপ ইচ্ছা ছিল। মাতৃদেবীর অসুবিধা ভাবিয়া আমাদের উভয়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যাইতে হইয়াছিল।

কিন্তু কিছুদিন পরে কৃষ্ণনগরে অত্যন্ত বসন্ত রোগ আরম্ভ হইল, কাজেই অসময়ে কলেজ ছুটী হইয়া গেল। স্বামী ঢাকায় চলিয়া আসিলেন। এই ব্যাপারে মঙ্গলময়ের শুভ ইচ্ছা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম। কন্যাকে লইয়া পূর্ব্বে না চলিয়া আসিলে হয়ত বিপদ ঘটিতে পারিত।

মাতুলালয়ে গমন

কন্যা ছয় সাত মাসের হইলে আমরা মাতুলালয়ে গেলাম। আমাদের দুই ভগিনীর বিবাহের পর এই প্রথম মাতুলালয়ে আসা। মাতুলালয় শূন্য করিয়া, তাঁহাদের প্রাণে গুরুতর আঘাত দিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা ব্রাহ্মসমাজে চলিয়া গিয়াছিলাম। এতদ্ব্যতীত আমাদের দুই ভগিনীরই অসবর্ণ বিবাহ হইয়াছে। বেলা দ্বিপ্রহরে আমাদের নৌকা খালের ঘাটে লাগিল। আমাদের আগমনবার্ত্তা পাইয়াই বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। দিবসে তাঁহারা আমাদিগকে বাড়ীতে উঠাইতে সাহস পাইলেন না; অথচ তাঁহাদের স্নেহপ্রবণ প্রাণ আমাদিগকে বক্ষে ধরিবার জন্য আগ্রহে ব্যাকুল। সমাজ তাঁহাদিগকে অভিশাপ-অঙ্গুলি তুলিয়া নিষেধ করিতেছিল।

স্নেহশীলা সোনাদিদি জল ভাঙ্গিয়া খালের মধ্যস্থলে আমাদের নৌকায় অন্নব্যঞ্জন বহন করিয়া আনিয়া আমাদিগকে আহার করাইলেন। সেই দিবস তাঁহাদের হৃদয়ে হর্ষ ও বিষাদের অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছিল। কতকাল পরে স্নেহের হারানো ধনগুলি ফিরিয়া পাইয়াছেন। অথচ লোকভয়ে তাহাদের গৃহে তুলিয়া আহার পর্য্যন্ত করাইতে পারিতেছেন না। প্রকৃত সমস্যাই বটে!

যাহা হউক, সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে উঠিয়া সকলের পদধূলি লইলাম। বাল্যের সুখস্মৃতি স্মরণ করিয়া অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেই দিদিমাতা, যাঁহার স্নেহ ভালবাসার সীমা পরিসীমা ছিল না ও মাতুল মাতুলানীদের স্নেহমাখা মুখগুলি দেখিয়া প্রাণ জুড়াইল। তাঁহারাও যেন হাতে আকাশ পাইলেন। আমাদের পুনরায় দেখিতে পাইবার আশা তাঁহাদের ছিল না। সমাজের শাসন তাঁহারা কেমন করিয়া এড়াইবেন। আমাদের বাড়ীসংলগ্ন দুই এক ঘর প্রতিবেশী আমাদের অতিশয় স্নেহ করিতেন। আমরা যাইয়া তাঁহাদের সহিতও দেখা করিলাম। বলাবাহুল্য, তাঁহার অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

পুনরায় কৃষ্ণনগরে ফিরিয়া আসিলাম। বিবাহের পূর্ব্বে স্কুল ছাড়িতে আমার বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। পড়াশুনা করিবার ইচ্ছা আমার অত্যন্ত প্রবল ছিল। বিবাহের পরে স্বামীকে পড়াইবার জন্য বিরক্ত করিতাম; কিন্তু তিনি কিছুতেই আমাকে পড়াইতে রাজী ছিলেন না। অবশেষে তিনি ক্ষুদিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় নামক তাঁহার একজন সুযোগ্য ছাত্রকে আমার শিক্ষকতার ভার দিলেন। আমি অতি উৎসাহের সহিত তাঁহার কাছে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু এই সুবিধাটুকুও আমার ভাগ্যে অতি অল্পদিনের জন্য স্থায়ী হইয়াছিল। আমার পড়ার কথা শুনিয়া শ্রীযুক্ত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের[৩৪] স্ত্রী শ্রীযুক্তা গিরিজাসুন্দরী ক্ষুদিরামবাবুর নিকট পড়িবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তদনুসারে আমি তাঁহার বাড়ী যাইতাম ও দুজনাই একত্র ক্ষুদিরাম-বাবুর নিকট পড়িতাম।

স্বামীর বিলাত যাত্রা

আমার স্বামীর মনে সেই সময় বড়ই ভাবনা হইল। শিক্ষাবিভাগে বেতন অতি অল্পই পাওয়া যায়। আমরা দুইজন হইলে কিছুই ভাবনা ছিল না। কিন্তু সন্তানের লালনপালন ও উপযুক্ত শিক্ষার জন্য অর্থের প্রয়োজন হইবে। ভগবান কৃপাবশতঃ পিতামাতার ক্রোড়ে সন্তান দিয়াছেন। পিতামাতারও কর্ত্তব্য তাহাদের যথোপযুক্ত লালনপালন করা। একদিবস তিনি আমাকে বলিলেন, "দেখ, কৃষিবিভাগে গভর্ণমেন্ট বৎসরে দুইটি করিয়া ছাত্রকে বৃত্তি দিয়া বিলাত পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছেন, আমি কি ইহার একটির জন্য দরখাস্ত করিব? তবে এই বয়সে একবার শিক্ষকতা করিয়া পুনরায় ছাত্র সাজিতে হইবে। পরীক্ষায় যদি কৃতকার্য্য না হই তাহা হইলে বড়ই লজ্জার কথা হইবে। তা' ছাড়া আমাকে হয়ত বৃত্তি দিবেই না।" আমি তাঁহাকে বলিলাম, "দরখাস্ত ত কর; ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। যদি বৃত্তি পাইয়া বিলাত যাও, ভালই। আর যদি বৃত্তি নাও পাও, তাহাতেও দুঃখ নাই।" যাহা হউক, তিনি দরখাস্ত লিখিয়া পাঠাইলেন। বহুদিবস কোন উত্তরই আসিল না। আমরা মনে করিলাম বোধহয় বৃত্তি পাইবেন না। যদি বিলাত যাওয়া হয়, ইহা ভাবিয়া সংসারের কোন কোন কাজ বন্ধ করিয়া

দেওয়া হইয়াছিল। এক্ষণে সংসারের পুনর্ব্বন্দোবস্ত আরম্ভ হইল। সেই সময় প্রায়ই আমি নিজে রন্ধন করিতাম। সিঁড়ী ভাঙ্গিয়া নীচেরতলায় যাইয়া রন্ধন করিতে আমার বড়ই কষ্ট হইত। তজ্জন্য দ্বিতলের ছাতে খোলার বন্ধনশালা প্রস্তুত হইতেছিল। হঠাৎ একদিন স্বামী ঘরামীদের ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা কাজ বন্ধ কর। এই কথা শুনিয়া আমি সচকিত হইয়া তাঁহার নিকট ছুটিয়া গেলাম এবং হঠাৎ কেন ঘরামীদের কাজ করিতে বারণ করিতেছ, জিজ্ঞাসা করাতে, কোন উত্তর না দিয়া তিনি আমার হাতে খুব বড় একখানা লেফাফা দিলেন। অবিলম্বে সমস্ত অবগত হইলাম। তখন দুইজনই কিয়ৎকালের জন্য নিস্তব্ধ।

বিধাতার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। কিন্তু বড়ই কঠিন অবস্থায় পড়িলাম। আমার অগ্নিপরীক্ষা আরম্ভ হইল। স্বামীর বিলাতযাত্রার যে দিন ধার্য্য হইল, তাহার প্রায় একমাস পূর্ব্বে তাঁহাকে একাকী কৃষ্ণনগরে রাখিয়া আমি ঢাকা যাইতে বাধ্য হইলাম। হায়! আমার সোণার সংসার চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। আমি মাতার সহিত কন্যা সরযূবালাকে লইয়া ঢাকাতে কনিষ্ঠা ভগিনীর সঙ্গে বাস করিতে লাগিলাম। স্বামী ঐরূপ মনের অবস্থা লইয়া কুড়ি পঁচিশ দিবস একাকী কৃষ্ণনগরে রহিলেন। পরে ঢাকায় আসিয়া দুই চারিদিন মাত্র থাকিয়া তিনি বিলাতযাত্রার জন্য কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। এস্থানে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। কলিকাতাযাত্রার দিবস পারিবারিক উপাসনার সময় হঠাৎ আমার ভগ্নীপতি কৈলাসচন্দ্র নন্দী মহাশয় তাঁহার শিশু-কন্যার একটি নাম দিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। পূর্ব্বে তিনি এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র আভাষ পান নাই, হঠাৎ বলাতে একটু বিপন্ন হইলেন। তাঁহাদের ঘরে একখানি পুস্তক ছিল। উপাসনার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সেই পুস্তকখানির প্রতি আমার স্বামীর নজর পড়িয়াছিল। বইখানির নাম ছিল 'সুরুচির কুটীর'[৩৫]। হঠাৎ তাঁহার সেই পুস্তকের কথা মনে পড়িল, তিনি শিশুকন্যার নাম দিলেন 'সুরুচিবালা'।

পুত্রের জন্ম

স্বামী আমাকে ও কন্যা সরযূবালাকে ভগবানের ও মাতৃদেবীর হস্তে সমর্পণ করিয়া কলিকাতা চলিয়া আসিলেন। আমার পরীক্ষা ক্রমশঃই কঠিন হইতেছিল। স্বামী ঢাকা ছাড়িবার সাতদিন পরে আমার একটি পুত্র-সন্তান হয়। ঐ কারণেই স্বামীকে একাকী কৃষ্ণনগরে রাখিয়া আমাকে ঢাকা যাইতে হইয়াছিল।

এদিকে স্বামী কলিকাতা যাইয়াই জ্বরে শয্যাগত হইয়া পড়িলেন; নচেৎ দিনেকের জন্য আসিয়াও পুত্রমুখ সন্দর্শন করিতেন। আমিও ঢাকাতে শয্যাশায়ী। কাহারো নড়িবার সাধ্য নাই। স্বামী প্রতিদিবস শয্যায় শুইয়া আমাকে চিঠি লিখিতেন। কিন্তু নিজের অসুস্থতার কথা বিন্দুবিসর্গও আমাকে জানিতে দেন নাই। যাহা হউক, স্বামীর বন্ধুগণ তাঁহাকে ঔষধপথ্য দিয়া কোনপ্রকারে জাহাজে তুলিয়া দিলেন। পরে শুনিলাম ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীর মহাশয় অতি যত্নের সহিত তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। স্বামী বিলাতযাত্রা করিবার পরে তাঁহার প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দত্ত মহাশয় তাঁহার পরিত্যক্ত কাপড়গুলি আমার নিকট পৌঁছাইয়া দিলেন এবং স্বামীর অসুখের কথা তখন আমাকে জানাইলেন। ঐ অসুস্থ শরীরে প্রতিদিবস আমাকে কেমন করিয়া পত্র লিখিতেন ভাবিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম।

কলিকাতা হইতে 'ভিগা' (Vega) নামক ষ্টীমারে তিনি বিলাতযাত্রা করিলেন। Steamer

হইতে প্রতিদিন পত্র লিখিতেন। যেখানে জাহাজ থামিত, সেখানে ডাকে দিতেন। ইংলণ্ডের কাছাকাছি যাইয়া তাঁহারা প্রবল ঝটিকার মুখে পড়িলেন। ঝড়ের প্রাবল্যে জাহাজখানি সাত দিবস পিছাইয়া পড়িল। যাহা হউক, ভগবানের কৃপায় তিনি ইংলণ্ডে পৌঁছিলেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে তিনি বিলাতযাত্রা করেন। প্রতি 'মেলেই' আমাকে পত্র লিখিতেন। কোন 'মেলে' চিঠি না পাইলে এক সপ্তাহ ভাবনায় কাটিয়া যাইত। পরের mailএ দেখিতাম একত্র দুইখানি পত্র আসিয়াছে। চিঠি ডাকে দেওয়ার বিলম্বেই ঐরূপ হইত। ঐ চিঠিগুলি ঘটনাবশতঃ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য সঠিক তারিখ দিতে পারিতেছি না। অমূল্য সম্পত্তি চিঠিগুলি হারাইয়া আমি আপনাকে কাঙ্গালিনী মনে করিতেছি।

ইংলণ্ডে যাইয়া স্বামী 'সিসেস্টার' কলেজে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেখানে তাঁহার শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু[৩৬] মহাশয়ের সহিত বিশেষ বন্ধুতা হয়। দেশে প্রত্যাগমন করিয়া যখন কার্য্যে নিযুক্ত হন তখন বর্দ্ধমানে শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের শ্বশ্রূমাতাঠাকুরাণী আমাদের দুইজনাকেই সন্তানবৎ স্নেহ করিতেন। তাঁহাদের বাড়ীর সকলেই আমাদের অত্যন্ত আপনার লোক হইয়াছিলেন। আজিও সেই সুমধুর সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

মাতুলালয়ে গমন

ঢাকাতে কন্যা সরযূবালা ও শিশুপুত্রটিকে লইয়া ভগ্নীপতি কৈলাসচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের বাটী ছয় সাত মাস থাকিবার পর মাতৃদেবী স্থির করিলেন, যাঁহাদিগকে চিরজীবনের মতন ছাড়িয়া আসিয়াছি, এই সুযোগে তাঁহাদের সহিত যাইয়া কতিপয় দিবস বাস করিবেন। কার্য্যতঃ তাহাই করিলেন। আমাদিগকে লইয়া নৌকাযোগে মাতুলালয়ে চলিয়া আসিলেন। বাড়ীর ঘাটে নৌকা লাগিবামাত্র বাটীর সকলে ও প্রতিবাসীরা আমাদিগকে আহ্লাদের সহিত সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। আমার কোলের কুসুমকোরক পুত্রটি দেখিয়া সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একজন বৃদ্ধা প্রতিবেশী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি নিয়ে এসেছিস্; এ কি দেবতা না মানুষ? এমন রূপ ত' কখনও দেখি নাই!" বহুকাল পরে মাতুল, মাতুলানী, প্রাণসমা স্নেহশীলা সোনাদিদি আমাদিগকে পাইয়া কতই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; সেবার ও যত্নের বিন্দুমাত্র ত্রুটি রাখিলেন না।

ডাকপিয়ন যখন বিলাতের চিঠি লইয়া আসিত, তখন দুই দণ্ড ঠাকুরমহাশয়ের বাটীতে বসিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া যাইত। হাটের দিবস চিঠি আসিলে ডাকপিয়ন আমার মাতুল মহাশয়ের হাতে চিঠিখানি দিয়া দিত। মাতুল মহাশয় হাট হইতে বিভিন্ন প্রকারে প্রচুর দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিতেন। বিশেষতঃ, আমি বাড়ীতে রহিয়াছি বলিয়া হাটের কোন ভাল জিনিষ কিনিতে বাকী রাখিতেন না। হাটের নৌকা ঘাটে লাগিলে মাতুল মহাশয়ের সযত্নে ক্রীত জিনিষগুলি বাড়ীতে তোলা হইতে থাকে। কিন্তু জিনিষগুলির প্রতি আমার দৃষ্টি থাকিত না। যতক্ষণ না তিনি পকেট হইতে চিঠিখানি বাহির করিতেন, ততক্ষণ আমি উৎকণ্ঠিত থাকিতাম। পত্রখানি পাওয়ার পর তাঁহার ক্রীত দ্রব্যাদি দর্শনে আনন্দ প্রকাশ করিতাম। তিনি তাহাতে অত্যন্ত সুখী হইতেন। কোনও 'মেলে' চিঠি না আসিলে আমার মতন বাড়ীর সকলেই চিন্তিত হইতেন। স্নেহশীলা সোনাদিদি "নিরাকুলীর" ব্রত করিতেন। অর্থাৎ অকূল পাথারে যিনি কূলে আনিতে

পারেন, তিনি সেই ভগবানকে ডাকিতেন। পাঁচটি এয়োকে ডাকিয়া তাহাদের পান ও সিন্দূর দিতেন। ... তাঁহার বিশ্বাস যাহা তাহাই তিনি করিতেন। সেই সর্ব্বশক্তিমান ভগবান ছাড়া অকূলে কে কূল দিতে পারে? তাঁহার স্নেহের টান অতুলনীয় ছিল।

একদিবস দেখি পোষ্টমাষ্টারবাবু নৌকা করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। একজন পল্লীগ্রামের পুরোহিত ব্রাহ্মণের বাটীতে বিলাত হইতে চিঠি আসা কি কম আশ্চর্য্যের কথা! আমার মাতুল মহাশয় অতি অমায়িক ও পরোপকারী লোক ছিলেন। তাঁহাকে সকলেই চিনিত ও শ্রদ্ধা করিত। অনেক সময় ঠাকুরমহাশয়ের বাড়ী প্রসাদ পাইবার আশায় বহু অতিথি সমাগম হইত। মাতুল মহাশয় আহার করিতে বসিয়া প্রায়ই অন্ন মুখে তুলিতে বিলম্ব করিতেন। — "ঐ যে একখানি নৌকার শব্দ শুনিতেছি, ঐখানি কোন ঘাটে আসিয়া লাগে দেখা যাক্। যদি ঠাকুরবাড়ীর ঘাটে হয়?" মাতুল মহাশয়ের বাড়ী 'ঠাকুরবাড়ী' বলিয়া পরিচিত ছিল। যদি নৌকাখানি তাঁহার বাড়ীর ঘাট ছাড়াইয়া চলিয়া যাইত, তিনি অন্ন মুখে দিতেন। অন্যথা যদ্যপি তাঁহার ঘাটে নৌকা লাগিত, তিনি আহার না করিয়াই উঠিয়া পড়িতেন; এবং অতিথি যে ব্যক্তিই হউক না কেন, তাঁহাকে আহার করাইয়া নিজে আহার করিতেন। গোয়ালা ক্ষীর বিক্রয় করিতে আসিয়াছে, সে ঠাকুরমহাশয়ের বাড়ীর প্রসাদ না লইয়া যাইবে না। তাহাকেও অতি সমাদরে তাহার নিকট হইতে ক্রীত দুগ্ধ ক্ষীরাদি দিয়া পরম পরিতোষ সহকারে আহার করাইতেন।

পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের কথা লিখিতে গিয়া অন্য কথা আসিয়া পড়িল। বিলাতের চিঠি কাহার নিকট হইতে আসে? তিনি ঠাকুরমহাশয়ের কে হন? ঠাকুরমহাশয়ের কোন আত্মীয়ের বিলাত গমন অসম্ভব। এই সকল রহস্য উদ্‌ঘাটন মানসেই তিনি ঠাকুরমহাশয়ের বাটীতে আসিয়া অতিথি হইলেন। সমস্ত বিবরণ অচিরাৎ অবগত হইয়া তাঁহার ঔৎসুক্য নিবারিত হইল। তিনি একবেলা 'ঠাকুরবাড়ী' থাকিয়া গল্পস্বল্প করিলেন। পরে আহারাদি করিয়া চলিয়া গেলেন। সেই অবধি অতি যত্নের সহিত বিলাতের চিঠিগুলি আমার নিকট পাঠাইয়া দিতেন।

শিশুপুত্রের অকালমৃত্যু

মাতুলালয়ের সুখের দিন কাটিয়া গেল। অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার আসিয়া উপস্থিত হইল। শিশুপুত্রকে কোথা হইতে এক কালরোগ আসিয়া আক্রমণ করিল। মাতুল মহাশয় অবিলম্বে ডাক্তার ডাকিলেন। প্রাণপণ চিকিৎসা ও শুশ্রূষা সত্ত্বেও উপশমের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। হঠাৎ বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ রামদুর্লভ কবিরাজ আপ্‌না হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রাণে যেন একটু আশার সঞ্চার হইল। মনে হইল, বাছার প্রাণরক্ষা করিতে ভগবানই ইঁহাকে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু হায়! কবিরাজ মহাশয়ের শত চেষ্টায়ও আমার নয়নের মণিকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিলাম না। অমানিশার অন্ধকার আসিয়া আমার সুখ-সূর্য্যকে অকস্মাৎ গ্রাস করিল। পৃথিবীর সকল আনন্দের প্রদীপ যেন এক নিমেষে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

স্বামীকে আমি কি বলিব; তিনি যে পুত্রমুখ দেখিয়া যান নাই। কত আশা করিয়াই দিন কাটাইতেছিলাম, সেই দিবস কবে আসিবে, স্বামীর ক্রোড়ে পুত্র দিয়া মনের সাধ মিটাইব। আমার দুঃখে সকলে কাঁদিল। বনের পশুপক্ষীরাও যেন শোকাভিভূত হইল। যে দুঃখে পাষাণ বিদীর্ণ হয়, কই মানুষের বুক ত ফাটে না! হা ভগবান! কি করিলে? তোমার স্বর্গের কুসুম

কেন

পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলে! আবার কি তোমার স্বর্গোদ্যান সাজাইতে এই কুসুমকলিকাটির প্রয়োজন হইয়াছিল? সেইজন্য কি তাহাকে ডাকিয়া লইলে? ... আমি অযোগ্য, — আমাকে কেন এ রত্ন দিয়াছিলে? মলিন পৃথিবীতে সে থাকিবেই বা কেন। লইয়াছ যদি তাহাকে কোলে করিয়া রাখিও, সে যে স্বর্গের ফুল।

এখন স্বামীকে কিরূপে এই সংবাদ জানান যায়। প্রতিবাসী দাদামহাশয় হরিমোহন দত্ত এই নিদারুণ খবর স্বামীকে লিখিলেন। তাঁহার অন্তরে দুঃখের বন্যা বহিল। কিন্তু পুত্রশোকে এবং আমার যাতনায় অন্তর্দাহ উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও প্রকাশ করিয়া আমাকে কিছুই লিখিলেন না, কি জানি যদি আমি আরও আঘাত পাই।

ডাক্তার, কবিরাজ সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "আমি এইরূপ আর একটি শোক পাইয়াছিলাম। গাওদিয়া গ্রামে রজনীনাথ রায় মহাশয়ের এইরূপ একটি শিশুপুত্রের চিকিৎসা করিতে গিয়াছিলাম। তাহাকেও বাঁচাইতে পারি নাই। অদ্য যেরূপ শোকাভিভূত হইয়াছি, সেই দিবসও অনুরূপ কাঁদিয়াছিলাম। দুটিই দেবশিশু; তাহারা পৃথিবীতে থাকিবে কেন?"

চতুর্দ্দিক হইতে সহানুভূতি ও সান্ত্বনার লিপি আসিতে লাগিল। ঢাকা হইতে একজন ভগিনী আমাকে লিখিলেন, "দিদি, একবারও যেন মনে না করেন যে আপনার শিশুটি সহরে থাকিলে হয়ত বিজ্ঞ চিকিৎসকের হাতে পড়িয়া বাঁচিত। এই সেদিন ঢাকার সিভিল সার্জ্জন (Civil Surgeon)-এর একটি শিশুপুত্র এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। শিশুর পিতা সহরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার হইয়াও পুত্রের প্রাণ রক্ষা করিতে পারেন নাই। অতএব, দিদি, চিকিৎসাতে ত্রুটি হইয়াছে ভাবিয়া আপনি মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন না।" ভগ্নীপতি কৈলাসচন্দ্র নন্দী মহাশয় আমাকে সান্ত্বনা দিতে মাতুলালয়ে আসিলেন। কিন্তু হায়, যে যায় সে ত' আর আসে না!

ময়মনসিং যাত্রা

পূর্ব্বেই পুত্রকন্যা লইয়া দাদার কাছে ময়মনসিংহ যাইবার বাসনা ছিল। কিন্তু তখনও ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলওয়ে হয় নাই। নৌকায় চার পাঁচ দিবসে যাইতে হইত। নদীগুলি দুরতিক্রমণীয়, পথে ডাকাতের ভয়; তদুপরি সঙ্গে যাইবার উপযুক্ত লোক নাই। এই সকল কারণেই তাঁহার নিকট যাওয়া হইয়া উঠে নাই। এক্ষণে আমাদের শোকভারাক্রান্ত প্রাণ দাদার নিকট যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িল। দাদাও আমাদ্গিকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। ভগ্নীপতিকেই দাদার নিকট আমাদ্গিকে পৌঁছাইয়া দিতে বলিলাম। তিনি বলিলেন, "তবে চলুন আমাদের বাড়ী (কালীকচ্ছ গ্রামে), পরে মযমনসিংহে লইয়া যাইব।" তাঁহার অনুরোধে কালীকচ্ছ গেলাম, এবং দাদাকে চিঠি লিখিয়াছিলাম যে আমরা শীঘ্রই ময়মনসিংহে যাইতেছি। চিঠির উত্তরে দাদা লিখিলেন, ময়মনসিংহে বড় কলেরা হইতেছে। তোমরা কিছু দিবস বিলম্ব করিয়া আসিও। বাধ্য হইয়া ভগ্নীপতির বাড়ী আমরা কিছুদিন রহিয়া গেলাম। প্রাণ কিন্তু দাদাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল। বুঝি দাদার কাছে যাইয়া কাঁদিলে শোকের ভার লাঘব করিয়া প্রাণ জুড়াইতে সমর্থ হইব।

বেশীদিন অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। আমাদের সহিত কনিষ্ঠা ভগিনী বগলা তাহার পুত্র নির্ম্মলচন্দ্র ও কন্যা সুরুচিবালাকে লইয়া দাদার কাছে চলিল। দাদাকে পূর্ব্বেই চিঠি লিখিয়া

দেওয়া হইল। ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র নদীতীরে নৌকা লাগিল, কিন্তু দাদাকে দেখিতে পাইলাম না। ভাবিয়াছিলাম তিনি নিশ্চয়ই আমাদের ময়মনসিংহ পৌঁছিবার সম্ভাবিত সময়ের পূর্ব্ব হইতেই নদীতীরে নৌকার অপেক্ষায় থাকিবেন। দাদাকে না দেখিয়া প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। তবে কি দাদার অসুখ হইয়াছে? এমন সময় জনৈক পরিচিত ব্রাহ্ম ভদ্রলোক আসিয়া আমাদের সংবাদ দিলেন যে গোবিন্দবন্ধুর জ্বর হইয়াছে। "আপনারা চলুন, আমি গাড়ী ডাকিতেছি;" এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। গাড়ীর জন্য বিলম্ব না করিয়া মাতৃদেবী ও আমি তাঁহার সহিত পদব্রজেই দাদার শয্যাপার্শ্বে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। ভগ্নীপতি অন্য সকলকে লইয়া পশ্চাতে গাড়ী করিয়া আসিয়া পৌঁছিলেন। দাদা নিজের রোগ-যন্ত্রণায় অস্থির, তাহার মধ্যেই কাঁদিয়া বলিলেন, "আমার কোন পাপে আমার ভাগিনেয় মারা গেল?" তখন দাদার সহিত কাঁদিবার সময় নহে। তাঁহাকে শান্ত করিতে ব্যস্ত হইলাম। হায়! কোথায় দাদার নিকট আসিয়া হৃদয় জুড়াইব! লীলাময়, তোমার লীলা বোঝা শক্ত।

আমরা আহার করিতে বসিলে দাদা তাঁহার সাগুর বাটী হাতে করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি আপত্তি করিলাম। তিনি শুনিলেন না, বলিলেন, "আজ আমার কি আনন্দের দিন! তোমাদের সকলের সহিত একত্র বসিয়া খাইব। মা'র জন্য পাথর কিনিয়া রাখিয়াছি। মা নাতী নাতনীদের সঙ্গে লইয়া ভাত খাইবেন।"

দাদাকে আফিসের লোক, সহরের লোক সকলেই ভালবাসিতেন। এমন কি দাদা অনেক ইংরাজেরও প্রিয় ছিলেন। জমিদার কেশবচন্দ্র আচার্য্য[৩৭] মহাশয় দাদাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। তিনি প্রতিদিবস রাত্রে ইংরাজী খানা খাইতেন; দাদার জন্যও প্রতিদিন খানসামার দ্বারা আহার্য্য পাঠাইয়া দিতেন। তিনি দাদাকে ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন। দাদা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "ভগ্নিপতি ফিরিয়া আসুন; তাঁহার স্কন্ধে সকলের ভার দিয়া বিলাত যাইব।" আমি চিঠি পাইতে বিলম্ব হইলে যখন ভাবিয়া অস্থির হইতাম, দাদা আমাকে অনুযোগ করিতেন, "কেন ভাব? বিলেত ত এখন মামারবাড়ী হইয়াছে।"

যাহা হউক, দাদার অসুখে সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। জমিদার কেশববাবুর লোকজন সর্ব্বদাই যখন যাহা প্রয়োজন দাদার জন্য লইয়া আসিত। সিভিল সার্জ্জন মহাশয় প্রতিদিবস আসিয়া দাদাকে দেখিয়া যাইতেন। কোন কোনদিন দুইবারও আসিতেন। তাঁহার মেমসাহেব গাড়ীতে বসিয়া থাকিতেন। তিনি দাদার জন্য বাড়ী হইতে 'সুপ' করিয়া আনিতেন। দাদা এতই সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন যে সকলেই তাঁহার অসুখে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন। দাদার সহিত এক বাড়ীতে বিহারীকান্ত চন্দ বলিয়া একজন ভদ্রলোক বাস করিতেন। সেই সময় তাঁহার আট নয় বৎসর বয়স্ক একটি পুত্র কলেরায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাঁহার জননী পাছে দাদার কাণে এই দুঃসংবাদ গেলে তাঁহার অনিষ্ট হয় তজ্জন্য বারেক মাত্র চিৎকার করিয়াছিলেন। দাদার জন্য তিনি পুত্রশোক পর্য্যন্ত বুকে চাপিয়া রাখিলেন, ইহা কি দাদার প্রতি কম ভালবাসার নিদর্শন? দাদা ঐ শিশুটিকে বড়ই ভালবাসিতেন। সে যে চলিয়া গিয়াছে, জননী তাহা ঢাকিতে চেষ্টা করিলেও তাঁহার বুঝিতে দেরী হইল না।

দাদার পরলোক গমন

দাদার জন্য সকলের এই অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হইল। আঠার দিবস রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি সজ্ঞানে স্বর্গারোহণ করিলেন। দাদার মাত্র ঊনত্রিশ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ঐ বয়সে তাঁহার মতন ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস আমি অন্য কাহারও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দাদা হাত দুখানি বক্ষোপরি যুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। জিহ্বা তাঁহার অসাড় হইয়া আসিয়াছে, তখনও প্রার্থনা করিতেছেন, "দয়াময়! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। তোমার ইচ্ছা হয় ত আমায় রাখ, না হলে নিয়ে যাও।" তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমরা সকলেই ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলাম। এমন কি মাতৃদেবীও একেবারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিলেন। ... তাঁহার মহাযাত্রার সময় ক্রন্দন করিয়া কেমন করিয়া তাঁহার যাত্রাপথের বিঘ্ন হইব? দাদা আমারই হস্তে স্ত্রী ও কন্যা দুইটির ভারার্পণ করিয়া ভগবানের দেশে চলিয়া গেলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রী নলিনীবালার বয়স তখন পাঁচ বৎসর এবং মৃণালবালার বয়স তখন এক বৎসর মাত্র।

হায়! সেই সময়কার কথা আমার লেখনী বর্ণনা করিতে সক্ষম নহে। জননীদেবী একমাত্র পুত্র হারাইলেন, তাঁহার কথা কি লিখিব! কন্যা দুইটি লইয়া বৌদিদির অবস্থা অবর্ণনীয়। আর আমি, পুত্রশোকে দগ্ধপ্রাণ লইয়া দাদার কাছে কথঞ্চিৎ শান্তির আশায় ছুটিয়া আসিয়াছিলাম...হায় ভগবান! আমায় তুমি পুনরায় এ কোন দুঃখের সাগরে অবগাহন করাইলে? এমন ভ্রাতা যে পৃথিবীতে সুদুর্লভ। সহরের সকলেই দাদার জন্য শোক করিলেন। অফিসের অন্যান্য বাবুরা পর্য্যন্ত তাঁহার কার্য্য-নিপুণতা ও তাঁহার মিষ্ট স্বভাবের কথা স্মরণ করিয়া শোকাশ্রু বর্ষণ করিলেন।

আনন্দালোকহীন গৃহে দিন কয়েক থাকিয়া দাদার পবিত্র শ্রাদ্ধ সমাধা করতঃ সকলে মিলিয়া ঢাকায় চলিয়া আসিলাম। ভগ্নীপতি কৈলাসচন্দ্র নন্দী কিছুদিন ঢাকায় থাকিয়া তাঁহার নিজগ্রামে কালীকচ্ছ চলিয়া গেলেন। মাতৃদেবী, বধূমাতাকে, তাঁহার কন্যা দুইটিকে, আমাকে ও আমার কন্যা সরযূবালাকে লইয়া ভ্রাতা নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সহিত একসঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দুঃখের দিনগুলি যেন একটু দীর্ঘ বলিয়াই মনে হয়, তথাপি দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে সাত আট মাস অতীত হইয়া গেল। আমাদের বাড়ীটি পোষ্টঅফিসের সংলগ্ন ছিল। বিলাতের ডাক বিলি হইবার সময় একটি ঘন্টা পড়িত। ঐ ঘন্টা শুনিলেই চিঠির জন্য গেটের নিকট যাইতাম। ঘন্টা পড়িবার অনুমান পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ডাকপিয়ন চিঠি দিয়া যাইত। সকল দিক হারাইয়া এখন বিলাতের একখানি পত্রই আমাদের শোকদগ্ধ পরিবারের সান্ত্বনা।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে একদিবস Dr. P. K. Royএর[৩৮] জনৈক ভৃত্য একখানি টেলিগ্রাম হস্তে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "এই নিন আপনার নামে বিলাতের টেলিগ্রাম, আমার সাহেব পাঠাইয়াছেন।" আমার নামে বিলাতের টেলিগ্রাম? না জানি আবার কি সংবাদ আসিল। এই সময়ে বিলাত হইতে টেলিগ্রাম আসিবেই বা কেন? অজানিত দুঃসংবাদের কল্পনায় আমি কাঁপিতে লাগিলাম। আমার পার্শ্বে অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত নামক একজন যুবক দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি আমাকে দিদি সম্বোধন করিতেন। আমার অবস্থা দেখিয়া টেলিগ্রামখানি লইয়া পড়িয়া বলিলেন, "দিদি, স্থির হো'ন, এতে খুব সুসংবাদ এসেছে। আপনার স্বামী শেষ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।" ... ইহাতে আমি যেন প্রাণ ফিরিয়া পাইলাম। ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়া টেলিগ্রামখানা হাতে লইয়া পড়িলাম। ডাক্তার পি. কে. রায় মহাশয় টেলিগ্রামখানি খুলিয়া পড়িয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া আমাকে দুই লাইন পত্র লিখিয়াছিলেন। তৎ-পরদিবস তিনি নিজেই আসিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া গেলেন। তিনি অতিশয় সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন।

এখন কথা হইতেছে, টেলিগ্রামখানি আমার নামে আসিয়াছিল, ডাক্তার পি. কে. রায়ের বাড়ী কেন গেল? সেই সময় ডাক্তার পি. কে. রায়ই ঢাকাতে বিলাত-ফেরৎ খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। বিলাতের টেলিগ্রাম আর কাহার বাড়ীর হইতে পারে? তজ্জন্য টেলিগ্রাফ-পিয়ন তাঁহার হাতেই টেলিগ্রামখানি পৌঁছাইয়া দেয়।

স্বামীর স্বদেশ প্রত্যাগমন

আমার স্বামী আগষ্ট মাসে দেশে ফিরিলেন। তাঁহার কলিকাতা পৌঁছিবার সম্ভাবিত দিবসে প্রাতঃকালে আমি কন্যা সরযূবালাকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায় মহাশয়ের বাড়ীতে উঠিলাম। বলা বাহুল্য, তাঁহারা আমাকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। স্বামী লণ্ডন হইতে বরাবরই ষ্টীমারে (Steamerএ) কলিকাতা আসিয়াছিলেন। কোন্ সময় ষ্টীমারখানি গঙ্গায় আসিয়া পৌঁছিবে পুনঃপুনঃ লোক পাঠাইয়া সংবাদ লইতে লাগিলেন।

কন্যা সরযূবালার তখন পাঁচ বৎসর বয়স হইয়াছে। 'বাবা' আসিতেছেন শ্রবণে যতবারই গাড়ীর শব্দ হইতেছিল, ততবারই দৌড়াইয়া গাড়ীবারাণ্ডায় যাইতেছিল। ফিরিয়া আসিয়া

বাবা ত আসিলেন না বলিয়া নিরাশ মনে স্থির হইয়া বসিতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু বাবা যখন আসিলেন, সে তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। জাগ্রত হইলে পিতার ক্রোড়ে কিছুতেই যাইতে চাহিল না। বলিল, 'এ বাবা নয়, এ সাহেব'; বলিয়াই পলাইতে লাগিল। তখন তিনি দুইটি 'লাল টুক্‌টুকে' গিনি বাহির করিয়া আদরের কন্যাকে দেখাইলেন। এইবার পিতার ক্রোড়ে যাইতে আর আপত্তি রহিল না। সরযূ যখন আড়াই বৎসরের, তখন তিনি বিলাত চলিয়া যান। কাজেই দীর্ঘ আড়াই বৎসর পরে পিতাকে চিনিতে পারা ক্ষুদ্র বালিকার পক্ষে সহজসাধ্য হয় নাই।

শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায় ও বিধুদিদি

শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায় ও বিধুদিদিকে সেই দিবস যেরূপ আনন্দ ও উৎসাহে পরিপূর্ণ দেখিয়াছি তদনুরূপ আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বিলাত প্রত্যাগত বন্ধুর কিরূপে তাঁহারা আদর অভ্যর্থনা করিবেন স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। আহারের বিপুল আয়োজন আনন্দের পরিমাপ পর্য্যন্ত ছাড়াইয়া গেল।

তৎ-পরদিবস বিক্রমপুর ছাত্র-সম্মিলনের মস্ত পার্টি ছিল। শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায় মহাশয় সকলের সহিত বন্ধুর পরিচয় করাইয়া দিলেন। আমরা অন্তঃপুর হইতে মিষ্টান্ন সাজাইয়া পাঠাইতে লাগিলাম।

কিছুদিন আমরা রজনীবাবুর বাড়ীতেই রহিলাম। তখনও কৃষ্ণনগর কলেজের প্রায় দুইমাস ছুটি আছে। একদিন রজনীবাবু আসিয়া বলিলেন, "আমি আজ কয়েকজন লোককে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করে এসেছি। কাল মধ্যাহ্নে তাঁরা এখানে আহার কর্‌বেন এবং এটাও জানিয়ে এসেছি যে আমাদের বিক্রমপুরের মেয়ে রান্না কর্‌বেন। কাজেই তাঁরা খুব ভাল খাবেন।" একথা শ্রবণে আমি বলিলাম, "আপনি এ কি করেছেন? নিমন্ত্রণ করে কি বল্‌তে হয় আপনারা ভাল খাবেন!" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "ওগো, বিক্রমপুরের মেয়ে রান্না কর্‌লে কখনও খারাপ হবে না।" আমি বড়ই ভাবনায় পড়িলাম। যদি রান্না ভাল না হয় বড়ই লজ্জায় পড়িতে হইবে। ঢাকাতে আমাদের কাঠের জ্বালে রাঁধিয়া অভ্যাস। এখানে কয়লা ও উঁচু উনান। উঁচু উনানে কখনও রান্না করি নাই। যাহা হউক, পরদিবস যথা শীঘ্র চা পান সমাধা করিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলাম। বিধুদিদি রান্নার দ্রব্যসামগ্রী যোগাড় করিয়া দিতে লাগিলেন। ভগবানের নাম লইয়া আমি এক একটি করিয়া নামাইতে লাগিলাম। যথাসময়ে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আহারে বসিয়াছেন, এমন সময় শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাস মহাশয় আসিয়া বলিলেন, "এই সকল দেবতার ভোগ ফেলিয়া আমি কোথায় আহার করিতে যাইতেছি!" সেদিন তাঁহার অন্যত্র নিমন্ত্রণ ছিল। খুব সম্ভব তথায় 'ইংরাজী খানা' হইবে সেইজন্য ঐরূপ বলিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়

অপর একদিবস বিধুদিদি বলিলেন, "চল, তোমাকে নিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ী যাই। অনেকদিন তাঁহাকে দেখিতে যাই নাই। তোমার সহিতও পরিচয় করাইয়া দিব।" আমি আহ্লাদের সহিত তাঁহার সাথে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দর্শন করিতে গেলাম। তথায় বাটীর মহিলাদিগের সহিত বাক্যালাপ করিবার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ঘরে ছিলেন সেই ঘরে বিধুদিদি আমাকে

সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন ও তাঁহার সহিত আমাকে পরিচিত করিয়া দিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংবাদপত্রে পড়িয়াছি অম্বিকাচরণ সেন নামক একজন ভদ্রলোক 'সিসেস্টার' কলেজে কৃষি পরীক্ষাতে প্রথম হইয়াছেন। ইনিই কি তাঁহার স্ত্রী?" তখন আমি তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি প্রশ্ন করিলেন, "আমার পা ছুঁইয়া কেন প্রণাম করিলে বল ত ব্রাহ্মণ বলিয়া কি?" আমি তদুত্তরে বলিলাম, "না, আপনার ঘরে যে তালপাতার পুঁথিগুলি দেখিতেছি, আমার দাদামহাশয়েরও অনুরূপ পুঁথি ছিল। তাহা মনে হওয়াতে আপনার পদধূলি গ্রহণ করিলাম।" ... বিধুদিদির অনুগ্রহেই আমার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দর্শনলাভ হইয়াছিল। সাধু মহাত্মাদিগের দর্শন পাওয়াও সৌভাগ্য।

শ্রীযুক্ত রজনীবাবুর ও বিধুদিদির হৃদয়ে আমার স্বামীর এবং আমার প্রতি যে কিরূপ ভালবাসা ছিল তাহা অবর্ণনীয়। আপনার জনের উপর যেরূপ আব্দার করা যায় আমরা উভয় দম্পতি পরস্পরের নিকট সেইরূপ আব্দার করিতাম। শুদ্ধ যে তাঁহারাই আমাদের ভালবাসিতেন তাহা নহে, তাঁহাদের পরিবারস্থ অন্য সকলেও আমাদিগকে আপনার জন জ্ঞানে ভালবাসিতেন এবং এখনও বাসেন। আমি যখন বিধুদিদির বাড়ী আসি তখন তাঁহার বড় কন্যা সুকুমারীর বয়স নয় কি দশ বৎসর হইবে। সেজকন্যা বেলা অনুমান আমার পাঁচ বৎসর বয়স্কা কন্যা সরযূবালার সমবয়সী হইবে এবং তাঁহার একমাত্র প্রিয়দর্শন পুত্রের বয়স তিন কি সাড়ে তিন হইবে। সর্ব্বকনিষ্ঠা অমিয়ার (কিটির) বয়স দেড় বৎসর ছিল। পরে আরও দুইটি কন্যার জন্ম হয়। সকলেই আমাদের পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিল। মাসীমার নিকট তাহারা কতই আব্দার করিত, আমিও তাহাদের প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া আনন্দিত হইতাম। আজিও তাহারা আমাকে দেখিলে 'মাসিমা' বলিয়া জড়াইয়া ধরে। বিধুদিদির একমাত্র পুত্র অসময়ে চলিয়া যাওয়াতে, তাঁহার ত কথাই নাই, সকলেরই হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল।

অঘোরদাদা ও সরোজিনী নাইডু

একদিবস অঘোরদাদা আসিয়া স্বামীকে বলিলেন, "দেখ অম্বিক! (ইঁহারা পরস্পরের নাম ধরিয়া ডাকিতেন) তুমি ত এখন কলিকাতায়ই থাকিবে; আমার বাড়ীতে আসিয়া কিছুদিন থাক, আমি সিমলা যাইতেছি। আমার স্ত্রী ছেলেমেয়েদের লইয়া একা থাকিবেন। তুমি থাকিলে বড় ভাল হয়।" কাজেই আমাদের তাঁহার বাড়ীতে যাইতে হইল। বরদাবৌদিদি লোককে যত্ন আদর করিতে খুবই জানিতেন। আমাদের দিনগুলি অতি আনন্দে কাটিতে লাগিল। অঘোরদাদার বড় কন্যা সরোজিনীর বয়স তখন ছয় বৎসর হইবে। তাহার পরে ভূপেন ও বীরেন[৩১]। সকলের ছোট একটী মেয়ে, তাহাকে তাঁহারা 'গুরিয়া' বলিয়া ডাকিতেন; বোধহয় পরে তাহার নাম মৃণালিনী হয়। আমি ছোট ছেলেমেয়েদের অত্যন্ত ভালবাসি। ইহাদের পাইয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম। বরদাবৌদিদির সহিত ইহার পূর্ব্বে ঢাকায় নবকান্তমামার বাড়ী একসঙ্গে ছিলাম; তৎপরে ভারতাশ্রমেও একসাথে বাস করিয়াছে। কাজেই তাঁহার সহিত পূর্ব্বেই ঘনিষ্ঠতা ছিল। অঘোরদাদা আমার স্বামীকে বলিয়াছিলেন, "তুমি সরোজিনীকে একটু Botany শিখাইও।" তিনি শ্রীমতী সরোজিনীকে সঙ্গে লইয়া বাটীর প্রাঙ্গণের ফুলবাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে একটি ফুল তুলিয়া তাহার পাপড়িগুলি ছিঁড়িয়া Botany শিক্ষা দিতেন। আমিও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া ঐ নামগুলি শিখিয়া লইয়াছিলাম। অঘোরদাদার শিক্ষাপ্রণালী অতি

চমৎকার ছিল। তাঁহার ড্রয়িংরুমে কন্যাকে শিখাইবার জন্য কত যে পশুপক্ষীর চিত্র টাঙ্গান ছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। পিতার শিক্ষার গুণেই আজ সরোজিনী (নাইডু) এতবড় বিদুষী নারী, এ কথা তিনি তাঁহার পিতার শ্রাদ্ধবাসরে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, বরদাবৌদিদির সহিত বড়ই আনন্দে দিনগুলি কাটিতেছিল। চা প্রস্তুত হইলে তাঁহারা সরোজিনীকে বলিতেন, "যাও auntieকে গিয়ে ডেকে আন।" সরোজিনী আসিয়া বলিত, "Auntie, tea is ready." তাহার বাল্যকালের মিষ্ট কথাগুলি এখনও আমার কাণে বাজিতেছে।

অঘোরদাদা সিমলা হইতে ফিরিবার পরও আমরা কিছুদিবস তাঁহাদের বাড়ী ছিলাম। তিনি আমার কন্যা সরযূকে, 'তাই তাই তাই, মামাবাড়ী যাই' ইত্যাদি বলিয়া আদর করিতেন। ক্রমে কৃষ্ণনগর কলেজের ছুটী ফুরাইল। আমরা তথায় রওয়ানা হইলাম। সেখানে হরিচরণ নামে আমার স্বামীর একজন ছাত্র (জাতিতে কুম্ভকার) আমাদের জন্য একটি বাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের যখন যে জিনিষ দরকার হইত সকলই তিনি ক্রয় করিয়া আনিয়া দিতেন। ... কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্ররা আমার স্বামীকে কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন তাহা বলা যায় না। দুঃখের বিষয়, আমরা অল্পদিনই তথায় ছিলাম।

আরা যাত্রা

একদিবস ডাকযোগে একখানি বড় লেফাফায় চিঠি আসিল যে তাঁহাকে গভর্ণমেন্ট ষ্টেচুটারি সিভিলিয়ান (Statutory Civilian) পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

তাঁহাকে 'আরা' ও 'বক্সারে' কিছুদিন কার্য্য করিতে হইল। আরায় শ্রীযুক্ত বিহারীলাল ঘোষ মহাশয় স্টেশনে আসিয়া আমাদিগকে সংবর্দ্ধনা করিলেন। আমি পূর্ব্বে তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলাম না। আমার স্বামীর সহিতও তাঁহার পরিচয় ছিল কিনা আমি ঠিক বলিতে পারিতেছি না।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল ঘোষ

আমাদের জন্য একটি প্রকাণ্ড 'বাংলো' ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছিল। সেদিনকার আহার্য্য একজন ভদ্রলোক তাঁহার বাড়ী হইতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তৎ-পরদিবস ভৃত্যাদি স্থির হইলে বাড়ীতেই রন্ধনাদি হইল। এইরূপ কিছুদিন সেই 'বাংলো'তে বাস করিবার পর স্বামীর প্রতি গভর্ণমেন্ট হইতে আদেশ আসিল : 'বক্সার যাইতে হইবে'। তখন বক্সারে থাকিবার বন্দোবস্ত কিছুই হয় নাই। আমাদের লইয়া যাওয়া মোটেই সম্ভবপর নহে। আমার স্বামী ভাবিয়া দেখিলেন শ্রীযুক্ত বিহারীলাল ঘোষ মহাশয় যখন ব্রাহ্ম, তাঁহার বাড়ীতে স্ত্রী ও কন্যাকে রাখিয়া গেলে মন্দ হয় না। শ্রীযুক্ত বিহারীবাবু এই প্রস্তাবে অতিশয় আনন্দের সহিত তাঁহার বাড়ীতে আমাদের থাকিবার স্থান করিয়া দিলেন। তখন একজন ব্রাহ্ম অপর ব্রাহ্মকে আপন ভাইয়ের মতন জ্ঞান করিতেন। ভাইয়ের বাড়ী ভাইয়ের স্ত্রী থাকিবেন ইহাতে আর কথা কি? শ্রীযুক্ত বিহারীবাবুর বাড়ী যাইয়া দেখি তাঁহার স্ত্রী আমার মহালক্ষ্মীদিদি (রাজলক্ষ্মীদিদির ভগিনী); তাঁহার তিনটি কন্যা ও একটি পুত্র-সন্তান। ছেলেটি আমার কন্যার প্রায় সমবয়সী। শিশুরা সঙ্গীলাভ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। সেই ছেলেটিই বর্ত্তমানে আমার কন্যার ননদের স্বামী ডাক্তার চৈতন্য

ঘোষ। তখন ইহারা আমাকে মাসিমা বলিয়া ডাকিত। নূতন সম্পর্ক অপেক্ষা তখনকার সম্পর্কই অধিক মূল্যবান।

বক্‌সার গমন

একদিন আমার বক্‌সারে যাইবার সাধ হইল। স্বামী খন বক্‌সারে যাইয়া তাঁবুতে থাকিতেন। আমরাও কয়েক দিবস তাঁবুতে বাস করিলাম। ইহার পূর্ব্বে তাঁবুতে কখনও থাকি নাই। নূতন বলিয়া বড় ভাল লাগিল। পরে একটি বাড়ী ভাড়া লওয়া হইল। এখানে অপর কোন ব্রাহ্মদের বাস ছিল না। কাজেই স্বামী কার্য্যোপলক্ষে দূরে চলিয়া গেলে, কন্যাকে লইয়া আমায় একাকীই 'বাংলো'তে থাকিতে হইত। কিন্তু আমাদের তখন একটি চমৎকার ভৃত্য ছিল। সেইরূপ ভৃত্য আর দেখি নাই। কন্যা সরযূবালা তখন মাত্র ছয় বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। আমি তাহাকে লইয়া ভয়ে ভয়ে রাত্রি যাপন করিতাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেই ভৃত্যটি সমস্ত রাত্রি একটি লণ্ঠন ও একটি লাঠি হস্তে bungalowর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। মধ্যে মধ্যে হাঁকডাকও দিত। অতি প্রত্যূষে সে গঙ্গা হইতে জল বহন করিয়া আনিয়া বাগানের গাছে দিত। বাগানে সে বহু শাকসব্জী উৎপন্ন করিয়াছিল। প্রতিদিবস তদ্দ্বারা একটি ডালা সাজাইয়া আমাকে আনিয়া দিত। সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় থাকিয়া সে কিরূপে প্রত্যূষে জল বহন করিয়া আনিয়া বাগানে কাজ করিত, তাহা ভাবিয়া পাই না। যথার্থই ঐরূপ প্রভুভক্ত ভৃত্য বিরল।

কিছুদিন পরে আমার মাতৃদেবী, পুত্রবধূ ও তাহার কন্যা দুইটিকে লইয়া আমার কাছে আসিলেন। মাতুল রাজকুমার মুখুটী মহাশয়ই তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন। বক্‌সার হইতে অল্প কয়েক দিবস পরে আমরা আরায় চলিয়া গেলাম। এই সময়ে আমার মাতুল কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার মাতা (আমার সোনাদিদি) আমাদের দেখিতে আসিলেন।... একদিন তিনি নিরাকুলীর ব্রত করিয়াছিলেন, ভগবান তাঁহার নাত-জামাইকে কূলে আনিয়াছেন। সেই তাঁহার সাধের নাতনীর সংসার দেখিতে তিনি আসিলেন।

আরাতে আমাদের দিনগুলি সুখেই কাটিতে লাগিল। দাদার দুইটি কন্যা, আমার কন্যা সরযূ, মাতৃদেবী ও তাঁহার বধূমাতা, সোনাদিদি, কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় — আমরা এতগুলি লোক 'বাংলোটি' মাতাইয়া রাখিতাম।

একদিন পুলিস দুইটি গোরু লইয়া আমাদের বাংলোতে আসিয়া উপস্থিত হইল। গোরু দুইটি চোর চুরী করিয়া লইয়া যাইতেছিল, পুলিস তাহাদের ধরিয়া Assistant Magistrateএর নিকট লইয়া আসিয়াছে। আমার ছোট ভ্রাতুষ্পুত্রীটি একটি বকুনা লইয়া তাহাদের নিকট 'দুধ দাও' বলিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার বয়স তখন আড়াই কিম্বা তিন বৎসর হইবে। কিন্তু পুলিসেরা ত দুগ্ধবতী গাভী লইয়া আইসে নাই, দুধ দিবে কোথা হইতে? তাহারা তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করিতে লাগিল। এখানে বলা আবশ্যক, প্রতিদিবসই গোয়ালা বাড়ীতে গোরু আনিয়া আমাদের আবশ্যকীয় দুগ্ধ দুহিয়া দিত। বালিকা গোরু দেখিয়াই মনে করিয়াছে ইহারা দুধ দুহিয়া দিতে আসিয়াছে।

দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম ও মৃত্যু

কিছুদিন তথায় থাকিয়া সোনাদিদি ও মাতুল মহাশয় চলিয়া গেলেন। মাতৃদেবী, বধূমাতা ও নাতনী দুইটি সহ 'আরাতেই' রহিলেন। কিন্তু বহুকাল সুখ ভোগ করা বোধহয় ভাগ্যদেবীর অভিপ্রায় নহে। ভাগ্যাকাশে বিষাদের মেঘ ঘনাইয়া আসিল। একদিন হঠাৎ আমার কম্প দিয়া জ্বর আসিল। তাহার ফলে সময়ের কিছু পূর্ব্বেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। মাতৃদেবী একবার বলিলেন, "ঠিক সেই চেহারা", শুদ্ধ ঐটুকু মাত্র আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। আমি অচেতন হইয়া পড়িলাম। স্বামী ক্রমাগত কাছারি হইতে চাপরাশী পাঠাইতেছিলেন সংবাদ জানিবার জন্য। তাহারা ম্লান মুখে কি বলিয়াছিল জানি না।

মনে বড় আশা করিয়াছিলাম, এইবার স্বামীর ক্রোড়ে পুত্র দিতে পারি কিনা দেখি। যে আশার ক্ষীণ রেখাটুকু জ্বলিতেছিল তাহাও নির্ব্বাপিত হইল। সংসারের সুখ-সূর্য্য চিরদিনের মতন যেন অস্তমিত হইল। স্বামী গৃহে আসিয়া জলস্পর্শ না করিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। যাঁহারা পুত্রশোক পাইয়াছেন, যাঁহারা ভুক্তভোগী তাঁহারাই বুঝিবেন, এ শোকের আগুন কখনও নির্ব্বাপি হয় না। কর্ত্তব্যের অনুরোধে সংসারের সকল কাজই করিতে হয় — আহার করিতে হয়, হাসিতেও হয়। কিন্তু নিভৃত অন্তরের এ জ্বালা কখনও প্রশমিত হয় না। দয়াময়, আমাদের উপর তোমার এ কঠোর শাসন কেন? তোমার কি ইচ্ছা বুঝাইয়া দাও। তোমার স্বর্গের উদ্যানের কুসুমকোরক দুইটি কি তুমি ভুল করিয়া এ ·র-জগতে পাঠাইয়াছিলে? অথবা আমরা তাহাদের পালন করিবার উপযুক্ত নই বলিয়া কি তুমি লইয়া গেলে? তবে প্রভু, বলিয়া দাও তাহারা পরম পিতার ক্রোড়ে সুখে আছে। হয়ত এই পৃথিবীতে থাকিলে পৃথিবীর কর্দ্দমে তাহারা মলিন হইয়া যাইত। ... তোমার স্বর্গের কুসুম-দুইটি তোমার স্বর্গের কাননেই ফুটিয়া থাকুক। আমরা যেন সেখানে যাইয়া তাহাদের দেখিয়া আমাদের দগ্ধ প্রাণ শীতল করিতে পারি।

বর্দ্ধমান যাত্রা

কিছুদিন পরে স্বামী বর্দ্ধমান ও শিবপুর ফার্ম্মের তত্ত্বাবধায়ক মনোনীত হয়েন। আমরা বর্দ্ধমান চলিয়া আসিলাম। কন্যা সরযূবালাকে তখন স্কুলে দেওয়া আবশ্যক। বর্দ্ধমানের মিশনারী স্কুলে তাহাকে ভর্ত্তি করাইয়া দিলাম। পিতার ইচ্ছা কন্যা বাল্যকাল হইতেই গান, বাজনা ইত্যাদি শিক্ষা করে। ইংরাজীতে পিয়ানো বাদন শিক্ষা দেওয়ার তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। আমি দেখিলাম ইংরাজী বাজনার 'নোট' (note)-গুলি ভয়ানক শক্ত। শিক্ষা করা কষ্টসাধ্য হইবে। শীঘ্র শিখিতে না পারিলে শিক্ষয়িত্রী হয়ত বা শাস্তি দিবেন। স্থির করিলাম, ঐগুলি নিজে শিখিয়া কন্যাকে শিখাইব। তৎপরে স্কুলে বাজনার ক্লাসে ভর্ত্তি করাইয়া দিব। তাহা হইলে তাহার কোন অসুবিধাই হইবে না। কার্য্যতঃ তাহাই হইল। মিস্ ম্যাল্‌ভানী নামক একজন মিশনারী মেমসাহেবকে আমায় বাজনা শিখাইবার জন্য নিযুক্ত করিলাম। তিনি আমাদের বাড়ী আসিয়া আমাকে প্রথমে ইংরাজী 'নোট'-গুলি শিখাইলেন। পরে হারমোনিয়ামে আমাকে ইংরাজী গৎ বাজাইতে শিখাইলেন, কারণ তখন হারমোনিয়াম ব্যতীত আমাদের পিয়ানো ছিল না।

শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু ও অবিনাশচন্দ্র মিত্র

আমার স্বামীর ও শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বিলাত বাসকালীন এক কলেজে পাঠ ও একসঙ্গে বাস করা হেতু অত্যন্ত বন্ধুতা হয়। বর্দ্ধমানে গিরীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের শ্বশুরালয়। তাঁহার শ্বশ্রূমাতাঠাকুরাণী জামাতার বন্ধুকে পুত্রের ন্যায় এবং আমাকে কন্যাসম স্নেহ করিতে লাগিলেন। বসু মহাশয়ের পত্নীর সহিত আমার ভগিনীসদৃশ ভালবাসা ও প্রীতি জন্মে। তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মিত্র আমার ভ্রাতার ন্যায় ও তৎপত্নী আমার ভ্রাতৃবধূর ন্যায় আপনার জন হইলেন। তাঁহাদের বাড়ী যাইলে আদরযত্নের সীমা পরিসীমা থাকিত না। কত জিনিষ সমাদর করিয়া খাওয়াইতেন; উপরন্তু গৃহপ্রত্যাগমনকালে, ঘরে দেওয়ার উপযুক্ত যাহা থাকিত, গাড়ীতে তুলিয়া দিতেন। সমস্তই ভালবাসার অকৃত্রিম নিদর্শন, স্মৃতি যতই অতীক্ষ্ণ হউক, সে সকল এ জীবনে ভুলিতে পারিব না।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, স্বামী বর্দ্ধমান ও শিবপুর ফার্‌মের তত্ত্বাবধায়ক মনোনীত হয়েন। বর্দ্ধমানই তাঁহার হেড-কোয়ার্টার হইল। দুইটি ফার্‌মে তাঁহাকে ছুটাছুটি করিতে হইত। একবার কলিকাতা, একবার বর্দ্ধমান, এই প্রকারেই কাজ করিতে লাগিলেন। যখন কলিকাতায় শিবপুর ফার্‌ম পরিদর্শন করিতে আসিতেন, অধিকাংশ সময়ই আমরা সঙ্গে আসিতাম। আমাদের উঠিবার স্থান ছিল শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায় মহাশয়ের বাড়ী। একবার শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায় আমাদের কলিকাতায় আগমনবার্ত্তা শ্রবণে তাঁহার পুত্রদ্বয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্রনাথকে বাড়ীর গাড়ীসহ স্টেশনে বলিয়া পাঠাইলেন, "তাঁদের এবার আমাদের বাড়ীতে উঠ্‌তে হবে তোমরা গিয়ে নিয়ে এসো।" অবশ্য সেইবার আমরা তাঁহাদের বাড়ীতেই উঠিলাম। পরে শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায় মহাশয়ের বাড়ীতে দেখাসাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তখন তিনি কিঞ্চিৎ অভিমানের সুরে অথচ স্নেহভরে বলিলেন, "বুঝেছি, এবার আর আমাদের বাড়ীতে উঠা হোল না!" বাস্তবিক সেইরূপ সুমধুর ভালবাসা আজকাল দুর্লভ।

কলিকাতা আগমন

যাহা বলিতেছিলাম, একবার বর্দ্ধমান একবার কলিকাতা এইরূপ করাতে আমাদের একটু অসুবিধা হইতে লাগিল। কন্যার স্কুলও মধ্যে মধ্যে কামাই হইতে লাগিল। আমি স্বামীর নিকট প্রস্তাব করিলাম, দুই স্থানেই যখন কাজ করিতে হয়, তখন কলিকাতাতেই বাড়ী নেওয়া হোক্। সরযূকে কলিকাতার কোন ভাল স্কুলে পাঠান যাইবে। তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। আমরা কলিকাতা চলিয়া আসিলাম। ... কিছুদিন পরে কলিকাতাই তাঁহার হেড-কোয়ার্টার হইল। তখন আমি বলিয়াছিলাম, "দেখ ত, জোর করে চলে এসেছিলাম, এখন কলিকাতাই হেড-কোয়ার্টার হয়ে গেল।" যাহা হউক, কন্যাকে বেথুন স্কুলে পাঠান গেল।

শ্রীযুক্তা রাধারাণী লাহিড়ী

এইস্থানে পুনরায় রাধারাণী লাহিড়ী মহাশয়ার কথা লিখিব। তিনি তখন বেথুনে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতেন। সরযূকে বেথুনে পাঠানোতে তিনি অত্যন্ত খুসী হইলেন। সর্ব্বদাই তিনি তাহার দেখাশুনা করিতেন। তিনি আদর করিয়া তখনও সরযূকে 'খুকী' বলিয়া ডাকিতেন। আমরা কিন্তু নাম ধরিয়া ডাকিতাম। পরীক্ষাতে সরযূ প্রথম হইল। তাহাতে তিনি এতই আনন্দিত

হইলেন, যেন সে তাঁহার আপন ভগিনীর কন্যা। একদিবস আমাকে হাসিয়া বলিলেন, "খুকী খুব ভাল করেছে; এবার পিয়ানো শিখ্‌তে দাও। এখন থেকে পিয়ানো শিখলে খুব ভালো হবে।" আমি সেইজন্য প্রস্তুতই ছিলাম। পিতারও ইচ্ছা তদনুরূপ। আমি সরযূকে [illegible] গুলি শিখাইয়া ও কিছু কিছু বাজাইতে শিখাইয়া স্কুলের Music Classএ ভর্ত্তি করাইয়া দিলাম। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, কারণ খুকী শীঘ্র শীঘ্র বাজনা শিখিতেছে।

মনোমতধন দে

আমি যখন ভারতাশ্রমে ছিলাম তখন মনোমতধন দের বয়স আন্দাজ ৬/৭ বৎসর। তাহার পিতা স্বর্গীয় সাধক কেদারনাথ দে। বাল্যকালে 'মনোমত' একটু 'হাবা' প্রকৃতির ছিল। অনেক সময়ই আমাকে দেখিলে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিত। কেন যে ঐরূপ করিত জানি না। আমি সময় সময় আদর করিয়া তাহার গাল একটু টিপিয়া দিতাম। ... তাহার পরে তাহার আর কোন খবর পাই নাই। কলিকাতায় আসিয়া শুনিলাম সেই মনোমতধন দে এখন খুব ভাল গায়ক। বাজনাও খুব ভাল বাজাইতে জানে। ইহা শুনিয়া আমি তাহাকে, আমাকে গান বাজনা শিখাইবার জন্য ও কন্যা সরযূকে পড়াগুলি শিখিতে একটু সাহায্য করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলাম। তাহার প্রথম দর্শনে আশ্চর্য্য হইলাম; সেই ছোট্ট ছেলেটি এত বড় হইয়াছে এবং এমন চমৎকার গাহিতে এবং বাজাইতে শিখিয়াছে। তাহার নিকট আমি গান ও বাংলা গৎ বাজাইতে শিখিতে আরম্ভ করিলাম। সরযূও তাহার নিকট একটু আধটু পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহার স্বভাবটি এতই মধুর ছিল যে, তাহাকে দেখিবামাত্র সকলেই ভালবাসিত। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সে আমাদের ঘরের ছেলে হইয়া দাঁড়াইল। আমাকে 'মা' বলিয়া ডাকিত এবং সরযূকে আপন ভগিনীর ন্যায় ভালবাসিত। সরযূ এবং বাড়ীর অন্যান্য বালক বালিকারা তাহাকে ধনদাদা বলিয়া ডাকিত। আমরা যে স্থানে যাইতাম, অনেক সময়ই সে আমাদের সঙ্গে যাইত। আমার স্বামী যখন কার্য্যোপলক্ষে ডাকা ডিষ্ট্রিক্টে যান তখন মনোমতধন আমাদের সহিত আমার মাতুলালয়ে ও শ্বশুরালয়ে যায়। সকল স্থানেই সে সকলের ভালবাসা আকর্ষণ করিয়াছিল।

আমার স্বামী যখন কটকে বদ্‌লী হইয়া যান, সেই সময় মনোমতধন কাঁদিয়াই অস্থির। আমরা চলিয়া যাওয়ার পর কিছুদিন ভালরূপ আহারাদিও করিত না। তাহার মাতার সহিত যখন আমার পরে দেখা হয়, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "ছেলে ত তোমারই হয়ে গেছে। আমাদের বাড়ীর রান্না তার পছন্দ হয় না; বলে, তোমরা ওঁদের মতন রাঁধ্‌তে জান না।" অনেক সময়ই পকেটে করিয়া আনাজ তরকারী আনিয়া বাড়ীতে বলিত, "এই জিনিষগুলি এমন করে রাঁধ, দেখি ওঁদের মত হয় কিনা।" মনোমতধন আমাদের বাড়ীতে আসিলে যেন অন্যরকম হইয়া যাইত। নিজেই শিল-নোড়া লইয়া কাঁচা আম ছেঁচিয়া চাট্‌নী তৈয়ার করিত। ভাঁড়ারে কোথায় আধখানা কমলানেবু আছে, তাহা খাওয়া; পানের বাটা হইতে স্বহস্তে পান সাজিয়া খাওয়া — নিজের বাড়ী হইতে সে আমাদের বাড়ীতেই যেন বেশী স্বাধীন ছিল।

আমরা যখন ময়মনসিংহে ছিলাম সেই সময় মনোমতধন ও তাঁহার ভগিনী হেমলতা তথায় যান। তাহার ভগিনীর ভাসুরের বাড়ী ময়মনসিংহে। একদিন মনোমতধন তাহার ভগিনীকে লইয়া আমাদের বাড়ী আসে। আমরা তাহার ভগিনীর সহিত বাক্যালাপ করিতেছি, কিন্তু

ভ্রাতাটি সেই স্থানে নাই। তিনি সমস্ত বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং ভাঁড়ারে সামান্য যাহা কিছু আছে তাহাই আস্বাদন করিতেছেন। ইহা দেখিয়া তাহার ভগিনী হাসিয়া বলিলেন, "দাদা ত' বাড়ীতে কখনও এরকম করে খান না। এটাই যেন তাঁর নিজের বাড়ী।" বাস্তবিকই মনোমতধন আমাদের আপনার জনই হইয়াছিল। ...তাহার অকস্মাৎ accidentএ মৃত্যু হয়, আমার শোকদগ্ধ প্রাণে পুনরায় যেন পুত্রশোক পাইলাম।

মিস্ নীলের স্কুল

কিছুদিন পরে স্বামী কার্য্যোপলক্ষে ঢাকা গেলেন। আমি কন্যা সরযূকে লইয়া কলিকাতায় রহিলাম। কন্যা বেথুন স্কুলে পড়িতে লাগিল। আমার সঙ্গে ভাসুরপুত্র প্রফুল্লচন্দ্র ও আমার এক দেবর জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন বাস করিতেন। মনোমতধনও অধিকাংশ সময়ই থাকিতেন। সকলেই দ্বিপ্রহরে যে যাঁহার কাজে চলিয়া যাইতেন, সেই সময় বাড়ীতে আমি একাকী থাকিতাম। স্থির করিলাম, ঐ সময় একটু পড়াশুনা করিলে মন্দ হয় না। আমার ভ্রাতৃতুল্য শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ মহাশয়ের সহিত আমার অতি স্নেহের ভগিনী নির্ম্মলার বিবাহ হয়, তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। সুবোধ বিবাহের পরে নির্ম্মলাকে মিস্ নীলের স্কুলে পাঠান। তাঁহারা প্রায়ই আমার বাড়ীতে আসিতেন। একদিবস শ্রীমান্ সুবোধকে বলিলাম, "নির্ম্মলাকে স্কুলে পাঠিয়েছ, আমাকেও নিয়ে চল না? দুপুর বেলা এক্‌লা বসে বসে সময় নষ্ট করে লাভ কি? যে ক'দিন পারি একটু পড়ে নি।" সুবোধ আহ্লাদের সহিত আমাকে মিস্ নীলের স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দিলেন। পরদিবস হইতে আমার জন্য স্কুলের বাস্ (bus) আসিতে লাগিল। আমি প্রত্যূষে উঠিয়া পাচককে রান্নার প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিতাম। কন্যা আহার করিয়া স্কুলে চলিয়া যাইত আমিও আহারকার্য্য সমাপন করিয়া বই হাতে স্কুলের busএর জন্য অপেক্ষা করিতাম। আমাদের gateএ 'বাস' থামাইয়া সহিস ডাকিত, "মিস্ বাবা, গাড়ী আয়া।" আমিও অবিলম্বে যাইয়া গাড়ীতে উঠিতাম। এই যে busএর সহিস্ আমাকে 'মিস বাবা' বলিয়া সম্বোধন করিত, ইহাতে আমার একটু হাসি পাইত। আমি মনে মনে ভাবিতাম, গাড়ীর সহিস্ মিস্ বাবা ডাকিতেই অভ্যস্ত, বেচারা আমাকে মিস্ বাবা ডাকিলে কিই বা ক্ষতি হইবে। উহার ভুল ভাঙ্গাইবার প্রয়োজন কি? স্কুলে যাইয়া ক্লাসে আমি সর্ব্বশেষে বসিলাম। আমার সেই ক্লাসে ক'টি মেয়ে ছিল আমার ঠিক স্মরণ নাই। সম্ভবতঃ দশ পনরটি হইবে। অনেক দিবস পরে পুনরায় ক্লাস করিতেছি, বিশেষতঃ মেমসাহেবদের স্কুলে পূর্ব্বে পড়ি নাই। প্রথম দিন উৎকর্ণ হইয়া সকলই শুনিলাম। মনে বড় ভয় হইল যদি teacherএর প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারি তবে বড় লজ্জার বিষয় হইবে। তৎ-পরদিবস হইতে আহার নিদ্রার সময় কমাইয়া সমস্ত পড়াগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া স্কুলে যাইতাম। আমি টিচারের সকল প্রশ্নেরই উত্তর দিতে সক্ষম হইতাম। এইরূপে আমি ক্লাসে উপরের দিকে উঠিতে লাগিলাম।

একদিবস টিফিনের ছুটির সময় শুনিতে পাইলাম কয়েকটি মেয়ে চুপিচুপি বলিতেছে, "এই যে নূতন মেয়েটি স্কুলে এসেছে, ও বিবাহিতা।" অপর একজন বলিল, "শুদ্ধ বিবাহিতা কি, ওর একটি মেয়েও আছে। শুনিলাম মেয়েটি বেথুনে পড়ে।" বেথুন এবং মিস্ নীলের স্কুল পাশাপাশি ছিল। উহাদের কথা যদিও আমি শুনিতে পাইলাম, কিন্তু চুপিচুপি কেন বলিতেছে বুঝিতে পারিলাম না। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেই ত পারে। আমি আপ্‌না হইতে ত আর

উহাদের বলিতে যাইতে পারি না। মিস্ নীল ত তাঁহার খাতায় আমার নাম মিসেস্ সেনই লিখিয়াছেন। তিনি ত জানেন।

মিস্ নীলের স্কুলের নিয়ম ছিল, স্কুল হইতে গৃহে প্রত্যাগমনকালে একটি করিয়া (যাহার যেমন ইচ্ছা) ইংরাজী কথা বলিতে হইবে। আমিও নিয়মানুসারে একটি করিয়া কথা বলিয়া আসিতাম।

একদিন স্বামীর পত্র পাইলাম, 'এইবার তোমরা ঢাকা চলিয়া আইস।' আমি যথালাভ বিবেচনায় শেষ বিদায় লইবার অভিপ্রায়ে সেই দিবস স্কুলে গেলাম। সেইদিনও পড়াটি ভাল করিয়া শিখিয়াছিলাম। আমি দ্বিতীয় স্থানে উপবেশন করিয়াছিলাম। টিচার উপরকার মেয়েকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। মেয়েটি উত্তর দিতে অসক্ষম হওয়ায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাহার উত্তর দিলাম। তিনি আমাকে প্রথম স্থানে বসিবার আজ্ঞা দিলেন। আমার একটু দুঃখও হইল, আনন্দও হইল। মনে হইল বৃদ্ধ বয়সে স্কুলে পড়িতে আসিয়াছিলাম, ভগবান আমার মান রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু তথাপিও স্কুল ছাড়িয়া যাইতে হইবে, পড়াশুনা আমার ভাগ্যে নাই — তাই দুঃখ হইল। কিন্তু সকলের উপরে স্বামীর আদেশ; এতদ্ব্যতীত তাঁহার সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত নিজের আগ্রহ এবং ব্যাকুলতা, — কাজেই আমাকে যাইতে হইবে।

স্কুলের একটি নিয়ম আমার বড়ই চমৎকার লাগিত। টিচার পড়াইতেছেন, যেমনি ঘন্টা পড়িল তৎক্ষণাৎ পুস্তক বন্ধ করিলেন। তখন হয়ত একটি শব্দ অর্দ্ধোচ্চারিত হইয়াছে, বাকী অর্দ্ধ আর উচ্চারিত হইল না। ভাবিতাম, ঐ অর্দ্ধেক উচ্চারিত শব্দটি পুরাপুরি উচ্চারণ করিতে এক সেকেণ্ডও সময় লাগিত না। ঐটি উচ্চারণ করিয়া পুস্তক বন্ধ করিলেই ত চলিত। কিন্তু চমৎকার ঐ নিয়ম, ঘন্টা পড়িলে আর একটুও সময় ব্যয় করা হইবে না।

যাহা হউক, স্কুলের শেষদিনকার ইংরাজী কথা আর আমায় বানাইয়া বলিতে হইল না। বলিলাম, "স্বামীর চিঠি পাইয়াছি, তাঁহার নিকট যাইতে হইবে। আমার স্কুলে আসার এই শে দিন।"

আমি বোধহয় মাত্র একমাস স্কুলে গিয়াছিলাম। এই কয়দিনের মধ্যে টিচাররা আমায় অত্যন্ত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু Miss Neilএর স্কুলে কোন মেয়ের সঙ্গেই আমার বন্ধুতা হয় নাই।

ঢাকায় যাইয়া স্বামীর সহিত মিলিত হইলাম। মনোমতধনও আমাদের সঙ্গে গেল। ঢাকা ডিষ্ট্রিক্টের গ্রামগুলিতে যাইতে হইলে নৌকায় যাতায়াত করিতে হয়। স্বামী আফিসের কেরাণীবাবু ও দুইটি চাপরাসী সঙ্গে আমাদের লইয়া বৃহৎ একখানি কোষ নৌকাতে চলিলেন। কলিকাতায় ঐ নৌকাগুলিকে বজ্‌রা বলে। ঢাকার 'কোষ'গুলি বজ্‌রা অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ বৃহৎ। সঙ্গে একখানি রান্নার নৌকাও চলিল। নৌকায় বাস করিতে বড়ই আমোদ লাগিত। ঢাকা হইতে কেহ কেহ আমাদের সঙ্গী হইলেন। স্বামীর কার্য্যোপলক্ষে কত নূতন স্থান যে দেখিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই। বিস্তর বৃহৎ নদী, খাল, বিল ইত্যাদি উত্তীর্ণ হইলাম। পেনাকুলী নামক একটি স্থানে, যেখানে ঢাকাই পনীর তৈয়ারী হয়, সেস্থানেও আমরা গিয়াছিলাম। শুনিয়াছি তথাকার মহিষগুলি অতিশয় দুর্দ্দান্ত;সুযোগ পাইলে মনুষ্যজাতির উপর তাহাদের বল পরীক্ষা করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু ভগবানের কৃপায় আমরা নিরাপদেই পরিদর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

এই কার্য্যোপলক্ষে আমার প্রিয় মাতুলালয়েও যাই। দেখিলাম, সমাজের সেই কঠিন শাসন এতদিনে বেশ শিথিল হইয়া আসিয়াছে। মাতুলালয়ে জামাতার আগমনে মস্তবড় ভোজ হইল। সকলেই আমাদের পাইয়া আনন্দিত হইলেন। পূর্ব্বে একস্থানে লিখিয়াছি, এই উপলক্ষে মাইজপাড়ার মঠটি দূর হইতে অবলোকন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হই। কিন্তু সাহসের অভাবে পিত্রালয়ে আর যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। শ্বশুরালয়েও একবার এই কার্য্যসূত্রে যাইতে হইল।

নৌকাবাসের সেই আনন্দ কখনই ভুলিব না। এক একটি হাটে নৌকা লাগিত এবং নানাবিধ দ্রব্যাদি ক্রয় করা হইত। ঢাকার ঐ সকল বিভিন্ন হাটে যে কত অসংখ্য প্রকারের সামগ্রী বিক্রয় হইত, তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। স্বামী নিজে যাইয়াই ঐ সকল সামগ্রী ক্রয় করিয়া আনিতেন। বড় নদীতে মাছের নৌকা ধরিয়া মাছ কিনিয়া লওয়া হইত। নৌকা চলিতেছে, রন্ধনাদিও হইতেছে। কোনই গোলযোগ নাই। ... বড়ই আমোদে দিনগুলি কাটিয়া গেল। ঢাকার কার্য্য শেষ হইলে আমরা পুনরায় কলিকাতা আসিলাম।

কটক যাত্রা

ঐ বৎসরই ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই, Government হইতে অর্ডার আসিল স্বামীকে কটক যাইতে হইবে। কি কার্য্যে যে তাঁহাকে সেথায় যাইতে হইবে অর্ডারে তাহার কোনও উল্লেখ ছিল না। তবে মাত্র তিন মাসের জন্য যাইতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করা ছিল। তখন কটকে রেলওয়ে হয় নাই, যাতায়াত সহজ ব্যাপার ছিল না। বাধ্য হইয়া তিনি আমাদিগকে কলিকাতায় রাখিয়া একাকী সেথায় গমন করিলেন। কটকে যাইয়া টেলিগ্রামে আমাদের জানাইলেন, তাঁহাকে Joint Magistrateএর পদে গভর্ণমেন্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। আমরা তিনমাস কলিকাতায় অপেক্ষা করিলাম। তিনমাস পরেও যখন তাঁহাকে কটকেই থাকিত হইল, তখন আমরা তথায় যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। তখন কটকে সমুদ্রপথে যাইতে হইত। সমুদ্র কখনও দেখি নাই। কেবলমাত্র ভূগোল পুস্তকে সমুদ্র, পর্ব্বতের বিষয় পড়িয়াছি। এতদ্ব্যতীত নূতন দেশ, নূতন জিনিষ দেখিবার স্পৃহা আমার অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু স্বামী লিখিলেন, 'তোমরা canal পথেই এস'। ... তখন ভাবিয়া দেখিলাম স্বামী সঙ্গে থাকিবেন না, সমুদ্রপথে একা না যাওয়াই ভাল। ভাসুরপুত্র প্রফুল্লচন্দ্র ও দেবর জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেনকে সঙ্গে লইয়া 'কেনেল' ষ্টীমারেই কটকাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

'কেনেল' ষ্টীমারে কখনও কোন যাত্রী যায় কিনা জানি না। আমাদের ষ্টীমারখানিতে ত' আমরা ভিন্ন অন্য কোন যাত্রী ছিলেন না। জানা গেল ষ্টীমার হইতে আহার্য্য কিছুই পাওয়া যাইবে না। আমাদিগকেই রন্ধনাদি করিয়া আহার করিতে হইবে। আমি প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করিয়া সঙ্গে লইলাম। একটি টিনে মাগুর, কইমাছ জিয়াইয়া লইলাম। একটি ষ্টোভ ও একজন খানসামা সঙ্গে চলিল। আমাদের রান্না cabinএতেই হইল। অপর কোনও আরোহী না থাকাতে সমস্ত ষ্টীমারখানি আমরাই অধিকার করিয়া লইলাম, যেন উহা আমাদেরই নিজস্ব। সমুদ্র না হইলেও অনেক বৃহৎ নদী অতিক্রম করিয়া আমরা কটকে মহানদীতে যাইয়া পৌঁছিলাম। পথিমধ্যে ষ্টীমারের সারেঙ্গ দুই একটি কুমীরও মারিল।

আমার তিনটি জিনিষ সম্পূর্ণ নূতন দেখা হইল। কাঠ দিয়া জল বাঁধিয়া রাখা আমার নিকট সম্পূর্ণ নূতন, কারণ পূর্ব্বে কখনও canal দেখি নাই। তাহার পর যখন ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী

দর্শন করিলাম, তখন প্রাণে যে কিরূপ উচ্ছ্বাস জাগিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতে পারিব না। সেই সময় ষ্টীমারে বসিয়া আমি এই কবিতাটি লিখি—

কে তোরা দাঁড়ায়ে ঐ উচ্চ করি' শির,
অহঙ্কারে স্ফীত কেন সবার মূরতি?
অনন্ত সৃষ্টির কথা করিতে প্রচার
দাঁড়ায়ে আছ কি আজি অচঞ্চল স্থির?
ক্ষুদ্র আমি বৃহতের বাখানিব রূপ
শক্তি কোথা পাই? মনে হয় যেন সৈন্যদল
সবুজ পোষাক পরি' রয়েছ দাঁড়ায়ে, যুঝিতে
তাদের সাথে যাহারা নাস্তিক। অনুসম
নাহি দুখ, নাহি পাপ ব্যাধি, দেবসম
দেহ সুকুমার; প্রাণ মাঝে নাহি চিন্তা
নাহি লাজ ভয়, ধেয়ান করিছ বসি
মহান স্রষ্টার। শুনেছি পাষাণ হয় বড়ই কঠিন,
হয় না তাহাতে কভু বীজ অঙ্কুরিত। কেমনে
সাজিলে তবে বৃক্ষে ফলে ফুলে? (কর্ম্মতুষ্ট
দেবতার অসঙ্কোচ দান তোমাদের 'পরে)।
তোমাদের বীর্য্যগাথা কেমনে বর্ণিব?
মেঘকুল ধেয়ে চলে যবে স্বর্গপানে,
তাহাদের ধরি ক্রোড়ে রাখ বসাইয়া,
মাতার চরণপদ্মে দিতে উপহার।

এত যে কঠিন তব পাষাণের প্রাণ
ফলিয়াছে তাহাতেও পত্রপুষ্প আদি;
কিন্তু হায়! মানবের সুকোমল হৃদে
নাহি হয় অঙ্কুরিত প্রীতি, প্রেম, দয়া —
যাহাতে সাজিবে বৃক্ষ নয়নরঞ্জন; ছায়ায়
তাহার, জগতের সর্ব্বক্লান্তি হবে অপনিত।।

আমরা মহানদীতে পৌঁছিয়াই অপর একটি নূতন জিনিষ দর্শন করিলাম, তাহা "এনিকাট্" (১)। মহানদী শীতের সময় শুষ্ক হইয়া যায়, তজ্জন্য বাঁধিয়া জল রাখিতে হয়। কিন্তু বর্ষাকালে এই মহানদীর প্রতাপে কত তীরস্থ গ্রাম ভাসিয়া যায় তাহার ইয়ত্তা নাই।

কণিকার রাণী

কটকে আমাদের 'বাংলো'টি খুব খোলা জায়গায় ছিল। দক্ষিণে বিস্তীর্ণ মাঠ, তাহার পরেই কণিকার রাজার বাড়ী। রাজবাড়ীতেও বিস্তর জায়গা-জমি। উত্তরে বৃহৎ চওড়া রাস্তা। বলা বাহুল্য, 'বাংলো'টি আমাদের, বিশেষ করিয়া আমার, বড়ই পছন্দসই হইল।

অল্প কয়েকদিন পরেই কণিকার রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন ও মধ্যে মধ্যে আমাকে যাইতে অনুরোধ করিলেন।

তিনি প্রায়ই আমাদের নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী পাঠাইয়া দিতেন। তিনি স্বহস্তে 'বড়ি' প্রস্তুত করিয়া আমাদের পাঠাইতেন। রাজার ছিপ দিয়া মৎস্য ধরিবার অভ্যাস ছিল। বঁড়শিতে সর্ব্বপ্রথমে যে মৎস্যটি লাগিত, তৎক্ষণাৎ সেটি আমার স্বামীকে পাঠাইয়া দিতেন। আমার পীড়ার সময় তাঁহাদের দশ বার বৎসর বয়স্ক পুত্র আসিয়া প্রায়ই আমার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিত ও নানারূপ গল্প বলিত। খুব সম্ভব তাহার মাতাই তাহাকে পাঠাইয়া দিতেন। সত্যই আজ ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই, ভগবানের কৃপায় যে স্থানেই গিয়াছি, আমার জন্য তথাকার সকলের হৃদয়েই ভালবাসা সঞ্চিত ছিল। কণিকার রাজার সেই দশ বার বৎসর বয়স্ক পুত্রটি কিছুকাল পরেই ইহলোক পরিত্যাগ করাতে সকলের প্রাণে অত্যন্ত কঠোর আঘাত লাগিয়াছিল। কৃতান্ত ত' ধনী দরিদ্র বিচার করিয়া নেয় না।

আমাদের 'বাংলো'টি যে স্থানে ছিল সেটি তুলসীপুর নামে খ্যাত। আমাদের বাংলোর অতি নিকটেই ময়ূরভঞ্জের মহারাজ বালক রামচন্দ্র ভঞ্জদেও ও নীলগিরির রাজপুত্র একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বাস করিতেন। শিক্ষক মহাশয় অনেক সময়ই মহারাজকুমারদ্বয়সহ আমাদের বাংলোতে আসিয়া স্বামীর সহিত গল্পালোচনা করিতেন। কালক্রমে ময়ূরভঞ্জের মহারাজা রামচন্দ্র ভঞ্জদেও আমার অতি স্নেহের ভগ্নীসমা সুচারু দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহাকে যখন বিবাহের পরে দেখিলাম, সেই বাল্যকালের কথাই স্মরণ হইতে লাগিল। ভগবানের লীলার কথা ভাবিলে অবাক হইতে হয়।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও ও জগন্নাথ রাও[৪০]

কটকে আসিয়া ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগন্নাথ রাও মহাশয়দের সহিতও অত্যন্ত আত্মীয়তা হইল। তাঁহাদের দুই ভ্রাতার কন্যাগণ অনেক সময়ই আমাদের বাড়ী আসিয়া থাকিতেন। সরযূ বড়ই একেলা পড়িয়াছিল। ইহারা আসিলে, ইহাদের সঙ্গ পাইয়া তাহার অত্যন্ত আনন্দ হইত। মধুসূদন রাও মহাশয়ের বড় কন্যা বাসন্তী দেবীর সহিত আমার স্বামীর প্রিয় ছাত্র বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের [৪১] বিবাহ হয়। সেই কারণেও তাঁহাদের সহিত অতিশয় ঘনিষ্ঠতা হয়। বাসন্তী দেবীর কনিষ্ঠা ভগিনী অবন্তী দেবী শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্রের সহিত পরিণীতা হয়েন। শ্রীযুক্ত জগন্নাথ রাও মহাশয়ের কন্যা সরস্বতী দেবী, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের পুত্রবধূ হন।

মিষ্টার এবং মিসেস্ বি, এল, গুপ্ত

তখন Mr. B. L. Gupta মহাশয়[৪২] কটকের জজ্ ছিলেন। তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা সৌদামিনী দেবীর সহিত আমি বাল্যেই পরিচিতা ছিলাম। এক্ষণে তাঁহার সহিতও আত্মীয়তা বর্দ্ধিত হইল। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী মোহিনী দেবী আমার সবিশেষ বন্ধু ছিলেন; তজ্জন্য তিনি আমাকে কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় ভালবাসিতেন। মিসেস্ গুপ্তর দুইটি কন্যা 'শীরিন্' ও 'বনি' (বনলতা) কটক Conventএ পড়িত, সরযূও তথায় পড়িত। তাহাদের অত্যন্ত ভাব হইয়াছিল।

মিসেস্ গুপ্তর বাড়ী আমাদের বাড়ী হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে ছিল। তথাপি উভয় পরিবারের মধ্যে যাতায়াতের ব্যতিক্রম ঘটিত না। ঘোড়ার গাড়ীতে যাইতে একটু সময় লাগিত। একদিন অপরাহ্নে আমি Mrs. Guptaর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে

রাত্রি আট্টা বাজিল। তাঁহাদের খানসামা ডিনারের ঘন্টা দিল, আমি যাইবার জন্য উঠিলাম। তিনি আমাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "আর একটু বস।" বাধ্য হইয়া আমাকে থাকিতে হইল। পুনরায় অল্পকাল পরে ঘন্টা বাজিল, কিন্তু তখনও তাঁহার অনুরোধে আমাকে বসিতে হইল। খানসামা ছেলেমেয়েদের আহার করাইল; তাহারা যে যাহার শুইতে গেল, আমাদের গল্পের বিরাম নাই। হঠাৎ যখন ঢং ঢং করিয়া বারটি ঘন্টা পড়িল, তখন উভয়ের চেতনা হইল। আমি তাড়াতাড়ি করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। রাত্রি অনেক হইয়াছে, অনেক দূর যাইতে হইবে; একটু ভয়ও হইল। বাড়ীতে আসিয়া অপ্রস্তুতভাবেই উঠিলাম। ভালবাসা এমনই জিনিষ, ইহার প্রভাবে চতুষ্পার্শ্বের সংজ্ঞা ডুবিয়া যায়। রাত্রি যে এত হইয়াছে, আমি তাহা বুঝিতেও পারি নাই।

কটকে শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও ও তদীয় ভ্রাতা ব্যতীত অপর কয়েকজন ব্রাহ্ম ছিলেন। রবিবারে ব্রহ্মমন্দিরে নিয়মিত উপাসনা হইত। মধুবাবু ও আমার স্বামী অধিকাংশ দিবস আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। মাঘোৎসবের সময় আমার স্বামী কটক হইতে কার্য্যোপলক্ষে দূরে থাকিলে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াও যথাসময়ে ব্রহ্মমন্দিরে উপস্থিত হইয়া উপাসনা করিতেন।

নারী উৎসব

আমাদের কটক যাইবার পরে মেয়েদের উৎসবটি আমাদের বাড়ীতেই হইত। কটকে সেই উৎসবকে 'নারী উৎসব' বলা হইত। নারী উৎসবের দিবস পুরুষগণও নিমন্ত্রিত হইয়া উপাসনায় যোগ দিতেন। সেই উৎসবের দিনটি যে কিরূপ আনন্দে কাটিত, তাহা স্মরণ করিলে আজিও হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া উঠে। আমাদের প্রতিবাসী দুই একঘর খৃষ্টান ছিলেন। তাঁহাদের মেয়েরাও উৎসবের আনন্দে যোগ দিতেন। উপাসনার পরে প্রীতিভোজন হইত। উৎসবের আরম্ভের পূর্ব্বেই রন্ধনাদি সমাপন করিয়া রাখিতাম। সেই খৃষ্টান মহিলারা আমার বহু সাহায্য করিতেন। তাঁহাদের সহিত ভালবাসার সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সেই উৎসবের দিবস স্বরচিত একটি গান গাহিয়াছিলাম। খৃষ্টান ভগিনীদেরও তাহার সুর শিখাই; তাঁহারা আমার সহিত গানে যোগ দিয়াছিলেন। গীতটি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(রাগিণী : সাহানা, তাল : ঝাঁপতাল)।

আজি সম্বৎসর পরে মিলিনু ভগিনী সকলে
পূজিব মায়ের পদ ভক্তিভরে প্রাণভরে;
আমরা দুখিনী অতি নাহিক পদে ভকতি
দয়া করে নিজগুণে মা আমাদের ডাকিলে।
সংসারে তাপিত হিয়া কোথা আর জুড়াব গিয়া
কেবা আর দিবে স্থান দুখীদের মুখ চাহিয়া;
চল তবে ভগ্নীগণ করি সবে প্রাণপণ
মাগি ভিক্ষা মায়ের কাছে সম্বৎসর তরে।
প্রেমসুধা হাতে ল'য়ে মা ডাকেন কাতর হয়ে
খাওয়াইতে প্রেম-অন্ন ক্ষুধায় কাতর নারী-নরে।।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে স্বামী সেটেলমেন্ট কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। গ্রামে গ্রামে তাঁবু ফেলিয়া কাজ করিতে হইত। আমরা মধ্যে মধ্যে তাঁবুতে যাইয়া থাকিতাম। সরযূর স্কুল কামাই হইবে বলিয়া সর্ব্বদা থাকিতে পারিতাম না। তাঁবুতে থাকিতে বড়ই ভাল লাগিত।

আমার কঠিন পীড়া

ইহারই কয়েক দিবস পরে আমার কঠিন পীড়া হয়। মাতাঠাকুরাণী ঢাকা হইতে আসিলেন। সিভিল সার্জ্জন প্রতিদিবস আসিয়া দেখিয়া যাইতেন;এদিকে একজন ব্রাহ্ম ডাক্তার দিবারাত্র বাড়িতে থাকিয়া ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। স্বামী মফঃস্বলে সমস্ত দিবস কার্য্য করিয়া রাত্রিতে পাল্কী করিয়া গৃহে ফিরিতে লাগিলেন; পুনরায় প্রভাতে কার্য্যস্থলে চলিয়া যাইতেন। এত করিয়াও আমার বাঁচিবার আশা দুরাশায় পরিণত হইল। মাতৃদেবীর ও স্বামীর চিন্তা হইবারই কথা;কিন্তু সহরশুদ্ধ লোক, এমন কি ইংরাজ পরিবারগণও আমার জন্য চিন্তিত হইয়াছিলেন। সেই সকল কথা স্মরণ হইলে প্রাণ তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হয়।

কিন্তু ভগবানের হিসাবের খাতায় আমার আয়ু তখনও শেষ হইয়া আসে নাই। যখন কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া উঠিলাম, সিভিল সার্জ্জন মহাশয় স্বামীকে বলিলেন, "এবারে Mrs. Senকে কোনও sea-sideএ changeএ পাঠাও।" স্বামী বড়ই সমস্যায় পড়িলেন। তিনি নিজে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অসমর্থ, অথচ লইয়া যাইবার অন্য লোকেরও অভাব। এমন সময় একটি ঘটনা হইল যাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, মঙ্গলময়ের শুভ ইচ্ছা নিয়ত আমাদের ভাগ্যসূত্র পরিচালিত করিতেছে। গভর্ণমেন্ট হইতে হঠাৎ সংবাদ আসিল স্বামীকে পুরীতে ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতে হইবে। এই সংবাদ পাইয়া তিনি ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ দিলেন। আমাকে আর একা sea-sideএ চেঞ্জে যাইতে হইবে না।

পুরী যাত্রা

অবিলম্বে পুরী যাত্রার আয়োজন করিলেন। তখনও রেলওয়ে হয় নাই। কাজেই অশ্বযান ও গো-শকটই যাত্রীদের সম্বল ছিল। আমরা পথে একদিন বিশ্রাম করিয়া পুরী সহরে পৌঁছিলাম। পুরীর বিশুদ্ধ সামুদ্রিক হাওয়ায় আমার শরীর ক্রমশঃ সুস্থ হইতে লাগিল। পুরীতেই আমি সর্ব্বপ্রথম সমুদ্র দর্শন করি। সমুদ্র দেখিয়া আমার যে কিরূপ আনন্দ হইয়াছিল তাহা বর্ণনায় প্রকাশ করিতে অসমর্থ। আমাদের গৃহটি সমুদ্রের তীরেই অবস্থিত ছিল। বারিধির গর্জ্জনধ্বনি সর্ব্বদাই কাণে আসিয়া পৌঁছিত। মধ্যে মধ্যে আমরা সমুদ্রস্নানও করিতাম, কিন্তু সমুদ্রবক্ষে তখনও জাহাজ চড়া হয় নাই। তীর হইতেই দেখিতাম ধূমোদগীরণ করিয়া জাহাজ সচ্ছন্দ-গতিতে চলিয়াছে।

ডাক্তার ব্যাঙ্কস

তখন সমুদ্রতীরে বাড়ীঘরও অধিক ছিল না। রাস্তার অন্যধারে Dr. Banks, পুলিশ সাহেব, ও একজন বাঙ্গালী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাস করিতেন। সমুদ্রতীরটি বালুকাকণায় আবৃত হইয়া ধূ-ধূ করিত। Changeএ কম লোকই পুরী আসিত। মধ্যে আমাদের বাড়ীতে পুরীদর্শনের জন্য অতিথি সমাগম হইয়াছিল। প্রচারক মহাশয়গণ ও দুই একটি ব্রাহ্ম পরিবার আসিয়াছিলেন।

পুরীদর্শন ও সমুদ্রদর্শন করিলাম বটে কিন্তু জগন্নাথদেবের মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করা ঘটিয়া উঠে নাই। মন্দিরের দরজায় লেখা ছিল : 'যাহারা অহিন্দু তাহারা প্রবেশ করিবেন না'। স্বামীর সহিত প্রতিদিবস মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতাম। রথযাত্রার সময় ভয়ানক ভীড় হইত। ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডাক্তারকে অশ্বারোহণ করিয়া সহর পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইত।

পুরীর পাণ্ডারা আমার স্বামীকে প্রকৃতই শ্রদ্ধা করিত। অনেক সময়ই তাহারা আসিয়া তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিত। তিনি না থাকিলেও বারন্দায় উপবেশন করিয়া আলোচনা করিতে তাহারা দ্বিধাবোধ করিত না।

Dr. Banks নামক ইংরাজ ভদ্রলোকটি স্বামীর সহিত অত্যন্ত মেলামেশা করিতেন। তিনি নিজ বাটীতে তিন ঘটিকার সময় চা পান করিতেন, পুনরায় আমার স্বামী আফিস হইতে ফিরিলে আমাদের বাটী আসিয়া চা পানে যোগদান করিতেন। আমার মাতৃদেবী তখন পুরীতে ছিলেন। তিনি প্রতিদিবস চায়ের সময় গরম লুচি ভাজিয়া দিতেন। Dr. Banks গরম লুচি খাইতে বড়ই ভালবাসিতেন।

স্বামীর রিউমেটিজম্

এই সময়ে স্বামীর রিউমেটিজম্ হয়। Dr. Banks শুদ্ধমাত্র ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াই নিবৃত্ত ছিলেন না, তিনি নিজ হস্তে ঔষধ মালিশ করিয়া দিতেন। আমাকে বলিতেন, "আমি কোট খুলিয়া Mr. Sen-কে মালিশ করিয়া দিব, আশা করি আপনি কিছু মনে করিবেন না।" স্বামীর প্রতি এই ইংরাজ সন্তানের ভালবাসা সন্দর্শন করিয়া আমি অবাক হইতাম। যাঁহাদের হৃদয়ে প্রীতির উৎস বর্ত্তমান, তাঁহারা পরকেও আপন করিতে পারে। সত্যই ত', ভগবানের রাজ্যে কেহই পর নহে।

Dr. Banksএর পুরীতে একটি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। আমরা দেখিতে গেলাম। কি সুন্দর শিশুটি। আমাদের যাওয়াতে তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কালক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া শিশুটি স্বদেশের জন্য যুদ্ধে আত্মোৎসর্গ করে। তাহার মৃত্যুসংবাদে প্রাণে বড়ই আঘাত পাইয়াছিলাম।

মিষ্টার রমেশচন্দ্র দত্ত ও জে, এন, গুপ্ত

ইহার পর Mr. B. L. Gupta অবসর গ্রহণ করিলে গভর্ণমেন্ট স্বামীকে কটকের জজ্ নিযুক্ত করিলেন। ইহার পূর্ব্বে কটকে থাকিতে যখন আমরা Mr. Guptaএর বাড়ী যাইতাম তখন সরযূ বলিত, "এই বাড়ীটি আমাদের হইলে কেমন ভাল হইত।" বালিকার মুখনিঃসৃত বাণী যথার্থই পরে সত্যে পরিণত হইল। বাড়ীটি প্রকাণ্ড ছিল। সম্মুখে বাগান ও চতুষ্পার্শ্বে বিস্তর জমি ছিল। আমরা তিনটি মাত্র লোক। বন্ধুবান্ধব আসিলে অত্যন্ত আনন্দ বোধ করিতাম। বাড়ীটি সহরের একটু বাহিরে অবস্থিত থাকায় সকলের সহিত সর্ব্বদা মেলামেশা করা ঘটিয়া উঠিত না। এই সময়েই Mr. R. C. Dutta (শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত) কমিশনার হইয়া কটকে আসিলেন। তাঁহার জামাতা Mr. J. N. Gupta স্থানীয় জয়েন্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত ছিলেন। পরস্পরকে পাইয়া এই তিনটি বাঙ্গালী পরিবারের আনন্দ বর্দ্ধিত হইল। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিত আমাদের সবিশেষ আত্মীয়তা হইল। ইহার পর আমার স্বামী যখন বাঁকুড়াতে জজ্ হইয়া গেলেন, তখন জে, এন, গুপ্ত মহাশয়ও তথায় ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া যান। দুইবার এক স্থানে মিলিত হওয়ায় তাঁহার সহিতও আত্মীয়তা গভীরতর হইল।

মিষ্টার বি, এল, গুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে বাস করা হেতু তাঁহাদের স্মৃতি সবসময়ই মনে জাগিত। Mrs. Gupta সর্ব্বদাই আমাকে চিঠিপত্র লিখিতেন। সেই সকল দিবসের কথা

স্মরণ করিলে প্রাণে আনন্দের সঞ্চার হয়। হায়! যে দিন যায় তাহা আর ফিরিয়া আসে না, ...
তাঁহার একখানি চিঠি উদ্ধৃত করিলাম। ভালবাসার গভীরতার পরিচয় কথঞ্চিৎ ইহাতে পাওয়া যাইবে।

সোমবার

প্রিয় ভগিনী,

Mr. Senএর অসুস্থতার বিষয় শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। আশা করি তিনি শীঘ্রই নীরোগ হইবেন। এই সময়ে চারিদিকে খুব জ্বর হইতেছে। আমরা বুধবারেই যাইতেছি। Mr. Gupta আমাকে চাঁদবালী পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া দিবেন। আমার শরীর ভাল নাই। সমস্ত পিঠে অত্যন্ত ব্যথা। কোমর হইতে আরম্ভ করিয়া মাথা পর্য্যন্ত সমস্ত পিঠের দাঁড়ায় এত ব্যথা হয় যে, মধ্যে মধ্যে তাহার জন্য জ্বর হয়। কলিকাতা গিয়া কোন কবিরাজী তেল ব্যবহার করিয়া দেখিব মনে করিতেছি।

লটী, মা এবং মোহিনী, এরা সকলেই পীড়িত। এদের সেবা করিব বলিয়া যাইতেছি। কিন্তু ভয় হইতেছে, নিজেই পাছে রুগ্ন হইয়া পড়ি। তাহা হইলে এত করিয়া যাওয়ার ফল কিছুমাত্র হইবে না। আমি কাল বিকেলে একবার তোমার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু ঠিক করিয়া বলিতে পারি না, pack করিতে বোধ হয় সমস্ত দিন চলিয়া যাইবে। তাহার পর কোথায়ও যাইতে পারিব কিনা জানি না। এখানে থাকিতে তোমার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিয়া অনেক সময় সুখী হইতাম, ইহা কখনও ভুলিব না। আশা করি তুমি আমাকে মনে রাখিবে। হয়ত আবার অন্য কোন স্থানে একত্র হইব।

বাগানের তরকারীগুলি সাদরে গ্রহণ করিলাম। তজ্জন্য আমার ধন্যবাদ লইবে। এক্ষণে তবে বিদায় হই।

তোমার ভগিনী —
সৌদামিনী।

তিন মাসের জন্য স্বামীকে গভর্ণমেন্ট কটকে পাঠাইয়াছিলেন। ক্রমে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইল, আমরা কলিকাতা আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, তখনও রেলওয়ে হয় নাই, ইচ্ছামতন যাতায়াত করা চলিত না। কাজেই আমাদের দীর্ঘকাল কটকেই বাস করিতে হইল। চাকরদিগের সহিত সর্ব্বদাই উড়িয়া ভাষায় কথা কহিতে হইত। ভাষাটি এতই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল যে, কলিকাতা প্রত্যাগমন করিয়াও মধ্যে মধ্যে জিহ্বাগ্রে উড়িয়া ভাষা বাহির হইয়া পড়িত।

কলিকাতা প্রত্যাগমন

যাহা হউক, কলিকাতা যাত্রার দিন আসিল। কতকাল পরে আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবাসীদিগের মুখ সন্দর্শন করিব ভাবিয়া অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। স্বামীর সহিত চাঁদবালীতে আসিয়া সুমদ্রগামী জাহাজে উঠিলাম। সমুদ্রের সহিত প্রথম পরিচয়ে লবণাম্বুরাশির সীমাহীন বিস্তৃতির মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিলাম। দূরে যেখানে আকাশ ও বারিধি মিশাইয়া গিয়াছে তাহারই সঙ্গমে পৌঁছিবার জন্য যেন জাহাজ ছুটিয়াছে। তন্ময় হইয়া তাহাই দেখিতেছি, এমন সময় জাহাজের 'ক্যাপ্টেন' সাহেব আসিয়া আলাপচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিসেস্

সেন, আপনি কি এই প্রথম সমুদ্রে চলিয়াছেন?" উত্তরে আমি বলিলাম, "ইহাই আমার সর্ব্বপ্রথম সমুদ্রযাত্রা।" তিনি তখন আমাকে একখানা easy chair আনাইয়া তাহাতে বসিতে দিলেন এবং আরও দুই একটি কথাবার্ত্তা বলিয়া নিজকার্য্যে চলিয়া গেলেন। চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে চেয়ারের জন্য ধন্যবাদ জানাইলাম বটে, কিন্তু যে চেয়ারে বসিয়াছিলাম, তাহাতেই বসিয়া দিগন্তের কালো জলের প্রতি চাহিয়া রহিলাম।

সমুদ্রে জাহাজখানি পড়িতেই আমার স্বামী 'ইজি চেয়ারে' আসিয়া শয়ন করিলেন; আমি তাঁহার নিকটে উঁচু চেয়ারখানিতেই বসিয়া রহিলাম। পরে জাহাজের রেলিংএর কাছে যাইয়া পুনরায় সমুদ্রের নীলজল যতদূর দৃষ্টিগোচর হয় চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম;দুই পার্শ্বে তটের চিহ্ন মিলাইয়া গিয়াছে, আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সমুদ্রের সহিত এই নীরব পরিচয়ে আমি মুগ্ধ হইলাম। ঊর্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশ, নিম্নে সীমাহীন নিতল নীল জলরাশি, কী সুন্দর দৃশ্য! আমার নিকট সমস্তই সম্পূর্ণ নূতন। ভগবন্! তোমার সৃষ্টি কি সুন্দর! এই সকল দেখিয়াও কি তোমাকে আমরা ভুলিয়া থাকিব?

'ডেকে' সাহেব, মেমসাহেব যাঁহারা ছিলেন একে একে সকলেই নিজ নিজ ক্যাবিনে প্রত্যাগমন করিলেন। ডেকের উপর কেবলমাত্র আমার স্বামী ইজি চেয়ারে শয়ন করিয়া রহিলেন তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া আমি সমুদ্রের দৃশ্য প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিলাম। আমরা যে স্থানে চেয়ারে বসিয়াছিলাম, তাহার নিকটেই ডিনারের টেবিল সজ্জিত হইল। অভ্যন্তরে অত্যন্ত গরম। যথাসময়ে আহারের ঘন্টা পড়িল। আমি ও ক্যাপ্টেন ব্যতীত কেহই ডিনারে উপস্থিত হইলেন না। স্বামী নিকটেই ইজি চেয়ারে শায়িত ছিলেন, কিন্তু তিনিও অসুস্থতা নিবন্ধন আহার করিলেন না। আমি ভাবিয়া দেখিলাম, আমার ত কোন অসুখ বোধ হইতেছে না, আমি কেন উপবাসে থাকি। পরদিবস গল্পচ্ছলে ক্যাপ্টেন স্বামীকে বলিলেন, "মিস্টার সেন, প্রথম দিন সমুদ্রে পড়িয়া এ পর্য্যন্ত কোন lady কেই আমি ডিনারে উপস্থিত থাকিতে দেখি নাই, মিসেস্ সেনকেই প্রথম দেখিলাম। আমি এ গল্প সকলের কাছেই করিব।"

কলিকাতা পৌঁছিয়া স্বামী প্রস্তাব করিলেন যে পর্য্যন্ত একটি বাড়ী না পাওয়া যায়, একখানি বজ্‌রা ভাড়া করিয়া থাকা যাক্। তিনি ষ্টীমার হইতেই একখানি বজ্‌রা ডাকিলেন। জিনিষপত্র সমেত আমরা তাহাতে উঠিলাম। রন্ধনের জন্য তখনও নৌকা ভাড়া হয় নাই। আমাদের পাচক গঙ্গীতীরেই আঙ্গটি জ্বালিয়া রন্ধনকার্য্য সমাধা করিল। কিন্তু কিয়ৎকাল পরে নৌকার ভিতর একটি জলীয় সর্প বাহির হইল। মিথ্যা বিপদে পড়িলাম। হয়ত বজ্‌রাতে দুইচারি দিবস থাকিতাম। হঠাৎ এখন কোথায় বাড়ীই বা পাওয়া যায়। আমাদের কলিকাতা পৌঁছিবার সংবাদ পাইয়া মনোমতধন নৌকায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদের দেখিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। যাহা হউক, উপস্থিত বিপদের সংবাদ অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ বাড়ীর খোঁজে বাহির হইল এবং একখানি বাড়ীর অনসন্ধান পাইয়া আমাদের আসিয়া সংবাদ দিল। কিন্তু রাত্রিতে আর সেই বাড়ীতে যাওয়া সম্ভবপর হইল না। একপ্রকার সমস্ত রাত্রি আমরা জাগিয়াই কাটাইলাম। বিছানার চতুষ্পার্শে উত্তমরূপে মশারী গুঁজিয়া দিলাম এবং লণ্ঠন জ্বালিয়া রাখিলাম। ভগবানের কৃপায় সেই রাত্রিতে উল্লেখযোগ্য আর কিছুই ঘটিল না। পরদিবস ডাঙ্গার প্রাণী ডাঙ্গায় উঠিলাম। বাড়ীটি বিজনীরাজের এবং বেশ বড়ই ছিল। স্বর্ণদিদি এক অংশে ছিলেন, আমরা অন্য অর্দ্ধে উঠিলাম। সেই বাড়ীটির স্থানেই বর্ত্তমানে 'জেনারেল হাঁসপাতাল' উঠিয়াছে।

আমরা কিছু দিবস সেই বাটাতে বাস করিবার পর ঢাকা গমন করিলাম। ঢাকাতে বহুদিবস পরে মাতৃদেবী ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দের পরিসীমা রহিল না। কিন্তু ছুটি অবশেষ হইবার পূর্ব্বেই গভর্ণমেন্ট হইতে স্বামীর প্রতি আদেশ আসিল তাঁহাকে রংপুরে জজের কার্য্য করিতে হইবে। তাঁহার ভাগ্যে বিশ্রাম খুব অল্পই হইয়াছিল। তাঁহার কার্য্যে গভর্ণমেন্ট সন্তুষ্ট ছিলেন, কাজেই তাঁহাকে বেশী খাটিতে হইত।

রংপুরের পরে স্বামী বর্দ্ধমানে জজের কার্য্য করেন। ইহার পূর্ব্বে স্বামী বর্দ্ধমানে কৃষিবিভাগে কাজ করিয়া আসিয়াছেন। সকলই পরিচিত। আদর অভ্যর্থনায় সমস্ত অসুবিধা ঢাকা পড়িল।

শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয় [৪৩]

সেইসময়ে ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয় বর্দ্ধমানে বদ্‌লী হইয়া আসেন। তিনি প্রথমে আমাদের বাড়ীতেই উঠিয়াছিলেন। পরে অন্য বাটী ভাড়া করেন। তাঁহার সহিত পূর্ব্বে আমাদের পরিচয় ছিল না; উভয়েই উভয়ের নাম শুনিয়াছিলেন মাত্র। তিনি ব্রাহ্ম বলিয়াই একজন ব্রাহ্মভ্রাতার বাড়ী নিঃসঙ্কোচে আসিয়া উঠিলেন। স্বামী তাঁহাব সহিত উপাসনা ও ধর্ম্মালোচনা করিয়া অনেক সময় কাটাইতেন। এইরূপে পরস্পরের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্রের সহিত আমাদের একমাত্র কন্যা সরযূবালার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র বিলাত যাত্রা করেন, এবং ১৯০১ সালের আগষ্ট মাসে তিনি ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ১৯০২ সালের ২৯শে জানুয়ারী তাঁহার সহিত কন্যা সরযূর শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হয়। শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র শুধু জামাতা নহেন, আমাদের পুত্রস্থানীয় হইলেন। সেই সঙ্গে আদরের সাধনচন্দ্র ও বিধানচন্দ্র আমাদের স্নেহের স্থান অধিকার করিলেন। তাঁহারা আমাদের অত্যধিক শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। এ স্থলে ভগবানের অসীম দয়ার কথা স্বীকার না করিয়া পারি না।

বর্দ্ধমানে যে সময়ে শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয় আমাদের বাড়ীতে আসেন, তাহার কিছুদিন পরে ১৮৯৭ সালের মাঘোৎসবের সময় শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার পত্নীসহ এবং কলিকাতা হইতে কয়েকজন ব্রাহ্ম আমাদের বাড়ী আসেন। উপাসনা, জমাট কীর্ত্তনগান ও সৎ-প্রসঙ্গাদিতে সেই সময়টি কি সুন্দরভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল তাহা ভাবিলে আজিও মনে আনন্দের সঞ্চার হয়। সেই সময় মাঘোৎসব উপলক্ষে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বর্দ্ধমানে আমাদের বাড়ীতে আসেন এবং মহাসমারোহে উৎসব হয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মাতৃদেবীর স্বর্গগমন

কন্যা সরযূর বিবাহ সম্বন্ধ যখন স্থির হয় মাতৃদেবীও তখন বর্দ্ধমানে ছিলেন। ভাবী নাতনী জামাইকে পাইয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইলেন। কিন্তু আদরের নাতনীর বিবাহ দেখা তাঁহার ভাগ্যে লেখা ছিল না। এই সময়ে স্বামী ময়মনসিংহে বদলী হইয়া যান। মাতৃদেবীও কিছুদিনের জন্য তাঁহার মাতা ও ভ্রাতার নিকট বিক্রমপুর যান। সেস্থান হইতে ঢাকার বিধান-পল্লীর বাড়ীতে পীড়িত হইয়া ফিরিয়া আসেন। মাতৃদেবীর পীড়ার সংবাদ পাইয়া সরযূ ও আমি ঢাকায় যাই। তাঁহার অতি আদরের জামাতাও তাঁহাকে দেখিতে আসেন। বগলা তাঁহার কন্যা, পুত্র ও জামাতাকে লইয়া আসিল। কিন্তু অপরিমিত সেবা ও জীবনপণ চেষ্টা সমস্তই ব্যর্থ হইল। ডাক্তারদের শত চেষ্টায়ও তাঁহাকে ধরিয়া রাখা গেল না। ১৯০০ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর সজ্ঞানে ভগবানের নাম করিতে করিতে স্বর্গারোহণ করিলেন। শেযদিবস প্রাতঃকালে তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "আজ আমার কি কোন পরিবর্ত্তন তোমরা দেখিতেছ?" জামাতার নাম করিয়া বলিলেন, "আজ অম্বিকাচরণ নিকটে থাকিলে সব বুঝিতেন।" শেষ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার স্নেহের জামাতার কথাই বলিলেন।

এস্থলে বলা আবশ্যক, ঢাকায় কয়েকজন ব্রাহ্ম মিলিত হইয়া "বিধান-পল্লী" নামক একটি পল্লী গঠন করেন। তথায় আমরাও একটি বাড়ী ক্রয় করি। মাতৃদেবী, পুত্রবধূ, পৌত্রী ও আরও দুই একজনকে লইয়া সেই বাটীতেই অধিকাংশ সময় থাকিতেন। বিধান-পল্লীর মধ্যস্থলে মিলিত উপাসনার জন্য একটি গৃহ নির্ম্মিত হয়। মাতৃদেবী তথায় প্রতিদিবস উপাসনায় যোগদান করিতেন। মৃত্যুদিবস প্রাতঃকালে পল্লীস্থ গায়ক এবং প্রচারক দুর্গানাথ রায় মহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা, আমার নিকট বসিয়া গান কর।" পল্লীর দেবালয়ে উপাসনার ঘন্টা বাজিলে দুর্গানাথবাবু উঠিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, মাতৃদেবী তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা দুর্গানাথ, আজ তুমি আমাকে পার না করিয়া এ-স্থান হইতে উঠিতে পারিবে না।" দুর্গানাথবাবু ক্রমাগত গান করিতে লাগিলেন। তিনিও গানে বেশ যোগ দিতেছিলেন। মনে হইল যেন তিনি ভগবানের নাম-গান করিয়া ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হইতেছেন। একবার আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "এখন আমার মুখে একটু জল দাও, আর আমি কথা বলিতে পারিব না। প্রয়োজন বুঝিয়া তোমরা মধ্যে মধ্যে পরেও আমার মুখে একটু করিয়া জল দিও।" আমি তাঁহার শুষ্ক ঠোঁট ভিজাইয়া দিতে লাগিলাম। মা আমার মুখে ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিতে বড়ই ভালবাসিতেন, তাঁহার অন্তিম মুহূর্ত্তে —

'তোমা' বই কেউ নাই দয়াল হরি
পার কর ভবসিন্ধু দীনবন্ধু দিয়ে অভয় চরণতরী —

এই গানটি ভগ্নকণ্ঠে তাঁহাকে গাহিয়া শুনাইলাম। বেলা বারটার সময় তাঁহার অমর আত্মা নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যধামে চলিয়া গেল। সেই সময়ে দেবালয়ের উপাসনা প্রায় শেষ হইয়াছে। সংবাদ পাইয়া প্রচারকগণ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে ছুটিয়া আসিলেন। সকলেই

মাতৃদেবীকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। উপাসনান্তে ফটো লইবার পর পল্লীস্থ সকলে মৃতদেহ সৎকারের জন্য লইয়া গেলেন। আমরা মাতৃশূন্য গৃহে অন্ধকারে পড়িয়া রহিলাম। তাঁহার প্রিয় জামাতাকে টেলিগ্রাম করা হইল। তিনি টেলিগ্রাম পাইয়া তথাকার ব্রাহ্মদের ডাকিয়া উপাসনা করিলেন এবং সকলে মিলিয়া হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিলেন। পরে জামাতা ছুটিতে ঢাকা আসিলে অতি সমারোহে তাঁহার পবিত্র শ্রাদ্ধকার্য্য সুসম্পন্ন হইল।

সরযূর প্রথমা কন্যার জন্ম

১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর ৫৭নং ল্যান্সডাউন রোডে সরযূর একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। তাহাকে পাইয়া আমরা সকলেই অতিশয় আনন্দিত হইলাম। বহুকাল পরে গৃহে শিশুর আবির্ভাবে নব প্রাণের সঞ্চার হইল। স্বামী সেই সময় বাঁকুড়ার জজ্ ছিলেন। দৌহিত্রীর বয়স সাত মাস হইলে তাহাকে লইয়া আমরা সকলে বাঁকুড়া রওয়ানা হইলাম। মাতামহ নবজাত দৌহিত্রীকে পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন।

৫৭নং ল্যান্সডাউন রোডেই ইহার কিছুকাল পরে দ্বিতীয়া দৌহিত্রীর জন্ম হইল। স্বামীকে তারযোগে সুসংবাদ পাঠান হইল। তিনি প্রতি-টেলিগ্রামে অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। প্রথমা দৌহিত্রীর নাম মাতামহ সুজাতা দিলেন। তিনি বুদ্ধদেবকে অতিশয় ভক্তি করিতেন। কথিত আছে, বুদ্ধদেব অনাহারে তপস্যা করিয়া যখন কঙ্কালসার হইয়াছিলেন, সেই সময় সুজাতা পায়সান্ন আহার করাইয়া তাঁহার দেহে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। অপরা দৌহিত্রীর নাম সুধীরা দেওয়া হয়। এই নামটি আমিই দিই। দাদামহাশয় আদর করিয়া তাহাকে কমলমণিও ডাকিতেন। দুইটি দৌহিত্রীর নামকরণই এক সময়ে হয়। এই উপলক্ষে সাধারণ ও নববিধান সমাজের সকল প্রচারক ও ব্রাহ্মগণ নিমন্ত্রিত হয়েন, আহারাদি দুইদিনে সম্পন্ন হয়।

বাঁকুড়া যাত্রা

কিছুদিন পরে দৌহিত্রীদ্বয়কে লইয়া পুনরায় বাঁকুড়া গেলাম। প্রথমা সেই সময়ে আড়াই বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে, অনেক কথাবার্ত্তা বলিতে শিখিয়াছে। কি ইংরাজ কি বাঙ্গালী সকলেই তাহাকে লইয়া আমোদ করিতেন। কনিষ্ঠা দৌহিত্রী তখন নিতান্ত শিশু। তাহার হাসিতে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। শিশুর হাসির মতন সুন্দর জিনিষ পৃথিবীতে আর কি আছে।

এই সময়ের একটি ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। স্বামী একদা স্থানীয় ইংরাজ ও বাঙ্গালী কয়েকজনাকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা 'তের'তে দাঁড়াইল। ইংরাজেরা তের সংখ্যাটিকে অশুভ মনে করেন। স্বামী ভাবিয়া দেখিলেন, ইংরাজদের যখন সংস্কার আছে তেরজন এক টেবিলে বসিয়া আহার করিলে কাহারও অমঙ্গল হয়, তখন মনে আশঙ্কা লইয়া আহার করান উচিৎ হইবে না। তিনি সরলভাবে দুই একজন ইংরাজ মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিমন্ত্রিতের সংখ্যা তের হইয়াছে, বল ত কি করা যায়? আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের অবশ্যই তের সংখ্যা লইয়া কোন সংস্কার নাই, কিন্তু তোমাদের ত' আছে জানি।" তখন একজন মহিলা বলিলেন, "এক কাজ কর, তোমার grand daughterকে একখানি চেয়ারে বসাইয়া দাও। তাহা হইলেই চৌদ্দজন হইবে।" মহিলাটির এই প্রস্তাবে স্বামী হাঁফ

ছাড়িয়া বাঁচিলেন। টেবিলে চৌদ্দজনার স্থান করা হইল। বালিকা সুজাতা ইহার পূর্ব্বে কখনও এইরূপ টেবিলে বসে নাই, তাহার আমোদের অন্ত রহিল না। খানসামারা তাহার সম্মুখেও একখানি 'সুপ-প্লেটে' খানিকটা 'সুপ' দিয়া গেল। এক চামচ সুপ গ্রহণ করিয়াই বালিকা বলিল, "আজকার দুধটা খুব মিষ্টি।" ইহার পূর্ব্বে তাহাকে কখনও সুপ খাইতে দেওয়া হয় নাই। দুধ, রুটি, অল্প খানিকটা ভাত মাখন ও আলু সহ খাইত। দুধের মুখে নোন্‌তা জিনিষ ভালই লাগে, তজ্জন্য সেইদিনকার দুধ (সুপ) তাহার অত্যন্ত মিষ্টি লাগিল। সে একটু সুপ ও একটু পুডিং দ্বারা তাহার ডিনার শেষ করিল। বালিকার উপস্থিতিতে সেইদিনকার ডিনার প্রাণময়ী হইয়া উঠিয়াছিল।

ইহার পর স্বামীকে গভর্ণমেন্ট রাজসাহীতে বদ্‌লী করিলেন। আমাদের কলিকাতায় রাখিয়া তিনি কর্ম্মস্থানে গেলেন। কতকগুলি অসুবিধার জন্য আমাদ্দিগকে লইয়া যাইতে পারিলেন না। রাজসাহীতে যাইয়া কিন্তু অল্প কয়েকমাস পরেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। আমাদের ঘুণাক্ষরেও কিছু জানাইলেন না, ভাবিলেন, হয়ত মিথ্যা ব্যস্ত হইয়া পড়িব। হঠাৎ একদিবস অসুস্থতার বিষয় জানাইয়া আমাকে লিখিলেন, "আমিই retire করিয়া শীঘ্র কলিকাতা যাইতেছি, তোমাদের আসিবার প্রয়োজন নাই।"

সেই সময় রাজসাহী যাওয়া কষ্টসাধ্য হইলেও স্বামীর অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া কি স্থির থাকিতে পারা যায়! শ্রীমান্ সুবোধকে বলিলাম, "আমাকে আজই লইয়া চল।" কিন্তু আমার শরীরও বিশেষ ভাল ছিল না; সেইজন্য সেই দিবস সুবোধচন্দ্র আমাকে লইয়া গেলেন না। তাহার পরদিবস আমরা রাজসাহী যাত্রা করিলাম। শিয়ালদহ পৌঁছিয়া সুবোধকে বলিলাম, "রাজসাহীতে একখানি টেলিগ্রাম করিয়া দাও; তাঁহাকে জানাইয়া না গেলে গাড়ী আসিবে না, আমাদের তাহা হইলে অসুবিধায় পড়িতে হইবে।" সুবোধচন্দ্র বলিলেন, "দামুকদিয়া ঘাটে যাইয়া টেলিগ্রাফ করা যাইবে।" কিন্তু দামুকদিয়া ঘাটে পৌঁছিয়া চেষ্টা সত্ত্বেও টেলিগ্রাম করা গেল না। ষ্টীমারের সারেং বলিল, "এস্থান হইতে টেলিগ্রাফ আফিস বহুদূরে। জাহাজ শীঘ্রই ছাড়িয়া দিতে হইবে, কাজেই এ-স্থান হইতে টেলিগ্রাম করা সম্ভবপর হইবে না।" ফলে স্বামী জানিতে পারিলেন না আমরা রাজসাহী রওয়ানা হইয়াছি।

এদিকে যথাস্থানে আসিয়া জাহাজ লাগিল। এইবার নামিতে হইবে। আমাদের যে টেলিগ্রাম করা হয় নাই, গাড়ীও আসে নাই, জাহাজের সারেং তাহা জানিত। সে সুবোধকে বলিল, "যত শীঘ্র পারেন একখানা গাড়ী ঠিক করিয়া ফেলুন।" কিন্তু ভাড়া লইবার জন্য তথায় কোন গাড়ীই ছিল না। যে দুই একখানি গাড়ী ছিল, জাহাজ হইতেই দুই একজন ভদ্র পরিবার নামিয়াছেন, তাহাদের জন্য বন্দোবস্ত করা। ইতিমধ্যে একজন বলিলেন, "একটি ভদ্রলোকের পরিবার আসিবার কথা ছিল, তাঁহারা আসেন নাই, আপনারা ঐ গাড়ীতেই উঠিয়া পড়ুন।" কিন্তু পরক্ষণেই দেখা গেল, সেই ভদ্রলোকের পরিবার জাহাজ হইতে নামিতেছেন। তখন সারেং বলিল, "আপনারা দুইখানি গোরুরগাড়ীই ঠিক করিয়া ফেলুন, নচেৎ এইস্থানে রাত্রি যাপন করা বিপজ্জনক হইবে।" আমরা মনে করিতেছিলাম সঙ্গের ভৃত্যটিকে রাজসাহী পাঠাইয়া গাড়ী আনাইব, কিন্তু তাহাতেও গণ্ডগোল;শুনা গেল, সেই স্থান হইতে সহর বহুদূরে। ভৃত্য হাঁটিয়া যাইয়া গাড়ী আনিতে গেলে রাত্রি ভোর হইবে। তখন গোরুরগাড়ীও প্রায় সব ভাড়া হইয়া আসিয়াছে, আমরা অতি কষ্টে দুইখানি গাড়ী পাইলাম। এইরূপ গো-শকটে

কখনও উঠিব বলিয়া ভাবি নাই, তথাপি গাড়ীতে আরোহণ করিয়া আরামের নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলাম। দেরীই হোক্ বা অস্বাচ্ছন্দ্যই হোক্, ইহাই এখন আমাদের নিরাপদ স্থানাভিমুখে লইয়া যাইবে। রাস্তাগুলি যেন সবই উঁচুনীচু। জলকাদায় কতবার যে গো-যানের চক্র আটকাইয়া গেল, কত খাদই যে উত্তীর্ণ হইলাম, তাহা বর্ণনা করিতে গেলে মহাভারত হইয়া দাঁড়ায়। প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই আশঙ্কা হইতেছিল গাড়ী উল্টাইয়া যাইবে। গাড়োয়ানকে বলিয়া দেওয়া হইল সহরে পৌঁছিয়াই ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডায় আমাদের নামাইয়া অশ্বযানে তুলিয়া দিবে। অতি কষ্টে যখন আমরা সহরে পৌঁছিয়া যান বদল করিলাম তখন তৃপ্তির আনন্দে পূর্ব্বের সমস্ত অসুবিধা এবং কষ্ট ভুলিয়া গেলাম। গাড়োয়ানকে বিশেষ কিছুই বলিতে হইল না, সে জজসাহেবের কুঠীতে আমাদের পৌঁছাইয়া দিল। আমাদের গাড়ীখানা যখন গাড়ীবারান্দায় গিয়া থামিল, দেখিলাম সম্মুখের আহারের ঘরে স্বামী আফিস হইতে আসিয়া চা পান করিতেছেন, তাঁহার নিকট একটি যুবক বসিয়া আছে। গাড়ী থামিতেই চাপরাসী আসিয়া জিনিষ-পত্র নামাইল। স্বামী একজন চাপরাসীকে বলিলেন, "গাড়োয়ানকে ভাড়া দিয়া বিদায় কর।" সে তাহাকে জাহাজঘাট হইতে আসিয়াছে মনে করিয়া তিন চারি টাকা দিতে গেল। গাড়োয়ান টাকা ফেরৎ দিয়া বলিল, "আমি ত ঘাট হইতে লইয়া আসি নাই, অত টাকা কেন দিতেছ?" সে আট কি দশ আনা লইয়াই বিদায় হইল। চাপরাসী স্বামীকে এই কথা বলাতে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বলা বাহুল্য, চাপরাসীটিও মনে মনে ভাবিল, তবে মেমসাহেব কিরূপে এতখানি পথ আসিলেন? স্বামীর কোন কথাই জানিতে বাকী রহিল না। পরদিবস শুনা গেল সহরে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে, জজসাহেবের মেমসাহেব গোরুরগাড়ীতে করিয়া অতিকষ্টে রাজসাহী পৌঁছিয়াছেন। যাহা হউক, যদিও স্বামী আমাকে অল্পদিনের জন্য যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি আমাদের আগমনে তাঁহার যে আনন্দ বর্দ্ধিত হইল তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। আমি যাইবার পর স্বামী বোধহয় আরও একমাস কার্য্য করেন।

ইতিমধ্যে স্বামীকে একবার মালদহ সেশনে যাইতে হয়। আমিও তাঁহার সঙ্গে গেলাম। মালদহে এই আমার প্রথম আগমন। ষ্টীমার হইতে আম্রবৃক্ষগুলি প্রকাণ্ড বটগাছের মতন দেখাইতেছিল। আমরা সার্কিট হাউসে যাইয়া উঠিলাম। সেইখানেই কাছারী হইল। আমি ঘরের অভ্যন্তর হইতে সব আসামীদেরই কাঠগড়ার মধ্যে দেখিতে পাইলাম। ইহাদের দুরবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত কষ্ট হইল।

আমরা একদিবস ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাড়ী দেখা করিতে গেলাম। সাহেব তখনও আফিস হইতে ফিরেন নাই। মেমসাহেবটি সদ্য বিলাত হইতে আসিয়াছেন, কোন বাঙ্গালীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয় নাই। কাজেই আমাদের দেখিয়া তাঁহার অত্যন্ত কৌতূহল হইল। স্বামীর আফিস হইতে ফিরিতে পাছে দেরী হয়, সেইজন্য তিনি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া 'গেট' পর্য্যন্ত ক্রমাগত যাওয়া-আসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বামী আসিবামাত্র তিনি 'গেটের' কাছে দৌড়াইয়া যাইয়া আমাদের আগমনবার্ত্তা তাঁহাকে দিলেন। তিনি আমাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আমাদের লইয়া সমস্ত বাড়ীটি দেখাইলেন। তাঁহার আফিস-ঘরটি জুড়িয়া একটি মশারী। তাহার ভিতর টেবিল, চেয়ার ও আলো। সেখানে এত মশা, যে মশারীর ভিতর টেবিল, চেয়ার ও আলো রাখিয়া কাজ করিতে হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ও তাঁহার স্ত্রী আমাদের পরদিবস 'ডিনারে' নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে

পারিলাম না, কারণ পরদিবস মধ্যাহ্নেই আমাদের মালদহ ত্যাগ করিতে হইল। তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

রাজসাহীতে ফিরিয়া আসিয়া আমরা কিছুদিন তথায় ছিলাম। মিষ্টার মজিদ্ আমার স্বামীর কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। একদিন মজিদ্ সাহেব আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ত' বেশ আছেন, তবে কেন কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছেন?" উত্তরে স্বামী হাসিয়া বলিলেন, "মিসেস্ সেন আসিয়া আমাকে রান্না করিয়া খাওয়াইয়া মোটা করিয়াছেন;ইত্যাদি।"

স্বামী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করাতে রাজসাহীর সকলেই দুঃখিত হইলেন। এমন কি চাপরাসীরা পর্য্যন্ত বলিতে লাগিল, "কত জজ্ আসেন, কত জজ্ যান, এরূপ জজ্ আর কখনও দেখি নাই।" জজ্সাহেবের জন্য সকলেই কাঁদিয়া আকুল। চলিয়া আসিবার দিবস গাড়ী খানিক দূর আসিবার পর দেখা গেল, একটি লোক পশ্চাতে প্রাণপণ ছুটিয়া আসিতেছে। সেই লোকটি আমাদের গোয়ালা, বাড়ীতে মাখন তৈয়ার করিত। তাহার নিকট আমাদের একখানা ঝাড়ন ছিল, তাহা ভ্রমক্রমে আমাদের সঙ্গে দেওয়া হয় নাই। সেইখানি লইয়াই সে প্রাণপণ দৌড়াইয়া আসিয়াছে। তখন ভৃত্যদের নিকট যেরূপ ব্যবহার পাইয়াছি, আজকাল তাহার বিপরীত। সময় অগ্রসর হইয়া স্বার্থপরতার রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, প্রভুভক্তি যে শ্লথ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও রাজসাহীতে আমার স্বামীই ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। একদিবস তাঁহার সহিত ব্রহ্মমন্দিরে গিয়াছিলাম। সুগায়ক ও কবি রজনীকান্ত সেন মহাশয় গান করিলেন। তাঁহার সুললিত কণ্ঠের অপূর্ব্ব সঙ্গীতে সেইদিনকার উপাসনা প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

স্বামী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতা আসিলেন। ৫৭নং ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ীটি তিনি যত্নের সহিত প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সেই বাড়ীতেই আমরা আসিয়া উঠিলাম। কিন্তু অবসর গ্রহণ করিয়া কোথায় তিনি বিশ্রাম করিবেন, না আরও অধিক পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। ভবানীপুর ব্রাহ্ম-সম্মিলন সমাজের আচার্য্যের কার্য্য তিনিই প্রায় প্রতি রবিবারে করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে তাঁহার শারীরিক ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া আমি অনেক সময়ই বাধা দিতাম। কিন্তু তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেন না। কেহ উপাসনা করিতে হইবে বলিলে কিছুতেই তিনি তাহাকে নিরাশ করিয়া 'পারিব না' বলিতে পারিতেন না। কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর আমরা একবার ঢাকায় যাই। তথায় আমাদের বিধান-পল্লীর বাটীতে সাত আট দিবস ছিলাম। সেখানেও তাঁহাকে একটি বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল। তাঁহার উপাসনা ও বক্তৃতা শুনিতে সকলেই ভালবাসিতেন। কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্যের কথাও ত ভাবিয়া দেখা উচিত। আমি বাধা দিলে তিনি বলিতেন অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া থাকিয়া লাভ কি?

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রতি স্বামীর ভক্তি চিরদিন অটুট্ ছিল। তিনি তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মগণ যখন দুইটি সমাজ করিলেন, তখন তিনি কোন দলেই যোগদান করেন নাই। তিনি বলিতেন যে তিনি আচার্য্য কেশবচন্দ্রের কাছে দীক্ষিত হইয়াছেন, ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের তিনি সভ্য;অতএব পরের দলাদলির ভিতর তিনি থাকিবেন না, দুই সমাজেই সমভাবে যোগদান করিবেন। বস্তুতঃ নববিধান ও সাধারণ, দুই ব্রাহ্মসমাজেরই প্রচারক ও বন্ধুদিগকে তিনি সমভাবে শ্রদ্ধা ভালবাসা দান করিতেন। তাঁহার ধর্ম্ম মিলনের ধর্ম্ম ছিল।

বুদ্ধদেবের প্রতিও স্বামীর প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। বুদ্ধদেবকে কেহ নিরীশ্বরবাদী বলিলে তাঁহার প্রাণে অত্যন্ত আঘাত লাগিত। তিনি বুদ্ধদেবের বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার অভিপ্রায়ে ধর্ম্মানন্দ কোসম্বি নামক একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে নিজ বাটীতে কিছুকাল রাখিয়া পালি ভাষা শিক্ষা করেন এবং *East* নামক কাগজে বুদ্ধদেবের বিষয়ে কতকগুলি articles লেখেন। বিখ্যাত বৌদ্ধ-প্রচারক অনাগারিক ধর্ম্মপাল মহাশয় সেই সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হ'ন এবং আমাদের বাটীতে আসিয়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি শেষ জীবনে ছাত্রের ন্যায় অধ্যবসায়ের সহিত হিন্দু ও বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ ও বিশেষভাবে বৌদ্ধ ও বৈদিক ধর্ম্ম আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।

সেকালের ব্রাহ্মগণ যে কেবলমাত্র উপাসনা ও বক্তৃতা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন তাহা নহে। সকল বিষয়েই তাঁহারা চিন্তা করিতেন। ১৯০৫ সালে যখন Bengal Partition হয় তখন সকল ব্রাহ্মদের প্রাণেই, বিশেষ করিয়া স্বামীর প্রাণে অতিশয় আঘাত লাগিয়াছিল। আমার বেশ মনে পড়ে, সেই সময় আমরা শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের বাড়ীতে ঘনঘন যাইতাম এবং শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত পার্টিশান ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিতাম। মনে দুঃখ উপস্থিত হইলেই হউক অথবা সুখী অবস্থাতেই হউক, বন্ধুবান্ধবদের সহানুভূতি লাভ করিবার জন্য মানবপ্রাণ স্বভাবতঃই ব্যাকুল হয়;কারণ তাহাতে দুঃখের লাঘব ও সুখ বর্দ্ধিত হয়। দেশের এই দুর্দ্দশায় স্বামীর প্রাণে যে দুঃখের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা কেবলমাত্র বন্ধুদের নিকট জ্ঞাপন করার মধ্যেই পরিসমাপ্ত হয় নাই, ভগবানের চরণেও তিনি সেই দুঃখ নিবেদন করেন। কতিপয় বন্ধুবান্ধবকে আহ্বান করিয়া তিনি ৫৭নং ল্যান্সডাউন্ রোডস্থ স্বীয় বাটীর সুপরিসর ছাদে সম্মিলিত উপাসনা করিলেন।... একমাত্র ভগবানই আমাদের সকল দুঃখ দূর করিতে পারেন; আর আমরা কাহার নিকট দুঃখের হিসাব লইয়া উপস্থিত হইব?

দার্জ্জিলিং যাত্রা

যাহা হউক, বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আমরা দার্জ্জিলিং গেলাম। ১৯০১ সালে যখন স্বামী রংপুরে ছিলেন তখন প্রথম দার্জ্জিলিং আসিয়াছিলাম। সেই সময় যখন শিলিগুড়ীতে আসিয়া ছোট গাড়ীতে উঠিলাম, তখন মনে হইয়াছিল যেন কোন নূতন সৃষ্টিতে যাইতেছি। গাড়ীখানি আঁকিয়া বাঁকিয়া পাহাড়ের উপর উঠিতে লাগিল। উভয়পার্শ্বে বিচিত্রবর্ণের ফুল ও ফার্ণগাছগুলি এতই নিকটে জন্মাইয়াছিল যে, হাত বাড়াইয়া তাহাদের চয়ন করিতে চেষ্টা করিলাম। সেইবার ষ্টেশনে নামিয়া প্রথমে আমরা একটি হোটেলে উঠিয়াছিলাম। কিন্তু সেখানে থাকার অসুবিধা হওয়ায় পরে 'রুবি হল' ভাড়া করিয়া তথায় উঠিয়া যাই। আমরা দার্জ্জিলিং গিয়াছি শুনিয়া প্রচারক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার কার্সিয়াংএর বাড়ী হইতে দার্জ্জিলিং আসিলেন। স্বামী তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন, মজুমদার মহাশয়ও স্বামীকে অতিশয় স্নেহ করিতেন, আমাদের বাড়ীতে যখন রাত্রিতে আহারে বসিলেন, তখন স্বামীকে নাম ধরিয়া বলিলেন, "তোমার বাড়ীতে যেমন সুন্দর সুপ্‌টি হয়, তেমন আর কোথায়ও খাই নাই।" তাঁহার শরীর রুগ্ন ছিল। কাজেই আহার্য্য বস্তু তাঁহার নিকট ভাল লাগিল, ইহাতে আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। এইরূপ বর্দ্ধমানেও তিনি দুইবার পত্নীসহ আমাদের বাড়ী আসিয়া কিছুদিন ছিলেন। স্বামী

তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া এবং তাঁহার উপাসনা ও আরাধনা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিতেন।

মজুমদার মহাশয় যিশুখ্রীষ্টকে অতিশয় সম্মান করিতেন। X'mas দিবসে তাঁহার বাটীতে বিশেষ উপাসনা হইত। স্বামী অতি প্রত্যুষে উঠিয়া এক তোড়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট গোলাপফুল ক্রয় করিয়া তাঁহার জন্য লইয়া যাইতেন। তিনি গোলাপফুলগুলি পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন এবং উপাসনার ঘরে সাজাইয়া রাখিতেন।

শ্রীযুক্ত মজুমদার মহাশয় স্বামীকে কিরূপ ভালবাসিতেন তাহা তাঁহার একটি কথাতেই বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। স্বামী যখন একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তিনি শেষ প্রণাম করিয়া বিদায় লইবার সময় মজুমদার মহাশয় বলিলেন, "আবার দেখা হইবে কিন্তু কোথায় কি অবস্থায় বলিতে পারি না।" ইহার পরে আর স্বামীর সহিত ইহলোকে সাক্ষাৎ হয় নাই। তাঁহার পরলোক গমনের সংবাদ শ্রবণমাত্রই স্বামী বলিলেন, "এ পৃথিবী হইতে তিনি চলিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি আমাকে বলিয়া গিয়াছেন আবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।" পরেও মাঝে মাঝে স্বামী ঐ কথা বলিতেন। ... কী আশার কথা, কী ভালবাসার টান। স্বামী যে একাকীই তাঁহার স্নেহের অধিকারী হইয়াছিলেন তাহা নহে, আমিও তাঁহার স্নেহলাভে বঞ্চিত হই নাই। তাঁহারা পতিপত্নী উভয়েই আমাদের দুইজনাকে সন্তানবৎ স্নেহ করিতেন। তাঁহার পত্নীর শোচনীয় মৃত্যুতে আমি হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছিলাম। এখন স্বামীসহ ঊর্দ্ধলোকে মিলিত হইয়া সুখে আছেন, ইহাই আমাদের সান্ত্বনা।

ভ্রাতৃসম স্নেহের সুবোধচন্দ্র মহলানবীশও সেই সময় আমাদের সহিত কয়েক দিবস দার্জ্জিলিংএ থাকিয়া আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। দার্জ্জিলিংএও স্বামীকে ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য্যের কাজ করিতে হইত। তখনকার ব্রহ্মমন্দির হাটের মধ্যে অবস্থিত ছিল। আমরা উপাসনার পরে হাট হইতে নানাবিধ দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া কুলীর ঘাড়ে চাপাইয়া বাড়ী ফিরিতাম। এইরূপ বাজার করিতে অত্যন্ত আনন্দ বোধ হইত।

দার্জ্জিলিংএ স্বামীর সহিত একদিবস ময়ূরভঞ্জের মহারাজার ভবনে বেড়াইতে যাইয়া দরজার সম্মুখেই সংবাদ পাইলাম, এইমাত্র মহারাণী সুচারুদেবীর একটি পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। ঐ শুভসংবাদ শ্রবণে আমরা আর সেই দিবস তাঁহাদের বিরক্ত করিব না মনে করিয়া বাড়ী ফিরিতে উদ্যত হইলাম। মহারাজা আমাদের দেখিতে পাইয়া ডাকিয়া ড্রয়িংরুমে বসাইলেন এবং স্বামীর সহিত গল্প করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে আমরা মহারাজার নিকট বিদায় লইলাম।

ইহার পর যে দিবস আমি শিশু রাজকুমার ধ্রুবেন্দ্রকে দেখিতে যাই, আমার স্নেহের ভগিনী সুচারু nurseকে ডাকিয়া বলিলেন, "এঁ'র কোলে ছেলে দাও; ইনি আমাকে কোলে করিয়াছিলেন, আমার ছেলেকেও কোলে করুন।" আমি শিশুটিকে ক্রোড়ে লইয়া আশীর্ব্বাদ করিলাম। ধর্ম্ম সম্বন্ধে যিনি আমার সহোদরা ভগিনীর ন্যায়—বালিকা বয়সে যাঁহাকে ক্রোড়ে লইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, আজ তাঁহার পুত্রকেও আমি ক্রোড়ে লইতেছি—এ আনন্দ কোথায় রাখিব? ভগবান তুমি ধন্য। কিছুদিন পরে স্বামীর স্বাস্থ্য যথাসম্ভব সারিলে আমরা কলিকাতা ফিরিয়া আসিলাম। ইহার পর প্রতি বৎসরই ঐ সময়ে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আমরা দার্জ্জিলিং যাইতাম।

প্রথম দৌহিত্রের জন্ম

১৯১০ খৃষ্টাব্দের ১লা মে রবিবার প্রভাতকালে প্রথম দৌহিত্র শ্রীমান্ সুকুমারচন্দ্রের জন্ম হইল। ঐ দিবস তাহার মাতামহ ভবানীপুর সম্মিলন সমাজে উপাসনা করিবেন স্থির ছিল। কিন্তু উদ্বিগ্ন মন লইয়া সমাজে উপাসনা করিতে যাওয়া ঠিক হইবে না ভাবিয়া তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন, "আজিকার উপাসনার কার্য্য তোমরা কেহ কর। আমি বিশেষ প্রতিবন্ধক বশতঃ অদ্য মন্দিরে যাইতে পারিব না।" — পত্র লিখিয়া পাঠাইবার অল্পকাল পরেই শ্রীমান্ সুকুমারের শুভ-মুহূর্ত্তে জন্ম হইল। তিনি এই মঙ্গল সংবাদ শ্রবণে নিশ্চিন্ত চিত্তে ব্রহ্মমন্দিরে যাইয়া উপাসনার কার্য্য সমাধা করিলেন।

আলমোড়া যাত্রা

প্রথম দৌহিত্রের আগমনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দে কোথায় সমস্ত গৃহ পরিপূর্ণ থাকিবে, তাহার পরিবর্ত্তে অল্পদিবস পরেই বিষাদের ছায়া পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। স্বামী অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। একদিবস কি ভাবিয়া তিনি দৌহিত্রকে স্নেহচ্ছলে বলিলেন, "দাদুমণি! কেহ আসে, কেহ যায়।" ঐ বাক্য শ্রবণে অজানিতে আমার বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া উঠিল। অসুখ ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। দার্জ্জিলিং যাওয়া এইবারও স্থির হইল। বাড়ী পর্য্যন্ত ভাড়া হইয়া গিয়াছে, এমন সময় চিকিৎসক বলিলেন, "আলমোড়া পাহাড় দার্জ্জিলিং অপেক্ষা উপযোগী হইবে।" তাঁহার নির্দ্দেশানুযায়ী আলমোড়া পাহাড় যাইবার জন্য আমরা প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। বৈবাহিক শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয় এবং ডাক্তার মিসেস্ বিমলচন্দ্র ঘোষ সঙ্গে আলমোড়া চলিলেন। তাঁহারা অগ্রে সর্ব্ববিষয়ে সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য রওনা হইলেন। বৈবাহিক মহাশয়ের কথা না হয় নাই ধরিলাম, কিন্তু মিসেস্ ঘোষ ভগিনীর ন্যায় আমার স্বামীর যেরূপ সেবা করিয়াছেন, তাঁহার সেই ভালবাসার ঋণ আমি কখনই পরিশোধ করিতে পারিব না। ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষও আমার স্বামীকে দেখিতে আলমোড়া যান।

মাননীয় চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয় আমাদের জন্য অতি সুন্দর একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি ও তাঁহার পত্নী আমাদের জন্য কত যে করিয়াছিলেন তাহা লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা কঠিন। আমাদের এই বাসাটি তাঁহাদের বাটী হইতে বিশেষ দূরে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও প্রথম দিন আমাদের আহার্য্য তাঁহাদের বাটী হইতেই পাঠাইয়া দিলেন। পরে সর্ব্বদা আসিয়া স্বামীর সংবাদ লইতেন ও নানাপ্রকারে সাহায্য করিতেন। স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণও কেহ কেহ স্বামীকে দেখিতে আসিতেন। Mr. Pannalal নামক জনৈক ভদ্রলোক আলমোড়ার ডেপুটি কমিশনার ছিলেন। তাঁহার সহিত আমরা পূর্ব্বে পরিচিত ছিলাম না। Dr. Mrs. Ghose -এর সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তিনি সর্ব্বদা আমার স্বামীকে আসিয়া দেখিতেন। ডাক্তার স্বামীকে বিশুদ্ধ মাখন খাইতে বলেন। বাজারে ক্রয় করা মাখন বিশুদ্ধ নয় বলিয়া Mr. Pannalal তাঁহার নিজের খাইবার ভাল মাখনটুকু আমার স্বামীকে পাঠাইয়া দিতেন। একদিবস কথাচ্ছলে তিনি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "Mr. Sen, আপনি মাখনটা সব খান্ ত?" স্বামী বলিলেন, "সবটা খাই না, খানিকটা খাই।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "আমি নিজে না খাইয়া আপনাকে পাঠাই আর আপনি সবটা খান্ না!" অবশ্য স্বামীকে সবটা খাওয়াইবার জন্যই তিনি এইরূপ বলিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া আমি স্বামীকে অনুযোগ করিয়া বলিলাম, "দেখ ত উনি নিজে

না খাইয়া তোমার জন্য মাখনটুকু পাঠাইতেছেন, আর তুমি সবটুকু খাইতে পার না?" সেই দিবস হইতে খাইতে কষ্ট হইলেও সবটা মাখন গলাধঃকরণ করিতে চেষ্টা করিতেন। দুঃসময়ে এই সকল বিদেশী ভদ্রলোকদের আমার স্বামীর প্রতি সহৃদয়তা ও সহানুভূতির কথা স্মরণ হইলে কৃতজ্ঞতায় প্রাণ ভরিয়া যায়।

আমাদের সহিত কন্যা সরযূ, জামাতা সুবোধচন্দ্র, তাঁহাদের কন্যা দুইটি এবং শিশুপুত্র সুকুমার আলমোড়া আসিয়াছিল। আমার ভাসুর পুত্রবধূও আমাদের সহিত আলমোড়া যান। সুবোধচন্দ্র স্থির করিয়াছিলেন, শিশু সুকুমারচন্দ্রের যে দিবস দন্তোদ্গম হইবে, সেইদিন তাহার অন্নপ্রাশন করিতে হইবে। তিনি আলমোড়া হইতে চলিয়া আসিবার পরদিবসই তাহার দন্তরেখা নির্গত হইল। কাজেই পায়সান্ন প্রস্তুত হইল। পিতামহ উপাসনা করিয়া এক চামচ পায়সান্ন শিশু পৌত্রের মুখে তুলিয়া দিলেন। তৎপরে পায়েসের পাত্রসহ শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া মাতামহের শয্যাপার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইলাম। তিনি সজল নয়নে অতি আদরের দৌহিত্রের মুখে এক চামচ পায়েস তুলিয়া দিলেন। স্মৃতিপটে সেই করুণ চিত্রটি আজিও অঙ্কিত রহিয়াছে। বৈবাহিক মহাশয় ইহার অল্প কয়েক দিবস পরেই লক্ষ্ণৌ চলিয়া গেলেন। আমরা প্রায় তিন মাস আলমোড়া রহিলাম। কিঞ্চিৎ উপকারও দর্শাইতে লাগিল। কিন্তু ডিসেম্বর মাসের প্রারম্ভেই শীতের ও বরফের প্রাদুর্ভাবে ডাক্তার ঘোষের নির্দ্দেশমতন লক্ষ্ণৌ চলিয়া আসিলাম।

বৈবাহিক মহাশয় ষ্টেশনে আসিয়া আমাদিগকে একটি হোটেলে লইয়া গেলেন। তৎপরে তাঁহার এক আত্মীয় বিজ্ঞ ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ওহ্‌দেদার মহাশয়ের বাটীসংলগ্ন একটি বাসা আমাদের জন্য ঠিক করিয়া তথায় আমাদিগকে লইয়া যান। ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ওহ্‌দেদার মহাশয় অতি যত্নের সহিত স্বামীর চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। বাটী সংলগ্ন হওয়াতে যখনই আমাদের আবশ্যক হইত, তিনি আসিয়া স্বামীকে যত্নপূর্ব্বক দেখিয়া যাইতেন। কত লোকই যে স্বামীর স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে অবাক হইয়া যাই। কিন্তু হায়! এতগুলি লোকের প্রাণপণ চেষ্টায়ও তাঁহাকে পৃথিবীতে ধরিয়া রাখা গেল না। Dr. Mrs. Ghoseও কিছু দিবস পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌ তাঁহার শ্বশ্রূমাতার নিকট আসিয়াছিলেন। আমরা লক্ষ্ণৌ আসিলে তিনি প্রতিদিন আমাদের বাটী আসিয়া স্বামীকে দেখিতেন। তাঁহার সাহায্য ও সহানুভূতির কথা এ-জীবনে ভুলিতে পারিব না।

লক্ষ্ণৌতে মাস দুই থাকিয়া পুনরায় আলমোড়া ফিরিয়া যাইবেন, ডাক্তার এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামী কিছুতেই আর আলমোড়া যাইতে রাজী হইলেন না। তাঁহার প্রিয় বাসভবনে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কাজেই তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী বাধ্য হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার ডাক্তার বলিলেন, "কলিকাতা না থাকিয়া sea-sideএ যাইয়া থাকিলে ভাল হয়।" তখন ওয়ালটেয়ারে সমুদ্রতীরে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া তাঁহাকে লইয়া গেলাম। কলিকাতা ছাড়িবার পূর্ব্বেই শ্রীমান্ সুকুমারের এক বৎসর পূর্ণ হয়। তাহার জন্মদিন উপলক্ষে কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে চা'য়ে নিমন্ত্রণ করা হইল। বৈবাহিক প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয়ও সেই দিবস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনিই উপাসনার কার্য্য করিলেন। কে জানিত পৌত্র ও দৌহিত্রের এই প্রথম জন্মোৎসবই দুই বৈবাহিকের ইহলোকের শেষ কার্য্য হইবে?

১লা মে সুকুমারের জন্মোৎসব ব্যাপার সারিয়া আমরা (বোধহয় ৩রা) ওয়ালটেয়ার যাত্রা করিলাম। শ্রীমান্ সুবোধের এক ভাগিনেয় ধীরেন্দ্রকুমার রায় ও আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী মৃণালবালা আমাদের সহযাত্রী হইলেন। ওয়ালটেয়ারে জনৈক ভদ্রলোক আমাদের যেরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সমস্তই তিনি যত্নের সহিত পাঠাইতেন। স্বামীর নামে কোন পার্শেল আসিলে রসিদের জন্য অপেক্ষা না করিয়া পার্শেল আফিস হইতে বুকিং ক্লার্ক মহাশয়ও পার্শেলটি বাড়ী পাঠাইয়া দিতেন। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিতাম, আমরা বিদেশে আসিয়াছি, পূর্ব্বে ত কেহই আমাদের চিনিতেন না, তথাপি তাঁহাদের এই আত্মীয়তুল্য ব্যবহার ... বোধহয় স্বর্গের সহিত পৃথিবীর এইখানেই মিল।

ছয় মাস আমরা সমুদ্রতীরে বাস করিলাম। কিন্তু স্বাস্থ্যের কোনই উন্নতি দেখা গেল না। এই সময়ে স্নেহের বিধানচন্দ্র বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলেন। অনেকখানি আশা করিয়া তাঁহার জন্য আমরা অপেক্ষা করিতেছিলাম। ওয়ালটেয়ারে আসিয়া বিধান তাঁহাকে দেখিয়া গেলেন। বিধান চলিয়া গেলে স্নেহসজল নয়নে তিনি বলিতে লাগিলেন, "বাবা বিধান, আমাকে ফেলিয়া গেলে?" এদিকে বিধানচন্দ্র কলিকাতা আসিয়াই তাঁহার জন্য একটি nurse পাঠাইয়া দিলেন। নার্শ আসিতেছে শ্রবণে তিনি আমাকে বলিলেন, "আমি কেমন করিয়া নার্শের শুশ্রূষা গ্রহণ করিব?" আমি তাঁহাকে বুঝাইলাম, "দেখ, আমি যদি তোমাকে ভুল ঔষধ দিই; আমার ত' মাথার ঠিক নাই; সেইজন্যই বিবেচনা করিয়া বিধান nurse পাঠাইয়াছেন।"

ইহার পর অল্পদিনই আমরা ওয়ালটেয়ারে ছিলাম। তিনি বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্রকে পত্র লিখিলাম। যে দিবস তাঁহাকে লইয়া যাইতে সুবোধ ওয়ালটেয়ারে আসিলেন, সেদিন রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁহার কি আনন্দ। ৫ই অক্টোবর আমরা কলিকাতা ফিরিলাম। শ্রীমান্ বিধান তাঁহার গাড়ীতে অতি যত্নে ষ্টেশন হইতে বাড়ী লইয়া গেলেন। বৈবাহিক মহাশয়ও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রতিদিবস তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপাসনা করিতে লাগিলেন; স্বামীও উপাসনায় বেশ যোগ দিতেন। একদা বৈবাহিক মহাশয় বলিলেন, "আজ আমরা অন্য ঘরে উপাসনা করিব, ওঁকে স্থির হইয়া থাকিতে দেওয়াই ভাল।" সকলে ভিন্ন কক্ষে উপাসনা করিতে বসিয়াছেন জানিতে পারিয়া, স্বামী উঠিয়া গিয়া উপাসনা-স্থলে উপবেশন করিলেন। সেদিন তিনি প্রার্থনা করিলেন, "এ গৃহ ত গৃহ নয় প্রভু, সত্যিকার গৃহে আমায় যাইতে হইবে। যে গৃহে চিরকাল বাস করিব, যে গৃহে জন্ম মৃত্যু এক হইয়া গিয়াছে, দুঃখ সুখকে আলিঙ্গন করিয়া হাসিতেছে। হে দয়াময়! আজ আমি সেই গৃহে যাইবার জন্য প্রস্তুত, যে গৃহের তুমি গৃহস্বামী।"

বৈবাহিক মহাশয় কিছুদিন পরে বাঁকীপুর চলিয়া গেলেন এবং বলিয়া গেলেন, অবস্থা মন্দ দেখিলে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাম করিতে। কিন্তু তথায় যাইয়া তিনিও অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। স্নেহের বিধান দিবারাত্র স্বামীর সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তিনি নিজের বাড়ী ছাড়িয়া তাঁহার সেবার জন্য আমাদের বাটীতে রহিলেন। কি করিলে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ আরাম দিতে পারেন তাহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল। আমার প্রাণে অনেক সময়ই আশার সঞ্চার হইত, বিধানের এত যত্ন ও সেবা বুঝি বৃথা যাইবে না। বিধান ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয়কেও ডাকিয়াছিলেন।

স্বামীর পরলোকগমন

৫ই তারিখ রবিবার রাত্রিতে বিধান একেবারেই শয্যায় গেলেন না। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "তুমি একটু শোও গিয়ে, আমি কাছে আছি।" বিধান আমাকে মোটেই জানিতে দিলেন না যে স্বামীর অবস্থা খারাপ, তিনি শয্যাপার্শ্বেই বসিয়া রহিলেন। পরদিবস অতি প্রত্যূষে একবার যখন বিশেষ আবশ্যকীয় কার্য্যে বিধান বাটীর বাহিরে গিয়াছেন, আমি স্বামীর শিরোদেশে বসিয়া আছি, বাড়ীর অন্যান্য সকলে তখন নীচের তলায় চা পান করিতে গিয়াছেন। সময় মতন ঔষধ পান করাইয়া স্বামীর ললাটের ঘাম মুছাইয়া দিলাম এবং তৎপরে আর্দ্র বস্ত্র ছাড়াইবার বন্দোবস্ত করিতেছি, এমন সময় স্বামী চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। সুবোধ তখন সবেমাত্র উপরে আসিয়াছেন, ভৃত্য স্বামীর জন্য ঘোল টানিতেছিল, আমি তাহাকে বলিলাম, "আরো দূরে যাইয়া ঘোল টানো। শব্দ আসিতেছে, সাহেব একটু ঘুমাইয়াছেন।" অকস্মাৎ সুবোধ শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। হঠাৎ তাঁহার প্রার্থনা করিবার কারণ প্রথমে বুঝিতে পারিলাম না। স্বামীর কোন কষ্ট যন্ত্রণাই দেখিতে পাই নাই; তিনি যে পরম জননীর ক্রোড়ে চিরদিনের জন্য নিদ্রিত হইলেন আমি তাহা একেবারেই বুঝিতে পারি নাই, যেন যোগী-পুরুষ ধ্যানে মগ্ন হইলেন। কিন্তু অবিলম্বে আমার চমক ভাঙ্গিল; মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইয়াছে। যেমন স্বামীর শিরোদেশে বসিয়াছিলাম, উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় তেমনই বসিয়া রহিলাম। একজন কে আসিয়া আমাকে ধরিয়া মেঝেতে শোয়াইয়া দিলেন। আমি চেতনা হারাইলাম। বিধান তখন বাড়ী ফিরিয়াছেন; তিনি আমার গাত্রে ইন্‌জেকসান্‌ বিদ্ধ করিলেন। ক্রমে সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। বুঝি চেতনা না ফিরিলেই ভাল হইত। বিধানকে দেখিয়া আমি গগনভেদী চিৎকার করিতে লাগিলাম। স্নেহের বিধান যে পুত্রবৎ যত্নে তাঁহার সেবা করিয়াছেন! বিধান নিকটে থাকিলে বুঝি বা স্বামীকে ধরিয়া রাখিতে পারিতাম। হায়! স্বর্গ যাঁহাকে আকিঞ্চন করে, পৃথিবীর মানুষ কতদিন তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবে? আমি সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। আমার সুখ-দুঃখ তাঁহার সহিত প্রস্থান করিল। আজ সেই সুদূরের পানে তাকাইয়া আছি, কবে তাঁহার সহিত পুনরায় মিলিত হইব, কবে আমার সকল দুঃখের প্রকৃত অবসান হইবে।

বৈবাহিক মহাশয়ের স্বর্গারোহণ

স্বামীর স্বর্গারোহণের ঠিক একমাস পরে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর, বৈবাহিক প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয়ও আমাদের শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন। স্বামীর পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার উপস্থিত থাকিবার একান্ত অভিলাষ ছিল কিন্তু চিকিৎসকের অনুমতি না পাওয়াতে তিনি আসিতে সক্ষম হয়েন নাই। তখন তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ, শুদ্ধমাত্র প্রাণের টানেই তিনি আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, স্বর্গের শাশ্বত আনন্দের মধ্যেই তাঁহারা পুনর্মিলিত হইলেন।

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এস্থানে আর একটি কথা মনে পড়িয়া গেল; শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় স্বামীকে কিরূপ ভালবাসিতেন তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। স্বামীর পরলোকগমনের সংবাদ পাইয়া তিনি এতই শোকগ্রস্ত হইয়াছিলেন যে সিঁড়ীতে একজন ধরিয়া তাঁহাকে উপরে তুলিতে হইয়াছিল, এবং স্বামীর শয্যাপার্শ্বে যাইয়া তিনি একেবারে আছাড় খাইয়া পড়িলেন। রক্তের সম্পর্ক না থাকিলেও, ধর্ম্মের কী সুমধুর বন্ধন, কী গভীর ভালবাসা। তাঁহার সহোদর

১লা মে সুকুমারের জন্মোৎসব ব্যাপার সারিয়া আমরা (বোধহয় ৩রা) ওয়ালটেয়ার যাত্রা করিলাম। শ্রীমান্ সুবোধের এক ভাগিনেয় ধীরেন্দ্রকুমার রায় ও আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী মৃণালবালা আমাদের সহযাত্রী হইলেন। ওয়ালটেয়ারে জনৈক ভদ্রলোক আমাদের যেরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সমস্তই তিনি যত্নের সহিত পাঠাইতেন। স্বামীর নামে কোন পার্শেল আসিলে রসিদের জন্য অপেক্ষা না করিয়া পার্শেল আফিস হইতে বুকিং ক্লার্ক মহাশয়ও পার্শেলটি বাড়ী পাঠাইয়া দিতেন। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিতাম, আমরা বিদেশে আসিয়াছি, পূর্ব্বে ত কেহই আমাদের চিনিতেন না, তথাপি তাঁহাদের এই আত্মীয়তুল্য ব্যবহার ... বোধহয় স্বর্গের সহিত পৃথিবীর এইখানেই মিল।

ছয় মাস আমরা সমুদ্রতীরে বাস করিলাম। কিন্তু স্বাস্থ্যের কোনই উন্নতি দেখা গেল না। এই সময়ে স্নেহের বিধানচন্দ্র বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলেন। অনেকখানি আশা করিয়া তাঁহার জন্য আমরা অপেক্ষা করিতেছিলাম। ওয়ালটেয়ারে আসিয়া বিধান তাঁহাকে দেখিয়া গেলেন। বিধান চলিয়া গেলে স্নেহসজল নয়নে তিনি বলিতে লাগিলেন, "বাবা বিধান, আমাকে ফেলিয়া গেলে?" এদিকে বিধানচন্দ্র কলিকাতা আসিয়াই তাঁহার জন্য একটি nurse পাঠাইয়া দিলেন। নার্শ আসিতেছে শ্রবণে তিনি আমাকে বলিলেন, "আমি কেমন করিয়া নার্শের শুশ্রূষা গ্রহণ করিব?" আমি তাঁহাকে বুঝাইলাম, "দেখ, আমি যদি তোমাকে ভুল ঔষধ দিই; আমার ত' মাথার ঠিক নাই; সেইজন্যই বিবেচনা করিয়া বিধান nurse পাঠাইয়াছেন।"

ইহার পর অল্পদিনই আমরা ওয়ালটেয়ারে ছিলাম। তিনি বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্রকে পত্র লিখিলাম। যে দিবস তাঁহাকে লইয়া যাইতে সুবোধ ওয়ালটেয়ারে আসিলেন, সেদিন রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁহার কি আনন্দ। ৫ই অক্টোবর আমরা কলিকাতা ফিরিলাম। শ্রীমান্ বিধান তাঁহার গাড়ীতে অতি যত্নে ষ্টেশন হইতে বাড়ী লইয়া গেলেন। বৈবাহিক মহাশয়ও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রতিদিবস তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপাসনা করিতে লাগিলেন; স্বামীও উপাসনায় বেশ যোগ দিতেন। একদা বৈবাহিক মহাশয় বলিলেন, "আজ আমরা অন্য ঘরে উপাসনা করিব, ওঁকে স্থির হইয়া থাকিতে দেওয়াই ভাল।" সকলে ভিন্ন কক্ষে উপাসনা করিতে বসিয়াছেন জানিতে পারিয়া, স্বামী উঠিয়া গিয়া উপাসনা-স্থলে উপবেশন করিলেন। সেদিন তিনি প্রার্থনা করিলেন, "এ গৃহ ত গৃহ নয় প্রভু, সত্যিকার গৃহে আমায় যাইতে হইবে। যে গৃহে চিরকাল বাস করিব, যে গৃহে জন্ম মৃত্যু এক হইয়া গিয়াছে, দুঃখ সুখকে আলিঙ্গন করিয়া হাসিতেছে। হে দয়াময়! আজ আমি সেই গৃহে যাইবার জন্য প্রস্তুত, যে গৃহের তুমি গৃহস্বামী।"

বৈবাহিক মহাশয় কিছুদিন পরে বাঁকীপুর চলিয়া গেলেন এবং বলিয়া গেলেন, অবস্থা মন্দ দেখিলে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাম করিতে। কিন্তু তথায় যাইয়া তিনিও অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। স্নেহের বিধান দিবারাত্র স্বামীর সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তিনি নিজের বাড়ী ছাড়িয়া তাঁহার সেবার জন্য আমাদের বাটীতে রহিলেন। কি করিলে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ আরাম দিতে পারেন তাহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল। আমার প্রাণে অনেক সময়ই আশার সঞ্চার হইত, বিধানের এত যত্ন ও সেবা বুঝি বৃথা যাইবে না। বিধান ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয়কেও ডাকিয়াছিলেন।

স্বামীর পরলোকগমন

৫ই তারিখ রবিবার রাত্রিতে বিধান একেবারেই শয্যায় গেলেন না। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "তুমি একটু শোও গিয়ে, আমি কাছে আছি।" বিধান আমাকে মোটেই জানিতে দিলেন না যে স্বামীর অবস্থা খারাপ, তিনি শয্যাপার্শ্বেই বসিয়া রহিলেন। পরদিবস অতি প্রত্যুষে একবার যখন বিশেষ আবশ্যকীয় কার্য্যে বিধান বাটীর বাহিরে গিয়াছেন, আমি স্বামীর শিরোদেশে বসিয়া আছি, বাড়ীর অন্যান্য সকলে তখন নীচের তলায় চা পান করিতে গিয়াছেন। সময় মতন ঔষধ পান করাইয়া স্বামীর ললাটের ঘাম মুছাইয়া দিলাম এবং তৎপরে আর্দ্র বস্ত্র ছাড়াইবার বন্দোবস্ত করিতেছি, এমন সময় স্বামী চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। সুবোধ তখন সবেমাত্র উপরে আসিয়াছেন, ভৃত্য স্বামীর জন্য ঘোল টানিতেছিল, আমি তাহাকে বলিলাম, "আরো দূরে যাইয়া ঘোল টানো। শব্দ আসিতেছে, সাহেব একটু ঘুমাইয়াছেন।" অকস্মাৎ সুবোধ শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। হঠাৎ তাঁহার প্রার্থনা করিবার কারণ প্রথমে বুঝিতে পারিলাম না। স্বামীর কোন কষ্ট যন্ত্রণাই দেখিতে পাই নাই; তিনি যে পরম জননীর ক্রোড়ে চিরদিনের জন্য নিদ্রিত হইলেন আমি তাহা একেবারেই বুঝিতে পারি নাই, যেন যোগী-পুরুষ ধ্যানে মগ্ন হইলেন। কিন্তু অবিলম্বে আমার চমক ভাঙ্গিল; মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইয়াছে। যেমন স্বামীর শিরোদেশে বসিয়াছিলাম, উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় তেমনই বসিয়া রহিলাম। একজন কে আসিয়া আমাকে ধরিয়া মেঝেতে শোয়াইয়া দিলেন। আমি চেতনা হারাইলাম। বিধান তখন বাড়ী ফিরিয়াছেন; তিনি আমার গাত্রে ইন্‌জেকসান্‌ বিদ্ধ করিলেন। ক্রমে সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। বুঝি চেতনা না ফিরিলেই ভাল হইত। বিধানকে দেখিয়া আমি গগনভেদী চিৎকার করিতে লাগিলাম। স্নেহের বিধান যে পুত্রবৎ যত্নে তাঁহার সেবা করিয়াছেন! বিধান নিকটে থাকিলে বুঝি বা স্বামীকে ধরিয়া রাখিতে পারিতাম। হায়! স্বর্গ যাঁহাকে আকিঞ্চন করে, পৃথিবীর মানুষ কতদিন তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবে? আমি সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। আমার সুখ-দুঃখ তাঁহার সহিত প্রস্থান করিল। আজ সেই সুদূরের পানে তাকাইয়া আছি, কবে তাঁহার সহিত পুনরায় মিলিত হইব, কবে আমার সকল দুঃখের প্রকৃত অবসান হইবে।

বৈবাহিক মহাশয়ের স্বর্গারোহণ

স্বামীর স্বর্গারোহণের ঠিক একমাস পরে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর, বৈবাহিক প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয়ও আমাদের শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন। স্বামীর পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার উপস্থিত থাকিবার একান্ত অভিলাষ ছিল কিন্তু চিকিৎসকের অনুমতি না পাওয়াতে তিনি আসিতে সক্ষম হয়েন নাই। তখন তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ, শুদ্ধমাত্র প্রাণের টানেই তিনি আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, স্বর্গের শাশ্বত আনন্দের মধ্যেই তাঁহারা পুনর্মিলিত হইলেন।

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এস্থানে আর একটি কথা মনে পড়িয়া গেল; শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় স্বামীকে কিরূপ ভালবাসিতেন তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। স্বামীর পরলোকগমনের সংবাদ পাইয়া তিনি এতই শোকগ্রস্ত হইয়াছিলেন যে সিঁড়ীতে একজন ধরিয়া তাঁহাকে উপরে তুলিতে হইয়াছিল, এবং স্বামীর শয্যাপার্শ্বে যাইয়া তিনি একেবারে আছাড় খাইয়া পড়িলেন। রক্তের সম্পর্ক না থাকিলেও, ধর্ম্মের কী সুমধুর বন্ধন, কী গভীর ভালবাসা। তাঁহার সহোদর

ভ্রাতার মৃত্যুতে যেরূপ শোকাভিভূত হইতেন, ঠিক সেইরূপই তিনি শোকেতে বিহ্বল হইয়াছিলেন।

শ্রীমান্ সুবোধ এবং সরযূ এখানকার পবিত্র শ্রাদ্ধকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া বাঁকীপুরের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সমাধান করিতে রওনা হইলেন। আমাকেও তাঁহাদের সহিত লইয়া গেলেন। অশ্রুজলে ভাসিয়া আমি তাঁহাদের ক্রিয়াকর্ম্মে যোগদান করিলাম। তখনকার মনের অবস্থা এমন হইয়াছিল, যেখানেই পরলোকের বিষয় আলোচনা হইত, সেস্থানে যাইয়া উপস্থিত হইতাম। যেন কোথাও স্বর্গের সিঁড়ী লুকানো রহিয়াছে, খুঁজিয়া বাহির করা কেবলমাত্র অনুসন্ধানসাপেক্ষ। পৃথিবীর কোন আমোদ আহ্লাদেই আর মন বসিত না। স্বামী যে দেশে গিয়াছেন সেই ত আমার স্বদেশ; বিদেশে কি কখনও শান্তি পাওয়া যায়?

কনিষ্ঠা ভগিনী ও বৌদিদি

এদিকে স্নেহের কনিষ্ঠা ভগিনী বগলার অদৃষ্টেও বিবাহিত জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। বিবাহের তিন চারি বৎসর পরেই তাহার স্বামীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। স্নেহশীল দাদা আদরিণী ভগিনীর বৈধব্যদশা কেমন করিয়া দর্শন করিবেন, তাহার জন্য অতিশয় চিন্তিত হইতেন। কিন্তু তাঁহাকে সেই যাতনা ভোগ করিতে হয় নাই। তিনি ভগিনী ও ভগ্নীপতি বর্ত্তমানেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যান। তাঁহার দুই বৎসর পরেই ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ভগ্নীপতি কৈলাসচন্দ্র নন্দী মহাশয়, পুত্র নির্ম্মলচন্দ্র ও কন্যা সুরুচিবালাকে পত্নীর হস্তে সমর্পণ করিয়া আমাদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি বিবাহের পরে সাত বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। মাতৃদেবী একমাত্র পুত্র ও কনিষ্ঠ জামাতাকে হারাইয়া ঐ সময়ে কিরূপ অবস্থায় দিনাতিপাত করিতেছিলেন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। বিধবা পুত্রবধূ ও স্বামীহারা কনিষ্ঠা কন্যা তাঁহার সম্মুখে সর্ব্বদা শোকের আগুন প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখিত। একমাত্র জ্যেষ্ঠ জামাতাই মাতৃদেবীর সান্ত্বনাস্থল ছিলেন। ... কিন্তু জীবন-স্মৃতি লিখিতে বসিয়া পৃথিবীর দীর্ঘ পথযাত্রায় দুই পার্শ্বে যত সহযাত্রীদিগকে পথিমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইতেছে, তাহাদের সংখ্যার পরিকল্পনায় চিত্ত ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে। স্নেহের কনিষ্ঠা ভগিনীও শীঘ্রই তাহার কর্ত্তব্যকার্য্য সমাধা করিয়া ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর স্বামীর সহিত যাইয়া মিলিত হইল। তাহার চারি বৎসর পরে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুন, বৌদিদিও স্বর্গে যাইয়া বহুদিবস অদর্শিত প্রিয়জনদিগের সহিত মিলিত হইলেন। আজ আমি এই সংসারের দীর্ঘ পথ বাহিয়া একাকিনী চলিয়াছি, পথে-চেনা নূতন যাত্রী অনেক সঙ্গ লইয়াছে; কিন্তু পথের শেষ যে কবে খুঁজিয়া পাইব তাহাই ভাবিতেছি। হে ভগবান! এই সকল দুঃখ সুখের অন্তরালে তোমার শুভ-ইচ্ছা যাহা আমায় পরিচালিত করিতেছে, যেন এই জীবনেই তাহার সফলতার পূর্ণ পরিণতি হয়।

নবম পরিচ্ছেদ

শ্রীনাথ দত্ত মহাশয় ও তাঁহার পত্নী

তৎকালীন ব্রাহ্মদের ভ্রাতৃভাব ও ভালবাসার কথা অনেকবার লিখিয়াছি সত্য। তথাপি যে দুইটি ভ্রাতা-ভগিনীর কথা এক্ষণে স্মৃতিপটে জাগরিত হইল, তাঁহাদের নাম উল্লেখ না করিলে আমার এই জীবন-স্মৃতি প্রকৃত অসমাপ্ত থাকিয়া যাইবে। বর্দ্ধমানের মহারাজার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত মহাশয় ছাত্রাবস্থা হইতেই স্বামীর অতিশয় বন্ধু ছিলেন; তৎপরে বর্দ্ধমানে তাঁহার পত্নী ও সন্তানদিগের সহিত অতিশয় ঘনিষ্ঠতা জন্মে। স্বামীর শেষ রোগশয্যায় অঘোরদাদা ও স্বামীর বন্ধু শ্রীনাথ দত্ত মহাশয় প্রতিদিবস আসিয়া স্বামীকে দেখিতেন এবং যথাসাধ্য আমাদের সহায়তা করিতেন। নিম্নে কন্যা সরযূকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্র হইতে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিলাম; তাহা হইতে স্বামীর প্রতি তাঁহার কিরূপ ভালবাসা ছিল তাহা কথঞ্চিৎ বোধগম্য হইবে —

> ... তুমি যদি বাবার মৃত্যুশোকে কাতর হও, তবে তোমার মাকে প্রবোধ কে দিবে? ... মেয়ে দুইটি এবং ছেলেটিকে নিয়া মায়ের সঙ্গে রাত্রিতে কদিন শোবে। তাহাদের হাসি কান্না আব্দার দেখিয়া যে সান্ত্বনা হইবে, তাহা বিধাতা ভিন্ন আর কেহই দিতে পারিবেন না। ...
>
> ... ভাই অম্বিকার কথা লিখিতে, তাহার নাম করিতে আমি চক্ষে অন্ধকার দেখি — কলম বন্ধ হয়।

দত্ত মহাশয়ের পত্নী যখন শেষ রোগশয্যায় শায়িত হন, তখন বারম্বার কন্যা ও বধূকে বলিয়াছিলেন, "Mrs. Senকে খবর দাও, আমি আর বাঁচিব না।" কতখানি প্রাণের টান থাকাতে রোগযন্ত্রণার মধ্যে তিনি আমাকে দেখিতে চাহিলেন। আজ তাঁহারা উভয়েই স্বর্গবাসী; তাঁহাদের গভীর ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়া প্রাণ অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

দৌহিত্রের জন্ম

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মে কনিষ্ঠ দৌহিত্র শ্রীমান্ সুবিমলচন্দ্রের জন্ম হইল। পিতামহ মাতামহ কেহই তাহাকে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। স্বর্গ হইতেই তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সময় কিন্তু বসিয়া থাকে না। সুখের দিনও কাটিয়া যায়, দুঃখের দিনও স্রোতের মতন বহিয়া যায়। সুদীর্ঘ একুশ বৎসর প্রাণের ব্যথা লইয়া কিরূপে বাঁচিয়া আছি, জানি না। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন — মানুষের মরণ নাই; অমর আত্মা চিরকাল ভগবানের ঘরে বাস করিবে। তা ছাড়া স্বামী বলিয়া গিয়াছেন, "মনে মনে সেই দিনের ছবি হৃদয়ে চিত্রিত কর, যে দিবস এই পৃথিবীর কষ্ট যন্ত্রণা অতিক্রম করিয়া পরলোকে পরম পিতার শান্তিনিকেতনে দুইজনে একত্রিত হইব। যেদিন পরলোকগত আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণকে প্রেমালিঙ্গন করিব। মনে রাখিও, এই পৃথিবীতে

ভালবাসাকে বদ্ধ করিলে প্রেমের সুন্দর মনোহর মূর্ত্তিটি দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে কষ্ট যন্ত্রণার মধ্যে ভয়ে ভয়ে ভালবাসা — সেখানে চির শান্তি, চির প্রেম। তুমি কি মনে করিয়াছ, তোমার স্নেহময় জনক পরলোকে যাইয়া তোমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন? তাহাই যদি হইত তবে তোমার প্রাণ এখনও তাঁহার জন্য কাঁদে কেন? যে ভালবাসা মৃত্যুতে অবসান লাভ করে, সে ভালবাসা চাহি না। হৃদয় তাহাতে তৃপ্ত হয় না। মনে রাখিও, পৃথিবীতেই ভালবাসার শেষ নহে, আরম্ভ মাত্র;এবং মৃত্যু ভালবাসাকে বিনাশ করে না, পরীক্ষা করে মাত্র" — এই আশার বাণীগুলিই আমার মৃত প্রাণে জীবন সঞ্চার করিয়াছে। নচেৎ কোন্ নিরাশার অন্ধকূপে ডুবিয়া মরিতাম কে জানে? ভগবান, তুমি ধন্য, তুমি আমাদের যাহা দাও তাহা কাড়িয়া লও না। এই পৃথিবীতে যাহাদের হারাইয়াছি, সকলকেই পরলোকে তোমার ঘরে যাইয়া পাইব। তোমার দয়া অসীম।

শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ বসুর সহিত কল্যাণীয়া সুজাতার শুভ-বিবাহ

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী আমাদের অতি আদরের প্রথমা দৌহিত্রী শ্রীমতী সুজাতার শুভ-বিবাহ জামসেদ্‌পুর নিবাসী শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ বসুর সহিত সুসম্পন্ন হয়। শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ America হইতে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিয়া আসেন। মাতামহ কত আদর করিয়া সুজাতা নাম রাখিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতি অত্যন্ত অনুভূত হইল। স্বর্গ হইতে পিতামহ, পিতামহী ও মাতামহের আশীর্ব্বাদ-পুষ্প নবদম্পতির মস্তকে বর্ষিত হইল।

কল্যাণীয়া সুজাতার প্রথম পুত্রের জন্ম

১৯৩০ সালের ৫ই জানুয়ারী কল্যাণীয়া সুজাতার প্রথম পুত্রের জন্ম হইল। বহুকাল পরে গৃহে শিশুর আগমনে সকলেরই আনন্দের পরিসীমা রহিল না। শিশুটি যখন প্রায় একবৎসরের, তখন হঠাৎ দুরন্ত ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। এই জ্বরে শিশুটি প্রায় তিন চারি মাস ভুগিল। ডাক্তারগণ পনরো, ষোলটি ইন্‌জেকশান এই শিশুর কোমল দেহে বিদ্ধ করেন। যাহা হউক, ভগবানের আশীর্ব্বাদে শিশু আরোগ্য লাভ করিল। কিন্তু আরো একটি উপসর্গ আসিয়া জুটিল। তাহার দন্তোদ্গম হইতে বিলম্ব হইতে লাগিল। ডাক্তারেরা বলিলেন, দন্ত না বাহির হইলে শিশুর দেহ সম্পূর্ণ সুস্থ হইবে না। তাঁহারা operation করিয়া দন্ত বাহির করিবেন স্থির করিলেন। আমি এই মতের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলাম। কিন্তু আমার আপত্তিতে কি হইবে? ডাক্তারগণ যাহা ভাল বুঝিবেন তাহা তকরিতেই হইবে। সবেমাত্র শিশুটি রোগমুক্ত হইয়াছে;তাহার এই জীর্ণ দেহে operation করিতে দিতে আমার প্রাণ রাজী হইতেছিল না। 'অপারেশান'-এর দিন স্থির হইল। ক্লোরফরম্ পর্য্যন্ত ক্রয় করিয়া গৃহে আনিয়া রাখা হইল। কল্য প্রভাতে অপারেশান হইবে। আমার রাত্রিতে নিদ্রা হইল না;প্রাণেবড়ই উদ্বেগ উপস্থিত হইল। বলা বাহুল্য, শিশুকে আমিই অনেক সময়ে লালন পালন করি, আমার কাছে থাকিতে সে ভালবাসে, সে আমার বড়ই আদরের। প্রভাতে উঠিয়াই শুনিলাম যে ডাক্তারের ক্লোরফরম্ করিবার কথা ছিল তিনি কলিকাতা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হঠাৎবাধ্য হইয়াছেন, অতএব আজ operation হইবে না। এই সংবাদ শ্রবণে আমার প্রাণেকিরূপ আনন্দের উদয় হইল তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না। আশ্চর্য্য, সেই দিবসই তাহার দন্তের অগ্রভাগ দেখিতে

পাওয়া গেল। এ ক্ষেত্রে ভগবানের অসীম দয়া কি অস্বীকার করিতে পারি? শিশুটিকে আমি আদর করিয়া 'সুনুয়া' বলিয়া ডাকি, পিতামাতা ভাল নাম দিয়াছেন 'সঞ্জীব'।

কল্যাণীয়া সুজাতার দ্বিতীয় পুত্র

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট কল্যাণীয়া সুজাতার দ্বিতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। ধন্য ভগবান্, আমাকে এই সুন্দর শিশু ক্রোড়ে লইতে দিলে। তোমার চরণোদ্দেশে আমার শত শত প্রণাম। তোমার শুভ-ইচ্ছা প্রভু, শিশুকে সংসারপথে চালিত করুক।

দশম পরিচ্ছেদ

পরিশিষ্ট

"কালের প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় আসিনু হায়,
সীমা অন্তরেখা নাহি যায় দেখা, সিন্ধুতে বিন্দু মিলায়" —

মাঝে মাঝে ভাবি কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, কালের প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি, আরও কতদূরে যাইতে হইবে। আমার সেই প্রিয় জন্মভূমি সোহাগদল গ্রাম পদ্মাতীরে অবস্থিত। প্রকৃতিদেবী যেন তথায় স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন। তাহার শোভা ও সৌন্দর্য্যের কথা আমি বর্ণনা করিতে সক্ষম নহি। যাঁহারা পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন নাই, অথবা যাঁহারা পল্লীগ্রামে কখনও বাস করেন নাই, তাঁহারা সেই সৌন্দর্য্যের মর্ম্ম কিছুতেই অনুভব করিতে পারিবেন না। যখন কল্পনাচক্ষে দেখি, প্রবলস্রোতা পদ্মানদী তরতর করিয়া বহিয়া যাইতেছে; মাঝিরা স্রোতে নৌকা ছাড়িয়া দিয়া ভাটিয়ালী গান করিতে করিতে নৌকার দাঁড় বাহিতেছে; প্রবল ঝড় সত্ত্বেও ধীবরেরা ছোট ছোট নৌকাগুলি লইয়া মৎস্য ধরিতেছে, তাহাদের যেন জীবনের ভয় নাই, তাহারা যেন এই মত্ত প্রকৃতিরই সন্তান — তখন স্মৃতিতরঙ্গে আপনাকে হারাইয়া ফেলি, লীলাময়ের উদ্দেশে মস্তক আপনা হইতে অবনত হইয়া পড়ে।

বর্ষার প্রারম্ভে শুষ্ক খাল ও ডোবাগুলি নূতন জোয়ারে জলপূর্ণ হইয়া যাইত। জোয়ারের প্রথম জল যখন সাপের মতন আঁকিয়া বাঁকিয়া নিম্নভূমি খুঁজিয়া চলিতে আরম্ভ করিত, সেই সুন্দর দৃশ্য দেখিবার জন্য তাহার সহিত আমরা — বালক বালিকারা, দৌড়াইতে কত বৃথা চেষ্টাই করিতাম। পূর্ব্বে যেস্থান একেবারেই শুষ্ক ছিল, অনায়াসে চলাফেরা করিতাম, সেস্থান এখন জলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, নৌকা ভিন্ন যাতায়াত করা চলিবে না। খাল ও খানাগুলির দুইধারে যে সকল গুল্ম ও বৃক্ষরাজি ছিল তাহাদের ছায়া জলে আসিয়া পড়িয়াছে। ক্রমশঃ শস্যক্ষেত্রগুলিও জলপূর্ণ হইয়া গেল। ধানের ক্ষেতের উপর দিয়া ছোট ছোট নৌকাগুলি শন-শন শব্দ করিয়া পাল তুলিয়া চলিতে সুরু করিয়াছে। সেই ছোট নৌকাগুলি হইতে আরোহীরা সাপ্‌লা (কুমুদ) তুলিয়া লইতেছে। তাহাদের নালগুলিতে মালা গাঁথিয়া বালক বালিকারা গলায় পরিতেছে। তাহাদের আর সুখ ধরিতেছে না; আনন্দ-মেলায় আজ হাসির দোকানখানি বুঝি লুট হইয়া যায়।

পল্লীগ্রামে বর্ষার সময়ই নৌকাযোগে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাতায়াতের সুবিধা বলিয়া এই সময়ের জন্য অনেকে অপেক্ষা করিয়া থাকেন। বালিকাবধূরা শ্বশ্রূমাতা অথবা অভিভাবকদের অনুমতি লইয়া বর্ষাকালে ছোট নৌকাযোগে প্রিয় পিত্রালয়ে আসিয়া পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনদিগকে দেখিয়া ও কিছুদিনের জন্য মুক্ত বাতাসে বেড়াইতে পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। বালিকাসুলভ খেলাধূলা করা যাহাদের স্বভাব, তাহারা শ্বশুরগৃহে অবরুদ্ধ হইয়া

পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর ন্যায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া থাকে। সকল ঘটনাগুলিই আজ মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠিতেছে।

পদ্মানদীর উত্তর তীরে সোহাগদল গ্রাম অবস্থিত; দক্ষিণে রাজা রাজবল্লভের প্রাসাদ ছিল। আজ মনে পড়ে, সেই যে দিবস রাজা রাজবল্লভের নবরত্ন ও পঞ্চরত্ন ভীষণ শব্দে পদ্মাতে পড়িয়াছিল তখন কত না ভাবিয়াছিলাম, এই নবরত্ন ও পঞ্চরত্নের উপর যে সোনার কলসীগুলিন আছে তাহা পদ্মার প্রবল স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় যাইবে ও কে পাইবে? ভাসিতে ভাসিতে আমিও আজ বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। যখন প্রথম কলিকাতা নগরী দর্শন করি, শত শত আলোকমালা, উচ্চ অট্টালিকা, রাস্তার অসংখ্য লোক চলাচল, ফেরিওয়ালাদের বিচিত্র হাঁকডাক, অবিশ্রান্ত অশ্বযান, বাষ্পযান ও গোযানের গমনাগমন সকলই আমাকে মোহিত করিয়াছিল। সে যেন এক স্বপ্নরাজ্য; যেন একটি পটের উপর শিল্পী আর একটি পট আঁকিয়াছেন, মধ্যকার ক্ষুদ্র পটটি শত উজ্জ্বলবর্ণে অতিরঞ্জিত।

এ সকল ত গেল বাহিরের কথা, তাহার পর স্কুলের ছাত্রীজীবনটি কি চমৎকার ও সুন্দর। কত বন্ধুলাভ হইল। যাহাদের কখনও চিনিতাম না, জানিতাম না, তাহারাও আপনার জন হইলেন। পরে বিবাহিত জীবনেও ভগবান তাঁহার আনন্দ হইতে বঞ্চিত করেন নাই। দেবতুল্য স্বামীর সহগামিনী হইয়া কত দেশ বিদেশে বেড়াইলাম। যেস্থানেই যাইতাম ভগবান আমার জন্য আত্মীয়স্বজন যেন সৃষ্টি করিয়া রাখিতেন। তাঁহাদের স্নেহ ভালবাসা পাইয়া ধন্য হইয়াছি।

তাহারো পরে শোকের আগুনে দগ্ধ করিয়া কি ভগবান আমাকে পরলোকের উপযুক্ত করিলেন! উর্দ্ধলোকে আমার প্রিয়জনেরা ঘর সাজাইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।... হে প্রেমসিন্ধু, তোমার একবিন্দু প্রেম যাহা তুমি দয়া করিয়া আমার প্রাণে দিয়াছ, আমি যেন সেই বিন্দুটুকু তোমার অনন্ত প্রেমের সিন্ধুতে ঢালিয়া দিতে পারি।

সমাপ্ত

সংযোজন

স্ত্রীশিক্ষা-আন্দোলনে কেশবচন্দ্র সেন

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন জনসমাজে ধর্ম্মনেতা ও সমাজ-সংস্কারক বলিয়াই সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। সমাজের কল্যাণ-কর্ম্মে তাঁহার প্রতিভা কত গভীরভাবে প্রযুক্ত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই হয়ত সম্যক্ ধারণা নাই। স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে বিভিন্ন শিক্ষা-প্রচেষ্টা কেশবচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তাঁহার জীবনী-গ্রন্থসমূহে এবিষয়ে উল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু ইহার যথাযথ বিবরণ তাহাতে তেমন মিলে না। সমসাময়িক সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র, শিক্ষাবিষয়ক সরকারী বিবরণ এবং প্রামাণ্য পুস্তকাদি হইতে এ বিষয়ে বিস্তর তথ্য পাওয়া যায়। আমি এই সমুদয়ের নিরিখে এখানে কেশবচন্দ্রের স্ত্রীশিক্ষা-আন্দোলনের কথা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চাই।

স্ত্রীশিক্ষা তথা স্ত্রীজাতির উন্নতি-প্রচেষ্টা কেশবচন্দ্রের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেই আরব্ধ হয়। রাজা রামমোহন রায় সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলনকালে যে-সব পুস্তিকা লেখেন সেগুলির মধ্যে শিক্ষাহীনতার দরুনই যে নারীজাতির এরূপ অধঃপতন ঘটিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। মিশনরী প্রতিষ্ঠানসমূহের আনুকূল্যে বহু বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয় বটে, কিন্তু হিন্দুদিগকে "খ্রীষ্টান" করাই তাঁহাদের মনোগত বাসনা ছিল বলিয়া সমাজে তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। স্ত্রীশিক্ষা প্রচারকল্পে রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রচেষ্টা ও পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের "স্ত্রীশিক্ষাবিধায়কে"র কথা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। নব্যশিক্ষিত বাঙালী যুবকেরা নিজেদের পত্নীগণকে স্বগৃহে রাখিয়া আধুনিক শিক্ষাদানে অগ্রসর হন। স্ত্রীশিক্ষা যাহাতে সমাজে অবাধে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে সেজন্যও তাঁহারা নানারূপ জল্পনাকল্পনা করিতেছিলেন। বারাসতে প্যারীচরণ সরকার প্রমুখ নব্যশিক্ষিত বাঙালীগণ কর্ত্তৃক ১৮৪৭ সনে যে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তাহা আধুনিক কালের সাধারণ বালিকাবিদ্যালয়গুলির আদি বলিয়া ধরা যায়। ইহার দুই বৎসর পরে, ১৮৪৯ সনের ৭ই মে ভারত-সরকারের ব্যবস্থাসচিব জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন প্রধানতঃ রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহায়ে ইদানীন্তন পরিচিত বেথুন বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দীর্ঘকাল সম্পাদকরূপে এই বিদ্যায়তনটি পরিচালনা করিয়াছিলেন। সরকার কর্ত্তৃক বিদ্যালয়ে সাহায্য-দানের ব্যবস্থা হইলে তিনি কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি জেলায় বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। সরকারী সাহায্য বন্ধ হইলেও তিনি সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া এগুলি চালাইয়াছিলেন।[১]

১। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (সাহিত্যসাধক চরিতমালা)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৭৩।

কিন্তু তখন বালিকাদের অল্প বয়সে বিবাহ হইবার রীতি প্রচলিত থাকায় তাহারা অধিক দিন বিদ্যালয়ে পড়িবার সুযোগ পাইত না, দশ-বার বৎসরের মধ্যেই তাহাদিগকে বিদ্যালয় হইতে বিদায় লইতে হইত। শ্বশুরগৃহে লেখাপড়ার চর্চ্চা সম্ভব না হওয়ায় বালিকাদের শিক্ষা নাম মাত্রেই পর্য্যবসিত হইত। মিশনরীরা ইতিপূর্ব্বে জেনানা মিশন প্রতিষ্ঠিত করিয়া অন্তঃপুরে নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু যে কারণে তাঁহাদের বিদ্যালয়গুলি জনপ্রিয় হয় নাই ঠিক সেই কারণে তাঁহাদের এ প্রচেষ্টাও কার্য্যকরী হইল না। উচ্চশিক্ষিত যুবকগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়ে আসিয়া কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে উক্ত অভাব পূরণ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। জনকল্যাণকর্ম্ম এবং আধ্যাত্মিকতা—দুই-ই ছিল কেশবচন্দ্রের জীবনাদর্শ। সাধারণের মধ্যে সুশিক্ষা প্রচারোদ্দেশ্যে ১৮৬১ সনের ৩রা অক্টোবর কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে সুবিখ্যাত শ্যামাচরণ সরকারের সভাপতিত্বে যে জনসভার অধিবেশন হয় তাহাতেই উক্ত সভার আহ্বায়ক কেশবচন্দ্র নারী-শিক্ষার আবশ্যকতার বিষয়ও বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।[২] ১৮৬৩ সনের মাঝামাঝি কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম যুবকগণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মবন্ধু সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সভার দুইটি উদ্দেশ্য—দেশোন্নতি এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' অগ্রহায়ণ ১৭৮৫ শক (ইং ১৮৬৩) সংখ্যাতেই লেখেন, "বয়স্থা নারীগণের শিক্ষার্থে সভ্যেরা এক অভিনব প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন,... ।" সাধারণ বিদ্যালয়সমূহের পরিপূরকরূপে ব্রাহ্মবন্ধু সভা 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা'র প্রবর্ত্তন করেন। সভার পক্ষ হইতে "অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সম্পাদক শ্রীহরলাল রায়"—এই স্বাক্ষরে ইহার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ ঘোষিত হইল :

"ঈশ্বর প্রসাদে এতদ্দেশে স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত কতিপয় বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু বালিকাগণ বিদ্যালয়ে দুই তিন বৎসরের অধিক পড়িতে না পারায় যথাবাঞ্ছিত ফল উৎপন্ন হইতেছে না। যাহাতে বালিকাগণ উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করিতে পারে এই রূপ একটি প্রণালী কলিকাতার ব্রাহ্মবন্ধু সভা অবলম্বন করিয়াছেন। এই প্রণালী ক্রমে বালিকাগণ বিদ্যালয়ে না গিয়া বাটীতে নিযুক্ত শিক্ষক দ্বারা বা পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি দ্বারা সুশিক্ষিত হইতে পারিবেক। পাঠের বিবরণ বর্ষে চারিবার উক্ত সভায় প্রেরণ করিতে হইবেক। বৎসরে দুই বার বালিকাদিগকে পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত পাত্রীদিগকে পারিতোষিক দেওয়া যাইবেক। যাঁহারা এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া আপন আপন পরিবারস্থ বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে চাহেন তাঁহারা তাঁহাদিগের নাম, ধাম, বয়স, পাঠ্য পুস্তক ও পাঠে কতটুকু উন্নতি হইয়াছে, এই সমুদায় বিবরণ সহ আমাকে পত্র লিখিবেন। আমার নামে পত্র কলুটোলার শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট পাঠাইবেন।"[৩]

শিক্ষার্থীদের পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রতি শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক নির্দ্ধারিত করা হইল। ব্রাহ্মবন্ধু সভা প্রায় দুই বৎসরকাল পরে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার কার্য্য বামাবোধিনী সভার হস্তে অর্পণ করেন। শেষোক্ত সভা উমেশচন্দ্র দত্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ব্রাহ্ম যুব-নেতাদের দ্বারা ইহার মুখপত্র 'বামবোধিনী পত্রিকা' পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাবধি অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অক্টোবর ১৮৬৭ (আশ্বিন ১২৭৪) সংখ্যায় 'বামাবোধিনী পত্রিকা' লেখেন :

২। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—কার্ত্তিক ১৭৮৩ শক (ইং ১৮৬১)।

৩। ঐ —ভাদ্র ১৭৮৫ শক (ইং ১৮৬৩) পৃ. ৮৩।

"বিগত ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে[৪], ১২৭০ বঙ্গাব্দে এই কলিকাতা মহানগরীতে 'থিস্‌টিক্ ফ্রেণ্ডস্ সোসাইটি' নামে একটি ব্রাহ্মবন্ধু সভা সংস্থাপিত হয়। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিবিধানার্থে কিয়ন্মাস পরে উক্ত সভার অন্তর্গত অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষাসভা নামে একটি স্বতন্ত্র সভা প্রতিষ্ঠিত হয়।...১২৭১ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ কলিকাতা ব্রাহ্মবন্ধু সভা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার অন্তর্গত ১২টি ছাত্রীকে পুরস্কার প্রদান করেন। এই পুরস্কার প্রদত্ত হইলে, অনন্তর ১২৭১ বঙ্গাব্দের শেষে ব্রাহ্মবন্ধু সভা এই অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা প্রণালীর ভার বামাবোধিনী সভার হস্তে অর্পণ করেন। তদবধি বামাবোধিনী সভা তাহা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের পূর্ব্বাবলম্বিত প্রণালীর সহিত তাহা একত্রিত করেন এবং ১২৭২ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভে বৈশাখ মাসের বামাবোধিনী পত্রিকায় সভ্যদিগের অনুমত পরীক্ষা পুস্তক সকলের একটি নূতন তালিকা প্রকাশ করেন। তাহাতে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার সময় পাঁচ বৎসরে বিভক্ত করা হয়...১২৭০।১২৭১ এই দুই বৎসর ব্রাহ্মবন্ধু সভার হস্তে তাহার ভার থাকে। এবং ১২৭২।৭৩।৭৪ এই তিন বৎসর উহা বামাবোধিনী সভার হস্তে আসিয়াছে।"

তৎকালে প্রচলিত স্ত্রীশিক্ষার পরিপূরক হিসাবে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা কেশব-মণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিকল্পিত ও অনুসৃত হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বালিকা-বিদ্যালয়গুলিরও যাহাতে সম্যক্ উন্নতি হয়, সে উদ্দেশ্যেও ১৮৬৬ সনের শেষভাগ হইতে আয়োজন চলিতে থাকে। শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা দ্বারাই প্রধানতঃ উহা সম্ভব। ঐ বৎসর নভেম্বর মাসে ভারত-হিতৈষিণী কুমারী মেরী কার্পেণ্টার ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন এবং কলিকাতায় আসিয়া নারী-শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনায় রত হইলেন। তাৎকালিক সামাজিক অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া ইহার সাফল্য সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। কেশবচন্দ্র কিন্তু কার্পেণ্টারের প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করিতে উৎসুক হইলেন। কলিকাতার বেথুন স্কুলের সঙ্গে একটি শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত-সরকারকে কার্পেণ্টার একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রে বিশেষ কাজ হইল। কিছুকাল আলাপ-আলোচনার পর সরকার এইরূপ একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সম্মতি দিলেন। ১৮৬৯ সনের জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগ হইতে তিন বৎসরের জন্য পরীক্ষামূলক ভাবে একজন ইউরোপীয় মহিলা শিক্ষাব্রতীর তত্ত্বাবধানে বেথুন স্কুলের সঙ্গে ফিমেল নর্ম্যাল স্কুল বা শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের কার্য্যও আরম্ভ হইল। কেশবচন্দ্রের সহায়তায় কুমারী কার্পেণ্টারের উদ্দেশ্য কার্য্যকরী হওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

বিলাত পরিভ্রমণকালে (এপ্রিল-অক্টোবর ১৮৭০) কেশবচন্দ্র স্বদেশের নারী জাতির উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয় উপায়াদি সম্বন্ধে সেখানকার জনসভায় একাধিক বক্তৃতা করেন। তাঁহার উপস্থিতিতে কুমারী কার্পেণ্টার ব্রিষ্টল নগরীতে১৮৭০, ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে একটি জনসভার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই সভায় ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ ভারতীয় নারীজাতির মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার দ্রুততর করিবার উদ্দেশ্যে "নেশন্যাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন" নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। কেশবচন্দ্র একটি বক্তৃতায় এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সূচনাকে ভারতবাসীদের পক্ষ হইতে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। নেশন্যাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন মাদ্রাজ, বোম্বাই, করাচী,

৪। ইহা ভুল, '১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দ' হইবে।

কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে শাখা-সভা গঠন করিয়া বিদ্যালয়ে সাহায্য, উৎকৃষ্ট ছাত্রীদের বৃত্তি, স্ত্রীপাঠ্য পুস্তকাদি প্রকাশ ইত্যাদি নানা ভাবে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে তৎপর হইয়াছিলেন।

২

স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কেশবচন্দ্র জাতিধর্ম্মবর্ণ নির্ব্বিশেষে স্বদেশবাসীদের সংঘবদ্ধভাবে বিভিন্ন জনহিতকর কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য কলিকাতায় একটি সভা স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। ইহার নাম হইল—"Indian Reforms Association" বা ভারত-সংস্কার সভা। ৭ই নবেম্বর (১৮৭০) তারিখে অনুষ্ঠিত ইহার প্রথম অধিবেশনে কার্য্যক্রম যথাযথ নির্দ্ধারিত হইল। সভার কার্য্য পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত হয়। "স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি-সাধন বিভাগ"—কার্য্যসূচীতে স্বভাবতঃই প্রথম স্থান অধিকার করিল। কেশবচন্দ্র সেন হইলেন ভারত-সংস্কার সভার সাধারণ সভাপতি, গোবিন্দচাঁদ ধর সাধারণ সম্পাদক। প্রত্যেক বিভাগের কার্য্য তত্ত্বাবধানের জন্য ইহার অন্তর্গত স্বতন্ত্র সভাপতি ও সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। "স্ত্রী-জাতির উন্নতি-সাধন" বিভাগের সভাপতি হন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত। উমেশচন্দ্র ইতিপূর্ব্বেই 'বামাবোধিনী পত্রিকা' সম্পাদন ও পরিচালন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া নানাপ্রকারে নারীজাতির সেবা করিয়া আসিতেছিলেন। কাজেই উপযুক্ত পাত্রেই এই বিভাগের সম্পাদনাভার অর্পিত হইল। এই বিভাগের কার্য্য সাধিত হইবার কথা হয় "বালিকা-বিদ্যালয়, অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা, বামাগণের উপযোগী পত্রিকা প্রচার, সময়ে সময়ে পুস্তকাদি প্রকাশ এবং পরীক্ষা গ্রহণ ও পারিতোষিক দান" ইত্যাদি[৫] দ্বারা।

স্ত্রীজাতির উন্নতি-সাধন বিভাগের কার্য্যও শীঘ্রই আরম্ভ হইল। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, কেশবচন্দ্র শিক্ষয়িত্রী তৈরি করিবার উদ্দেশ্যে কুমারী কার্পেণ্টারের প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন। বেথুন স্কুলের সঙ্গে যে ফিমেল নর্ম্যাল স্কুল বা শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সরকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহার বিশেষ উন্নতি হয় নাই, ১৮৭১ সন নাগাদ বিদ্যালয়ের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। কেশবচন্দ্র স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া উক্ত বিভাগে একটি শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় ১৮৭১ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী স্থাপন করিলেন। 'বামাবোধিনী পত্রিকা' মার্চ্চ ১৮৭১ সংখ্যায় বিদ্যালয় সম্বন্ধে লেখেন,

"ভারত-সংস্কার সভার অধীনে যে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় হইয়াছে, ইতিমধ্যে তাহার ছাত্রী সংখ্যা ১৭টি হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রতিদিন বাঙ্গালা শিক্ষা দেন এবং একটি বিবি মিস্ পিগট— বেথুন স্কুলের ভূতপূর্ব্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইংরাজী ও শিল্পকার্য্য শিখান। ভক্তিভাজন বাবু কেশবচন্দ্র সেন মধ্যে মধ্যে বিজ্ঞানশাস্ত্রের উপকারী বিষয় সকল অতি সহজে বুঝাইয়া দিয়া থাকেন।"

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অল্প দিন পরেই, এই বৎসরের মে মাসে কেশবচন্দ্রের প্রেরণায় এবং ছাত্রীদের উদ্যোগে নারীজাতির কল্যাণকর বিভিন্ন বিষয়ের যথাযথ আলোচনার উদ্দেশ্যে 'বামাহিতৈষিণী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬] প্রতি পক্ষান্তে শুক্রবার ইহার অধিবেশন হইত। এই

৫। বামাবোধিনী পত্রিকা—অগ্রহায়ণ ১২৭৭ (ডিসেম্বর ১৮৭০)।

৬। ঐ —বৈশাখ ১২৭৮ (মে ১৮৭১)।

সভায় কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ বিভিন্ন নেতার সভাপতিত্বে নারীজাতির উন্নতি বিষয়ক এবং সাধারণ শিক্ষামূলক নানা বিষয়ে ছাত্রীরা প্রবন্ধ পাঠ করিতেন এবং তদুপরি নানারকম আলোচনা চলিত। শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের সঙ্গে এ সভাও বহু বৎসর জীবিত ছিল।

প্রথম বৎসর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে অঘোরনাথ গুপ্ত[৭] এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান-কার্য্যে ব্রতী হন। ছাত্রীগণ প্রায় সকলেই বয়স্থা; অল্পকালের মধ্যে তাঁহারা পাঠে উৎকর্ষ দেখাইতে সমর্থ হইলেন। তাঁহাদের প্রথম ত্রৈমাসিক পরীক্ষায়ই ইহার প্রমাণ পাওয়া গেল। ছাত্রীসংখ্যাও ক্রমে বাড়িয়া জুলাই মাস (১৮৭১) নাগাদ বাইশ জনে দাঁড়ায়। বিদ্যালয়ের আয়ব্যয় এবং যান্মাসিক পরীক্ষাদি সম্বন্ধে 'বামাবোধিনী পত্রিকা'—শ্রাবণ ১২৭৮ লেখেন,

"বিদ্যালয়ের মাসিক ব্যয় ন্যূনাধিক ১৫০৲ দেড়শত টাকা হইয়া থাকে, তজ্জন্য বামাকুলহিতৈষী মহাত্মাগণের দাতব্যের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর। এইরূপ অবস্থায় বিদ্যালয়টির কার্য্য চলিয়া গত মাসের প্রথমে ইহার যান্মাসিক পরীক্ষা ও পারিতোষিক বিতরণ হইয়াছে।...

"৮ই আগষ্ট ছাত্রীগণের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হয়।..."

উক্ত পত্রিকা পারিতোষিক-প্রাপ্ত ছাত্রীদের নাম এইরূপ উল্লেখ করেন,

"১ম শ্রেণী। শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী সেন[৮], কুমারী সৌদামিনী কাস্তগিরী[৯], কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী[১০]।

২য় শ্রেণী। শ্রীমতী যোগমায়া গোস্বামী[১১], জগন্মোহিনী রায়, জগত্তারিণী বসু, সারদা সুন্দরী ঘোষ, কুমারী সরলা বসু।

৩য় শ্রেণী। শ্রীমতী মনোমোহিনী সেন, কৃষ্ণবিনোদিনী বসু, বসন্তকুমারী মৈত্র।"

'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় পারিতোষিক-প্রাপ্ত ছাত্রীদের উৎকৃষ্ট রচনাবলী প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। এখানে এই পত্রিকাখানির সঙ্গে স্ত্রীজাতির উন্নতি-বিধান বিভাগ তথা শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের সম্পর্কের কথাও একটু বলা আবশ্যক। আমরা দেখিয়াছি, উক্ত পত্রিকার সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত স্ত্রীজাতির উন্নতি-বিধান বিভাগেরও সম্পাদক। এই বিভাগের একখানি মুখপত্রের আবশ্যকতা অনুভূত হইতেছিল, বামাবোধিনী পত্রিকাই এ অভাব পূরণ করিল। ভাদ্র ১২৭৮ সন (সেপ্টেম্বর ১৮৭১) হইতে পত্রিকাখানি ইহার মুখপত্র রূপে গৃহীত হয়।[১২] বামা-রচনা অধ্যায়ে ছাত্রীদের উৎকৃষ্ট রচনাসমূহ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল। বামাহিতৈষিণী সভায় পঠিত ছাত্রীগণের প্রবন্ধাদিও ইহাতে স্থান পাইতে থাকে।

৭। ধর্ম্মতত্ত্ব—১৬ ফাল্গুন, ১৭৯৩ শক (ইং ১৮৭২)।

৮। কেশবচন্দ্র সেনের বিলাতযাত্রার অন্যতম সঙ্গী ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক প্রসন্নকুমার সেনের স্ত্রী।

৯। ডাঃ অন্নদাচরণ খাস্তগীরের কন্যা ও (পরে) সিবিলিয়ান বিহারীলাল গুপ্তের পত্নী।

১০। রামতনু লাহিড়ীর ভ্রাতুষ্পুত্রী ও (পরে) বেথুন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী।

১১। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহধর্ম্মিণী।

১২। "বর্তমান ভাদ্র মাস হইতে ইহার সম্পাদকীয় ভার ভারত-সংস্কারক সভার বামাকুলোন্নতি সাধক (Female Improvement) বিভাগের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। বামাবোধিনী পত্রিকার স্বত্ব যেমন বামাবোধিনী সভার ছিল সেইরূপ থাকিবে। ইহার লেখন কার্য্য কেবল ভারত-সংস্কার সভার উক্ত বিভাগ হইতে সম্পন্ন হইবে।"—বামাবোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৮৭৮।

পরবর্ত্তী ডিসেম্বর মাসে (১৮৭১) শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের প্রথম বাৎসরিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। পণ্ডিত (পরে মহামহোপাধ্যায়) মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সে যুগের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্গণ বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করেন। ছাত্রীরা বাংলা শিক্ষায় কতখানি উৎকর্ষলাভ করিয়াছিলেন কৃষ্ণমোহনের ইংরেজী মন্তব্য[১৩] হইতে তাহা জানা যাইতেছে,—

"I return the Bengali exercises of the students of the Female School of the I. R. Association. They have all done very well indeed. I do not at this moment remember any Bengali Mss. written by Hindoo ladies with the accuracy and correction which characterise the enclosed papers so free from mistakes as these."

(Revd.) K. M. Banerjee

শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের পুরা ইংরেজী নাম "Female Normal and Adult School"। বিদ্যালয়টি কলিকাতার মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে প্রথম আরম্ভ হয়। পরে ১৮৭২ সনের প্রারম্ভে কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী বেলঘরিয়ায় ভারত-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহা তথায় স্থানান্তরিত হয়। এখানে তিন মাস অবস্থানের পর আশ্রমের সঙ্গে বিদ্যালয়টি মহারাণী স্বর্ণময়ীর কাঁকুড়গাছি উদ্যান-বাটিকায় চলিয়া যায়। এইখানেই ৬ই এপ্রিল (১৮৭২) তারিখে তৎকালীন বড়লাটের পত্নী লেডী নেপিয়ারের পৌরোহিত্যে প্রথম সাম্বৎসরিক পারিতোষিক-প্রদান উৎসব সম্পন্ন হইল। উৎসব অন্তে ফাদার লাফোঁ বিজ্ঞান বিষয়ে একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন ("বামাবোধিনী পত্রিকা", চৈত্র, ১২৭৮)। কাঁকুড়গাছি হইতে অল্প কাল পরেই ভারত-আশ্রম কলিকাতা মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে উঠিয়া আসিলে স্ত্রীবিদ্যালয়ও এখানে স্থানান্তরিত হইল। "ধর্ম্মতত্ত্ব" (১৩মে ১৮৭২) এই সংবাদ দিয়া লেখেন যে, "বিদ্যালয়ের কার্য্য ১২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত আরম্ভ হইয়া থাকে। ইহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ।"

শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ব্যয়—১৮৭২ সনের প্রারম্ভে প্রায় এক শত আশী টাকা—দেশী-বিদেশী কয়েকজন মহানুভব ব্যক্তির অর্থসাহায্যে মিটানো হইতেছিল। কিন্তু শুধু মাত্র চাঁদার উপর নির্ভর করিয়া ইহার স্থায়িত্ব বিধান সম্ভব নহে। সুতরাং সরকারের সঙ্গে কেশবচন্দ্র এ সম্বন্ধে পত্র-ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৭২ সনের ৩১শে জানুয়ারী বেথুন স্কুল সংলগ্ন শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সরকার তুলিয়া দিলেন। এই সময় ছোটলাট সার জন ক্যাম্‌বেল এই মর্ম্মে মন্তব্য করেন যে, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কাহারও পক্ষে এরূপ বিদ্যালয় সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা করা সম্ভব নহে। কেশবচন্দ্র পরবর্ত্তী ৩রা ফেব্রুয়ারী সরকারের জ্ঞাতার্থ তাঁহার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের বিষয় একখানি পত্রে বিশেষভাবে বিবৃত করিয়া লেখেন যে, তাঁহার বিদ্যালয় দ্বারা সরকারের উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎও সিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। সুতরাং সরকারী সাহায্য ন্যায়তঃ ইহার প্রাপ্য। এই পত্র হইতে বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আমরা সম্যক্ জানিতে পারি। শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের চব্বিশটি ছাত্রী চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত ছয়টি বালিকা লইয়া ইহার সঙ্গে একটি বালিকা বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পাঠ্য পুস্তকের তালিকা এই পত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। এখানে কিরূপ উন্নত

১৩। বামাবোধিনী পত্রিকা, চৈত্র ১২৭৮।

ধরণের শিক্ষা দেওয়া হইত প্রথম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকের নাম দৃষ্টে তাহা বেশ বুঝা যায়। বাল্মীকি রামায়ণ, নাবী জাতি-বিষয়ক প্রস্তাব, মেঘনাদবধ কাব্য, পদ্মিনী উপাখ্যান, অলঙ্কার শাস্ত্র, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভূগোল, প্রাকৃতিক ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, গণিত ও শারীরবিদ্যা—বাংলা পাঠ্য পুস্তক। প্রথম শ্রেণীর ইংরেজী পাঠ্য পুস্তক ছিল—P. C. Sircar's *Fifth Book of Reading*, M. C. Culische's *Course of Reading*, Lennie's *Grammar*। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-সভা বা পরিচালনা-সমিতির সভাপতি কেশবচন্দ্র স্বয়ং, সহকারী সভাপতি প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত, এবং সভ্য—ক্ষেত্রমোহন দত্ত, কৃষ্ণবিহারী সেন, হরগোপাল সরকার, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও মহেন্দ্রনাথ বসু।[১৪] কেশবচন্দ্রের এ আবেদন যে বৃথা হয় নাই, একটু পরেই আমরা তাহা দেখিতে পাইব।

দ্বিতীয় বৎসরে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের আরও উন্নতি হইল। কেশবচন্দ্র ইহার উন্নতি বিষয়ে সবিশেষ যত্নপর হইলেন। শিবনাথ ভট্টাচার্য্য (পরে শিবনাথ শাস্ত্রী) কেশবের প্রতি নিতান্ত ভক্তিমান্ ছিলেন। তিনি এই বৎসর সবে এম-এ পাস করিয়া ভারত-আশ্রমে আসিয়া যোগ দিলেন। এখানকার বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্য্যেও তিনি ব্রতী হন। শিবনাথ লিখিয়াছেন—কেশবচন্দ্র বিদ্যালয়ের শিক্ষায় ইউনিভারসিটির রীতি অনুসরণ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। মেয়েদের জ্যামিতি লজিক মেটাফিজিক্স্ পড়াইবার কথা উত্থাপন করিলে তিনি নাকি বলিয়াছিলেন, "এ সকল পড়াইয়া কি হইবে? মেয়েদের আবার জ্যামিতি পড়িয়া কি হইবে? তদপেক্ষা elementary principles of science মুখে মুখে শিখাও।" অতঃপর শিবনাথ বলিতেছেন, "আমি science-এর মধ্যে mental science আনিলাম। তখন আমি তাজা কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি, mental science-এ মাথা পুরিয়া রহিয়াছে, আমার ছাত্রীদিগকে তাহা না পড়াইলে কি থাকিতে পারি? আমি মুখে মুখে mental science বিষয়ে ও logic বিষয়ে উপদেশ দিতাম, ছাত্রীরা লিখিয়া লইতেন। সে সকল note এখনও আমার পুরাতন ছাত্রীদের কাহারও কাহারও নিকট থাকিতে পারে।[১৫] আমার প্রধান ছাত্রী ছিলেন তিন জন, রাধারাণী লাহিড়ী, সৌদামিনী খাস্তগির (যিনি পরে Mrs. B. L., Gupta হইয়াছিলেন) ও প্রসন্নকুমার সেনের স্ত্রী রাজলক্ষ্মী সেন। ইঁহারা সকলেই তখন বয়স্থা ও জ্ঞানানুরাগিণী। ইঁহাদের পড়াইতে আমার অতিশয় আনন্দ হইত।"[১৬]

শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে বয়স্কা নারীগণ অধ্যয়নে লিপ্ত ছিলেন। শিবনাথ লিখিয়াছেন—কেশব-পত্নীও এখানে অধ্যয়ন করিতেন এবং তিনি তাঁহাকেও পড়াইতেন। বিদ্যালয়ের কার্য্য

১৪। শ্রীযুত সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত তথ্য অবলম্বনে।

১৫। এখানে শিবনাথ তাঁহার বক্তৃতায় যে সব note ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক লিখিয়া রাখার কথা বলিয়াছেন তৎসমুদয় 'মনোবিজ্ঞান' শিরোনামে 'বামাবোধিনী পত্রিকা'—শ্রাবণ ১২৮০;মাঘ-ফাল্গুন ১২৮১;বৈশাখ, এবং কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১২৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। শেষোক্ত (কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ) সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পাদটীকায় 'বামাবোধিনী পত্রিকা'-সম্পাদক লেখেন,—

"পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম-এ ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণকে মনোবিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল উপদেশ দেন, ছাত্রীগণ তাহা লিখিয়া লইয়া পুস্তকাকারে বদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহাই ক্রমশঃ বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইল।"

১৬। শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত (২য় সংস্করণ), পৃ. ১৯৩।

সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট ইহাকে সাহায্যদানে অগ্রসর হইলেন। ক্ষেত্র যে আগে হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। গবর্ণমেণ্ট ১৮৭২ সনের ৯ই আগষ্ট বিদ্যালয়কে বার্ষিক দুই হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিলেন। তবে ইহার সঙ্গে এই মর্ম্মে একটি সর্ত্ত জুড়িয়া দিলেন যে, বেসরকারী দান হইতেও উক্ত পরিমাণ টাকা প্রতি বৎসর সংগ্রহ করিতে হইবে। পাঁচ বৎসরের জন্য এইরূপ সরকারী সাহায্য প্রদত্ত হইল। ১৮৭৩, ৩রা এপ্রিল অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক পারিতোষিক উৎসবে বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক কন্যা মিস বেরিং সহ যোগদান করিয়া বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যের প্রতি স্বীয় সহানুভূতি ও সমর্থন প্রদর্শন করিলেন। ১৮৭২-৭৩ সনের *Report of Public Instruction* বা শিক্ষাবিষয়ক সরকারী বিবরণে (পৃ. ৪৮৯) এই পারিতোষিক প্রদান উৎসবে সকন্যা লর্ড নথব্রুকের উপস্থিতি, ইংরেজ মহিলাগণ কর্ত্তৃক উপস্থিতমত ছাত্রীদের পরীক্ষা গ্রহণ, সরকারী সাহায্যদান প্রভৃতির নিম্নরূপ উল্লেখ আছে,—

"The Brahmo Samaj Normal School is in a flourishing state and was visited in the month of April last by the Governor-general and Miss Baring, Miss Milman and several other ladies were all much pleased with the short but satisfactory examination which preceded the distribution of prizes. Mrs. Woodrow, who had attended two successive examinations, was of opinion that much progress has been made in the year. The Lady Superintendent of the School is Mrs. Wince, who some years ago was one of the pupils of the Normal School above mentioned [the Normal School which was incorporated with the Central Female School, Cornwallis Square]. A yearly grant of Rs. 2000 was first given to the school on the 9th August 1872, subject to the condition of its being met by Rs. 2000 from private contributions. The number of pupils on the 31st March last was 30."

বিদ্যালয়ের কার্য্য পূর্ণোদ্যমে চলিতে লাগিল। তৃতীয় বৎসরে (১৮৭৩) ইহার ছাত্রীসংখ্যা দাঁড়ায় আটাশটিতে। ইহার সংলগ্ন বালিকা বিদ্যালয়ে চল্লিশটি ছাত্রী পাঠাভ্যাস করে। শিক্ষয়িত্রী বা বয়স্থা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ বাংলা ভাষায় আশ্চর্য্য ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। তাঁহারা প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী পুস্তকাদি পাঠেও নিবিষ্ট হন। এ বৎসর বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী ছিলেন—মিসেস উইন্‌স (লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট), শশিভূষণ দত্ত, এম-এ,—১ম শিক্ষক, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—২য় শিক্ষক, যোগমায়া চক্রবর্ত্তী—সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট, রাজলক্ষ্মী সেন এবং রাধারাণী লাহিড়ী প্রভৃতি ছাত্রী-শিক্ষক। এ বৎসর ছাত্রীদের পরীক্ষাকার্য্য সম্পাদন করেন—কুমারী পিগট, কুমারী হেসাব, পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, শিবচন্দ্র দেব, কৃষ্ণবিহারী সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি। শিবনাথ তখন স্বীয় মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রতিষ্ঠিত হরিনাভি এংলো-সংস্কৃত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হইয়া যাওয়ায় এখানকার কার্য্যে যুক্ত থাকিতে পারেন নাই। এবারকার উৎকৃষ্ট ছাত্রীদের পারিতোষিক বিতরণ প্রসঙ্গে "বামবোধিনী পত্রিকা", ফাল্গুন-চৈত্র ১২৮০ (মার্চ্চ-এপ্রিল ১৮৭৪) লেখেন,—

"কলিকাতা শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

ভারতাশ্রমের সুপ্রশস্ত গৃহে এই বিদ্যালয়ের কার্য্য এক্ষণে নির্ব্বাহিত হইতেছে। এই স্থানেই পারিতোষিক দানের সভা হয়। সভাস্থলে অনারেবল হবহাউস (ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক) ও তাঁহার পত্নী, ফাদার লেফণ্ট, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং বহুসংখ্যক হিন্দু ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। বিবি হবহাউস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।...

"এই শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় ১৮৭১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি সংস্থাপিত হইয়া প্রায় দুই বৎসর কাল গবর্ণমেণ্ট হইতে বার্ষিক দুই সহস্র মুদ্রা সাহায্যলাভ করিতেছে।..."

শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের কার্য্যে কেশবচন্দ্র কিন্তু সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। যে উচ্চ আদর্শ ও মনোভাব লইয়া বিদ্যালয় পরিচালনে তিনি অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহা দ্বারা তাহা তেমন পরিপূরিত না হওয়ায় সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্তকে লিখিত ১৮৭৩ সনের ২রা নবেম্বর তারিখের একখানি পত্রে তিনি এইরূপ দুঃখ প্রকাশ করেন,—

"আমি অনেক দিন হইতে বলিতেছি যে, স্ত্রীবিদ্যালয়ের অবস্থা ভাল নহে। এত টাকা ব্যয় হইতেছে, কিন্তু ফল তদ্রূপ হইতেছে না। মেয়েগুলি ধর্ম্মেতে, জ্ঞানেতে, যথার্থ উন্নতি লাভ করেন এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। আমি তাঁহাদিগকে আপনার বলিয়া ভালবাসি। কেবল কতকগুলি অসার কথা শিখাইয়া তাঁহাদিগকে বিকৃত করিতে কোনমতে ইচ্ছা হয় না। প্রকৃত জ্ঞান দিতে না পারিলে আমার মনে বড় কষ্ট হইবে। এই বিদ্যালয়টি যেন অন্যান্য বিদ্যালয়ের মত না হয়। তোমাদের নিকট আমি এই প্রার্থনা করি, এবং আশাও করি। একটি মণ্ডলীকে যথার্থ মানুষ করিয়া দিতে হইবে। আর দুই মাস দেখা যাক্, এই দুই মাস খুব চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিউপায় অবলম্বন করিলে বিদ্যালয়টি ভাল হয় এবং আমার মেয়েগুলি সুখী হয়? সে বিষয়ে তোমরা কি করিতে পার আমাকে লিখিলে আমি মতামত প্রকাশ করিতে পারি। আপাততঃ তোমার ইচ্ছানুসারে একটি তালিকা পাঠাইতেছি, তদনুসারে নিয়মিত বক্তৃতা দ্বারা উপদেশ প্রদত্ত হইবে। জানুয়ারী মাসে ঐ সকল বিষয়ে বিশেষ পরীক্ষা হইবে।"[১৭]

কেশবচন্দ্রের উচ্চ ভাবাদর্শানুযায়ী কার্য্য না হইলেও ছাত্রীগণ যে পাঠে বিশেষ উৎকর্ষলাভ করিতেছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের মধ্যে নানা বিষয় লইয়া এই সময় মতভেদ উপস্থিত হইল। এ কারণ স্ত্রীবিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যেও বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। চতুর্থ বৎসরে, ১৮৭৪ সনে কেশবচন্দ্রের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকগণ এখানকার অধ্যাপনাকার্য্যে রত হইলেন। মহেন্দ্রনাথ বসু অধ্যক্ষ হন গৌরগোবিন্দ রায় (উপাধ্যায়), উমানাথ গুপ্ত, প্রসন্নকুমার সেন ও গিরিশচন্দ্র সেনকে ভারত সংস্কার সভার অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে এ বৎসর এখানে শিক্ষাদানে ব্রতী হইতে দেখি।[১৮] চতুর্থ সাম্বৎসরিক পারিতোষিক প্রদান উৎসব সম্পন্ন হয় ১৮৭৫ সনের ২৭শে মে দিবসে। প্রথম শ্রেণীর রাধারাণী লাহিড়ী, রাজলক্ষ্মী সেন, অন্নদায়িনী সরকার প্রভৃতি পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। স্ত্রী-বিদ্যালয়-সংলগ্ন বালিকা বিদ্যালয়ের কোন কোন ছাত্রীও পুরস্কার লাভ করে। এবারকার পারিতোষিক দান প্রসঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা বিদ্যালয়ের উন্নততর শিক্ষাপ্রণালী সম্পর্কে "বামাবোধিনী পত্রিকা" (জ্যৈষ্ঠ ১২৮২) লেখেন,—

১৭। বামাবোধিনী পত্রিকা— জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ : "উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী (তাঁহার লিখিত ডায়েরী)"।

১৮। ধর্ম্মতত্ত্ব—১ ফাল্গুন ১৭৯৬ শক : "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক বিবরণ।"

"ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় ৫ বৎসর চলিতেছে এবং এখানে যতগুলি বয়স্কা হিন্দু ছাত্রী অধ্যয়ন করে, বঙ্গদেশের আর কোথায়ও সেরূপ দেখা যায় না। অধিক বয়স্কা শিক্ষার্থিনী ভদ্র রমণীগণের থাকিবার জন্য ভারতাশ্রম উপযুক্ত স্থান সমাবেশ করিয়া থাকেন। এই বিদ্যালয়ের এত দূর উন্নতি হইয়াছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীরা যে ইংরাজী পুস্তক অধ্যয়ন করেন, ইহার ছাত্রীরা তাহাই করিতেছেন।"

বিদ্যালয়টি ১৮৭৬-৭৭ সনেও ভাল রূপে চলিতেছিল। ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের মধ্যে প্রকাশ্য মতবিরোধ এ সময় যে কতকটা নিরসন হইয়াছিল তাহার প্রমাণ আছে। 'প্রগতিশীল' ব্রাহ্মদের নেতা দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি দ্বারা পরিচালিত বালিগঞ্জের বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় এই স্ত্রীবিদ্যালয়ের সঙ্গে মিলিত হওয়ার কথা যে তখন চলিতে থাকে তাহার আভাস আমরা ১৮৭৬-৭৭ সনের সরকারী শিক্ষা বিবরণে (পৃ ৭৭) এইরূপ পাইতেছি,—

"The Mirzapore school is maintained by Babu Keshub Chunder Sen; it is rather an adult female school than a normal school, its objects being similar to those of the Banga Mahila Bidyalaya of Ballygunge, with which it may shortly be amalgamated."

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উভয় বিদ্যালয় মিলিত হইল না। তথাকথিত প্রগতিশীল ব্রাহ্ম এবং কেশব-পন্থীদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ বাড়িয়া চলিল। অবশেষে ১৮৭৮ সনের ৬ই মার্চ্চ তারিখে কুচবিহার-বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবার ফলে এই মতান্তর বিচ্ছেদে পরিণত হয়। ইহার প্রতিক্রিয়া স্ত্রীবিদ্যালয়ের উপরও প্রতিফলিত হইল, বিদ্যালয়ের আয় হ্রাস পাইল। ইহা দ্বারা আশানুরূপ কাজ হইতেছে না—এই অজুহাতে গবর্ণমেণ্ট ১৮৭৮ সনে ইহার সাহায্য বন্ধ করিয়া দিলেন।[১৯]

৩

ব্রাহ্মসমাজে অন্তর্বিরোধ, সরকারী সাহায্য প্রত্যাহার প্রভৃতি নানা কারণে ভারত সংস্কার সভার অন্তর্গত এই স্ত্রীবিদ্যালয়ের কার্য্য রীতিমত চলিতে পারে নাই। কেশবচন্দ্র ১৮৭৯ সনের প্রথমেই যে আর একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন তাহার কথা 'সংবাদ প্রভাকরে' ১১ মার্চ্চ ১৮৭৯ তারিখে এইরূপ পাইতেছি,—

"বাবু কেশবচন্দ্র সেনের ভারত সংস্কার সভার অধীনে একটি স্ত্রীবিদ্যালয় ছিল, কিন্তু তাহার ফল সন্তোষপ্রদ না হওয়ায়, ইডেন সাহেব গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক সাহায্য ৫০০ টাকা রহিত করায় বিদ্যালয়টি উঠিয়া যায়। কেশববাবু এক্ষণে আর একটি স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, পাইকপাড়ার কুমার ইন্দ্রনাথ সিংহ তাহাতে ১০০০ টাকা এবং কুমার পূর্ণচন্দ্র সিংহ ৫০০ টাকা চাঁদা দান করিয়াছেন।"

এই বিদ্যালয়টির নাম দেওয়া হইল 'মেট্রোপলিটান ফিমেল স্কুল'। কেশবপন্থী ব্রাহ্মদের স্ত্রীগণ ও তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন মহিলারা ১২৮৬ সালের ২৭শে বৈশাখ কেশবচন্দ্রেরই অনুপ্রাণনায় 'আর্য্যনারী সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। 'পরিচারিকা' নামে মাসিক পত্রিকাখানি (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত) ইহার মুখপত্র হইল। কেশবচন্দ্রকে তাঁহারা

১৯। *Report of Public Instruction, Bengal, for 1878-79*, p. 85.

এই সমাজের সভাপতি পদে বৃত করিয়াছিলেন। ১৮৮০ সনের নবেম্বর মাস হইতে এই সমাজ উক্ত স্কুলের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিলেন। আর্য্যনারী সমাজের মুখপত্র 'পরিচারিকা' ফাল্গুন ১২৮৭ সংখ্যায় উহার সাম্বৎসরিক বিবরণ প্রদান প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে লেখেন,—

"গত নবেম্বর মাস হইতে ভারত সংস্কার সভার অধীনস্থ স্ত্রীবিদ্যালয় আর্য্যনারী সমাজের অধীন হইয়াছে, বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্যের অধিকাংশ ভার আর্য্যনারী সমাজের সভ্যগণ গ্রহণ করিয়াছেন।"

ইতিমধ্যে স্ত্রীজাতির শিক্ষা-ব্যবস্থায় বঙ্গদেশে নব নব পন্থা অবলম্বিত হইতে থাকে। বেথুন স্কুল বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া একটি প্রথম শ্রেণীর বিদ্যাপীঠে পরিণত হয় (আগষ্ট ১৮৭৮)। পর বৎসর হইতে এখানে কলেজের শ্রেণীও খোলা হয়। প্রবেশিকা ও তদূর্দ্ধ পরীক্ষাসমূহে নারীগণ পরীক্ষা দিয়া কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র ছিলেন পুরুষ এবং নারী উভয় শ্রেণীর একই প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থার বরাবর বিরোধী। নিজ আদর্শানুযায়ী অগ্রসর হইতে না পারায় প্রিয় স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীও তাঁহার পছন্দ হইত না। কাজেই প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে, বিশেষতঃ নারী ও পুরুষের একই ধরণে উচ্চশিক্ষা প্রদানে তাঁহার ঘোরতর আপত্তি ছিল। ইহার ভিতরকার ত্রুটি নিবারণকল্পে কেশবচন্দ্র নারীদের জন্য একটি নূতন ধরণের উচ্চশিক্ষা বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রণী হন। ১৮৮২ সনের প্রথমে এই উদ্দেশ্যে তিনি যে অনুষ্ঠানপত্র রচনা করেন (৩১ মার্চ্চ ১৮৮২) তাহা হইতে তাঁহার মূল উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম হয়। অল্পবয়স্কা বালিকাদিগের শিক্ষাদান ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়া উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে ইহাতে তিনি বলেন,—

"এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটী উচ্চতম ও সমগ্র শিক্ষারীতির অভাবে এদেশীয় স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালী অত্যন্ত অসম্পন্ন ভাবে অবস্থান করিতেছে। ভারত সংস্কারক সভার কমিটি এই সেই গুরুতর জাতীয় অভাব মোচনে অগ্রসর হইয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের মনের বিশেষ উপযোগী একটী শিক্ষাপ্রণালী বিধিবদ্ধ করাই তাঁহাদের বিশেষ উদ্দেশ্য। এই শিক্ষা প্রণালী দ্বারা এদেশের স্ত্রীলোকেরা জনসমাজে আপনাদের প্রকৃত মর্য্যাদার উপযুক্ত হইতে পারিবেন। স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য এবং কার্য্যক্ষেত্রের জন্য যে বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক তাহা অস্বীকার করা যায় না। পুরুষ জাতির উপযোগী শিক্ষা দ্বারা তাঁহাদিগের মত উপাধি এবং সুখ্যাতির অনুসন্ধান করিতে স্ত্রীলোকদিগকে বাধ্য করা অত্যন্ত অনিষ্টকর ও অন্যায় কার্য্য। এ কারণ যাহা পুরুষের উপযোগি শিক্ষা দিয়া স্ত্রীলোকদিগের স্বভাবকে বিকৃত করে অথবা যাহা তাঁহাদিগকে কেবল বাহ্য বেশভূষা ও অসার সভ্যতার অনুসরণ করিতে শিক্ষা দিয়া তাঁহাদিগের দুর্গতি সাধন করে, প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে তাহা যত্নের সহিত পরিত্যক্ত হইবে। এবং সর্ব্ব-প্রযত্নে এখানে এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে সুশিক্ষিত হিন্দু স্ত্রী এবং হিন্দু মাতা হইবার উপযুক্ত শিক্ষা প্রদত্ত হইবে। স্বাভাবিক এবং জাতীয় শিক্ষা প্রণালী দ্বারা এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের হিন্দুপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত করাই সভার উল্লিখিত কার্য্যের বিশেষ লক্ষ্য। কলিকাতা নগরীতে এজন্য সরল ভাষায় কতকগুলি বক্তৃতা হইবে।...বিজ্ঞানের সরল সত্য সকল, নীতি, স্বাস্থ্যরক্ষা, ব্যাকরণ এবং রচনা, ইতিহাস, ভূগোল, গৃহকার্য্য এবং আদর্শ হিন্দু স্ত্রীচরিত্র এই সমস্ত উপদেশের অন্তর্গত বিষয় হইবে; তত্ত্ববিদ্যা, চিত্র এবং সূচীর কার্য্যও শিক্ষা দেওয়া হইবে। যে সমস্ত স্ত্রীলোকেরা এখানে উপদেশ শ্রবণ করিবেন তাঁহাদিগকে বার্ষিক পরীক্ষার অধীন হইতে হইবে,

ছাপান প্রশ্নের কাগজ সকল তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হইবে। কলিকাতা ও বিদেশের অন্যান্য যে সমস্ত স্ত্রীলোকেরা উপযুক্ত রূপে শিক্ষা করিয়া পরীক্ষা দিতে আসিবেন তাঁহাদিগকেও পরীক্ষায় গ্রহণ করা হইবে। পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদিগকে অলঙ্কার, প্রশংসাপত্র এবং ৫০ টাকা হইতে ২০০ টাকা পর্য্যন্ত ছাত্রবৃত্তি পুরস্কাররূপে প্রদত্ত হইবে।"[২০]

ভারত সংস্কার সভার অধীনে এই উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়। কেশবচন্দ্র ইহার সভাপতি হইলেন। স্থির হইল যে, পূর্ব্বোক্ত মেট্রোপলিটন ফিমেল স্কুল প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ১৮৮২, ১লা মে দিবসে ১০নং আপার সার্কুলার রোডে এই উচ্চ স্ত্রীবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। কেশবচন্দ্রের সভাপতিত্বে বিদ্যালয়ের একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিও গঠিত হয়। বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনাদির ব্যবস্থা বিস্তারিত ভাবে এইরূপ ধার্য্য হইয়াছিল—মহিলাদের জন্য পাঠ্য পুস্তক নির্দ্দিষ্ট করা, পাঠ্য পুস্তকের অনুমত কলেজ-গৃহে নিয়মিতভাবে সপ্তাহে একবার বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা ও মহিলাগণকে তাহাতে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ দান, বৎসরে একবার পরীক্ষা গ্রহণ এবং উৎকৃষ্ট ছাত্রীগণকে পুরস্কার বিতরণ। কলেজ সিনিয়র ও জুনিয়র মাত্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়।[২১] বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসেই ফাদার লাফোঁ চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণাদি সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রথম দিনে প্রায় পঞ্চাশটি মহিলা উপস্থিত ছিলেন।[২২] ইহার পরে এইরূপ বক্তৃতাদান নিয়মিতভাবে চলিতে লাগিল। অগ্রহায়ণ-পৌষ ১২৮৯ সংখ্যা 'পরিচারিকা' নিম্নলিখিত বক্তা ও বক্তৃতার উল্লেখ করেন,—

"সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ফাদার লাফোঁ বিজ্ঞান বিষয়ে, বাবু কেশবচন্দ্র সেন নীতি বিষয়ে, বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন এম-এ ঐতিহাসিক তত্ত্ব বিষয়ে, বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার নারীজীবন বিষয়ে, ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি শারীর বিধানবিদ্যা বিষয়ে, পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র রায় প্রাচীন আর্য্যনারীদিগের আচার ব্যবহার বিষয়ে, এক একজন করিয়া প্রতি শনিবারে ১০নং আপার সার্কুলার রোডস্থিত এই বিদ্যালয়ে উপদেশ দান করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের উপদেশের সারাংশ গত কয়েক সংখ্যায় আমরা প্রকাশ করিয়াছি। গড়ে প্রায় চল্লিশ জন মহিলা উপদেশ শ্রবণ করিয়াছেন।"

১৮৮৩ সনের জানুয়ারী মাস নাগাদ এই বিদ্যালয়টি ভিক্টোরিয়া কলেজ নামে অভিহিত হয়। ২রা জানুয়ারী ছাত্রীগণের বাৎসরিক পরীক্ষা গৃহীত হইল। গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীননাথ মজুমদার এবং কেশবচন্দ্র সেন স্বয়ং পরীক্ষা লইয়াছিলেন। উৎকৃষ্ট ছাত্রীদের বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হয়। দুই জন নারীকে ইংরেজী ও বাংলা পুস্তক রচনার জন্যও পুরস্কার দিবার কথা ঘোষিত হইল। পরীক্ষক সভার সভাপতি ছিলেন কেশবচন্দ্র এবং সম্পাদক কৃষ্ণবিহারী সেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী তিন শত এবং বিজনগ্রামের মহারাণী পাঁচ শত টাকা দান করিলেন। ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর ও কুচবিহারের মহারাজা, এবং বরোদার গাইকোয়াড়ের নিকট হইতেও অর্থসাহায্য পাওয়া গেল।

২০। পরিচারিকা—বৈশাখ ১২৮৯।

২১। *The New Dispensation*, March 11, 1883.

২২। পরিচারিকা—জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯।

কলেজের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য ৯ই মার্চ্চ ১৮৮৩ দিবসে সাড়ম্বরে সম্পন্ন হইল। কলিকাতার লর্ড বিশপ এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। গৃহকর্ম্মের ব্যাঘাত না করিয়া ঘরে বসিয়া দেশীয় রীতি অনুসারে মহিলাগণের এরূপ শিক্ষালাভের নূতন ব্যবস্থাকে তিনি বিশেষ ভাবে অভিনন্দিত করেন। যে যে বিষয়ে উৎকর্ষের জন্য পারিতোষিক বিতরিত হয় তাহা দৃষ্টে জানা যায়—নারীজাতির কিরূপ ব্যাপক শিক্ষা কেশবচন্দ্র কর্ত্তৃক পরিকল্পিত হইয়াছিল। শুধু কলিকাতায় নহে, সুদূর মফস্বল হইতেও মহিলাগণ এই পরীক্ষা দিয়াছিলেন। পারিতোষিকের বিষয়, পারিতোষিক ও তৎপ্রাপ্ত ছাত্রীদের বিবরণ এখানে প্রদত্ত হইল,—

"শ্রীমতী মোহিনী সেন উচ্চ শ্রেণী সমুদায় বিষয়ের পরীক্ষায় অত্যুৎকৃষ্ট রূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তিনি বার্ষিক দুই শত টাকার ছাত্রীয় বৃত্তি স্বনামাঙ্কিত একটি সুন্দর রূপার ঘড়ী পুরস্কার পাইয়াছেন, কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী উক্ত শ্রেণীর পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি একশত টাকার ছাত্রীয় বৃত্তি ও রৌপ্য মেডল পারিতোষিক পাইয়াছেন, কুমারী চারুবালা সেন নিম্নশ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তমরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তিনি বার্ষিক একশত টাকার ছাত্রীয় বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। নিম্নশ্রেণীতে উত্তম বাংলা গদ্য রচনার জন্য যে পঞ্চাশ টাকা নির্দ্ধারিত ছিল তাহাতে কিশোরগঞ্জের শ্রীমতী কিশোরীমোহিনী সেন এবং ঢাকা জেলার কোন পল্লীগ্রামের এক কুলবধূ এই দুই জনে তুল্যরূপে অত্যুচ্চ নম্বর পাইয়াছেন। দুই জনেই পঁচিশ টাকা করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, উক্ত কুলবধূটি উত্তম হস্তলিপির জন্যে পনর টাকা পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ঢাকা জেলার পল্লীগ্রামের একটি হিন্দু কন্যা শিল্পের জন্য দশ টাকা, একটি ব্রাহ্মিকা উত্তম রন্ধনের জন্য ২৫ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন। এবং পরীক্ষোত্তীর্ণা সকল ছাত্রীই পুস্তকাদি পারিতোষিক লাভ করিয়াছেন।"[২৩]

কলেজের কার্য্য সুচারুরূপে আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু ইহা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই, প্রতিষ্ঠার দেড় বৎসর মধ্যে ১৮৮৪ সনের ৮ই জানুয়ারী উক্ত কলেজ-সংস্থাপক কেশবচন্দ্র সেন ইহধাম ত্যাগ করিলেন। ইহার পর কলেজ বিপদগ্রস্ত হইল। কিন্তু কিছু কাল পরেই কেশবের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি দেবী ও তদীয় স্বামী কুচবিহারের মহারাজা ইহার পরিচালনের জন্য নিয়মিত অর্থ-সাহায্য করিতে থাকিলে ইহার কার্য্য আবার সুষ্ঠুভাবে সুরু হয়। ১৮৮৯ সনে তাঁহারা কলেজ এবং তৎসংলগ্ন বিদ্যালয়ের সমগ্র পরিচালনা-ভার নিজেদের হস্তে গ্রহণ করিলেন।

কেশবচন্দ্র দীর্ঘায়ু ছিলেন না; তথাপি তাঁহার কর্ম্মজীবনের অধিকাংশ সময়ই অন্য দশ কাজের মধ্যে দেশের ও সমাজের উন্নতির পক্ষে একান্ত আবশ্যক স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে যাপিত হয়। কিন্তু তিনি স্ত্রীশিক্ষার প্রচলিত পদ্ধতির একান্ত বিরোধী ছিলেন। নারী ও পুরুষের প্রকৃতিগত বৈষম্য স্বীকার করিয়া নারীর উপযোগী শিক্ষাপ্রদানেই তিনি অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার কোন কোন সহকর্ম্মীর সঙ্গে পরবর্ত্তী কালে যে দারুণ মতভেদ উপস্থিত হয় ইহা তাহার অন্যতম কারণ। কিন্তু তিনি বরাবর স্বমতে দৃঢ় ছিলেন। নারীর দেহ-মনের উপযুক্ত শিক্ষা প্রচারে তিনি কোন দিন বিরত হন নাই। নানা বিপর্য্যয়ের মধ্যেও স্ত্রীবিদ্যালয় জীয়াইয়া রাখিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে একটি কলেজে পরিণত করার মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক

২৩। পরিচারিকা— ফাল্গুন ১২৮৯।

নিষ্ঠাই সপ্রমাণ হয়। নারীকে সুকন্যা, সুগৃহিণী ও সুমাতা করিয়া তোলাই স্ত্রীশিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। আর এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া কেশবচন্দ্র ভিক্টোরিয়া কলেজের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিতে অগ্রসর হন। বর্ত্তমানে আবার আমাদের দৃষ্টি শিক্ষা-সংস্কারের দিকে নিবদ্ধ হইয়াছে, স্ত্রীশিক্ষার ত্রুটি বিচ্যুতিও আজ আমাদিগকে বিদূরিত করিতে হইবে। এই সময় কেশবচন্দ্রের উক্ত আদর্শ আমাদের সম্মুখে রাখা প্রয়োজন।*

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭

* ১৯৪৯, ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে নববিধান সাহিত্য পাঠচক্র কর্ত্তৃক আহূত সভায় পঠিত "কেশবচন্দ্র সেন" প্রবন্ধের একাংশ।

বামাহিতৈষিণী সভা ও ভারতাশ্রম

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

"স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনে কেশবচন্দ্র সেন" প্রবন্ধে প্রসঙ্গতঃ "বামাহিতৈষিণী সভা" ও "ভারতাশ্রমে"র কথা উল্লেখ করিয়াছি। কেশবচন্দ্র-প্রবর্ত্তিত সমাজ-কল্যাণ প্রচেষ্টাসমূহ সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা করিতে হইলে এই দুইটি সম্পর্কেও আমাদের কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এ কারণ ইহাদের কথাও এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের অনুপ্রাণনায় ১৮৬৫ সনে কলিকাতায় ব্রাহ্মিকা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় সমসময়ে ভাগলপুরে ও বরিশালে অনুরূপ সভা স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ সভা ছিল নিছক ধর্ম্মসম্পর্কিত। নারীজাতির সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনোদ্দেশ্যে ধর্ম্মের ভিত্তিতে বামাহিতৈষিণী সভা নামক সর্ব্বপ্রথম মহিলা সমাজ বা সমিতি ১৮৭১ সনের ২৮শে এপ্রিল কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা কেশবচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহায়তায় শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের বয়স্থা ছাত্রীগণ স্থাপন করেন। পরবর্ত্তীকালে বহু ছাত্র-ছাত্রী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক হিসাবে ইহাকে তাহারও আদি বলা যাইতে পারে।

ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় ইহার প্রায় এক বৎসর পরে ১৮৭২ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে। একদল দেশহিতব্রতী ত্যাগী কর্ম্মী গঠনে এই আশ্রম কতখানি সহায় হইয়াছিল তাহা এতৎসম্পর্কিত আলোচনা হইতে জানা যাইবে। শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় তথা বামাহিতৈষিণী সভাও পরে এই আশ্রমের অঙ্গীভূত হইয়া যায়।

১। বামাহিতৈষিণী সভা

বামাহিতৈষিণী সভা নারীজাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে ১৮৭১ সনের ২৮শে এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়াছি। 'বামাবোধিনী পত্রিকা' এই সভার উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা এবং ইহার প্রথম দুইটি অধিবেশনের বিষয় বৈশাখ ১২৭৮ (মে ১৮৭২) সংখ্যায় এইরূপ বিবৃত করিয়াছেন :

"গত আশ্বিন মাসের বামাবোধিনীতে একটি স্ত্রীসমাজ সংস্থাপনের প্রস্তাব করা যায়, তদনুসারে কলিকাতায় কয়েকবার স্ত্রীলোকদিগের একটি সভা হয় এবং কুমারী পিগট তাহার অধ্যক্ষতা করেন। আমরা পাঠকগণের অবগত করিয়াছি, এই সভা পরে ভারত সংস্কার সভার অধীনে বিদ্যালয় আকারে পরিণত হয় এবং তাহা হইতে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রস্তুত হইয়াছে।...এক্ষণে যারপর নাই মহোল্লাসের বিষয় বলিতে হইবে, সেই শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় হইতে আবার নারী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের কার্য্য যেমন চলিতেছে চলিবে, অথচ স্বতন্ত্র একটি সভা দ্বারা স্ত্রীজাতির সর্ব্ববিধায় উন্নতিসাধনের উপায় অবলম্বিত হইবে ইহা অপেক্ষা সুসংবাদ আর কি আছে?

"ভারত সংস্কারক শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের যত্নে এবং শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের

ছাত্রীগণের উৎসাহে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার নাম বামাহিতৈষিণী সভা। বামাগণের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করা ইহার উদ্দেশ্য। ইহার অধিবেশন পক্ষান্তে শুক্রবার অর্থাৎ মাসে দুই বার হইবে। সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মাক্রান্ত মহিলাগণ এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন, শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের পুরুষ শিক্ষকগণও সভ্য শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। সভাস্থলে স্ত্রীজাতির হিতজনক রচনা পাঠ বক্তৃতা ও কথোপকথন হইবে। এই সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রায় ৩০ জন ভদ্র হিন্দু মহিলা উপস্থিত হন এবং মহামান্য জজ ফিয়ার সাহেবের স্ত্রী বিবি ফিয়ার দর্শক হইয়া আইসেন। সভাপতি বাবু কেশবচন্দ্র সেন সভাকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। প্রথমতঃ বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী স্ত্রীজাতির প্রকৃত উন্নতি বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। এবং তাহাতে তাহাদের শরীর মন ও আত্মা এই তিন বিষয়ক উন্নতি অর্থাৎ সুস্থতা, বিদ্যা ও ধর্ম্ম সাধন না হইলে পূর্ণ উন্নতিসাধন হইবে না সুন্দর রূপে প্রদর্শন করেন। পরে তাঁহার চারিটি ছাত্রী সেই বিষয়ে রচনা পাঠ করিলেন। কেশববাবু বিবি ফিয়ারকে এই সকল বিষয় ইংরাজীতে বুঝাইয়া দিলে তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং সভ্য শ্রেণী মধ্যে তাঁহার নাম সংযুক্ত করিতে বলিলেন। কুমারী পিগট, ব্যারিষ্টার বাবু মনোমোহন ঘোষ, বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাবু দুর্গামোহন দাসের পত্নীগণ ও উপস্থিত অন্যান্য মহিলাগণ সভার সভ্য হইলেন।”

বামাহিতৈষিণী সভার সভাপতি হইলেন কেশবচন্দ্র সেন এবং সম্পাদক শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রী রাধারাণী লাহিড়ী। প্রথম বৎসর প্রতিপক্ষান্তে অন্যূন যোলটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। একটি অধিবেশনে নারীর পরিচ্ছদ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা হয়। রাজলক্ষ্মী সেন এবং সৌদামিনী খাস্তগিরি এই বিষয়ে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, এবং এই দুইটিই ১২৭৮, ভাদ্র সংখ্যা 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বাঙালী মহিলার কিরূপ পরিচ্ছদ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রের সিংহগড় হইতে জনৈকা বঙ্গনারীর একখানি পত্র পরবর্ত্তী কার্ত্তিক সংখ্যা বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইল। ইনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ভিন্ন অন্য কেহ নহেন।

রাণী স্বর্ণময়ীর কাঁকুড়গাছিস্থ উদ্যানে ১৮৭২ সনের ২৬শে এপ্রিল এই সভার প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব স্থায়ী সভাপতি কেশবচন্দ্র সেনের পৌরোহিত্যে সুসম্পন্ন হয়। সম্পাদক রাধারাণী লাহিড়ী বৎসরের কার্য্যাবলীর একটি বিবরণ পাঠ করেন। সূচনাতেই তিনি বলেন,—

“অদ্য কি শুভদিন! অদ্য আমাদের বামাহিতৈষিণী সভার প্রথম সাম্বৎসরিক অধিবেশন! ১২৭৮ সালের ১৭ই* বৈশাখ শুক্রবার এই সভা সংস্থাপিত হয়। স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির নিমিত্ত ভক্তিভাজন বামাহিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন এবং স্ত্রীনর্ম্যাল ও বয়স্থা বিদ্যালয়ের অন্যতর শিক্ষক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়দ্বয় ইহা স্থাপন করেন। তাঁহাদিগের ইচ্ছা ছিল যে এই সভার তাবৎ কার্য্য স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা সম্পাদিত হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহারা সমস্ত ভার গ্রহণে অসমর্থ হওয়াতে ইহাতে তাঁহাদিগকে কোন কোন অংশে সাহায্য করিতে হইয়াছিল। এই সভার স্থাপন অবধি এই পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত কেশববাবু ইহার সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিতেছেন। নর্ম্যাল স্কুলের ছাত্রীগণ লইয়াই প্রথমতঃ সভা সংগঠিত হয়, তাঁহারাই ইহার সভ্য শ্রেণীরূপে পরিগণিত হয়েন। ১৩।১৪ জন হইতে ক্রমে ক্রমে ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া অবশেষে ২৪।২৫ জনে পরিণত হইয়াছে।”

---

* ইহা ভুল। ১৬ই বৈশাখ হইবে।

সভার পাক্ষিক অধিবেশনগুলিতে যে যে বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল তাহা এই,— ১ প্রকৃত শিক্ষা, ২ প্রকৃত স্বাধীনতা, ৩ স্ত্রীলোকদিগের নিরুদ্যম ও উৎসাহহীনতা, ৪ লজ্জা, ৫ বিনয়, ৬ অভ্যর্থনা, ৭ সভ্যতা, ৮ পরিচ্ছদ, ৯ নম্রতা, ১০ অহঙ্কার, ১১ ক্রোধ, ১২ গৃহকার্য্য, ১৩ পরস্পরের প্রতি ব্যবহার, ১৪ হিংসা, ১৫ ভগ্নীভাব, ১৬ দয়া। বলা বাহুল্য, কেশবচন্দ্রের সভাপতিত্বে ছাত্রীগণ আলোচনায় যোগদান করিতেন এবং এ সকল বিষয়ে তাঁহাদের প্রবন্ধাবলীও পঠিত হইত। সভার নিয়মিত সভ্য ছিলেন রাজলক্ষ্মী সেন, সৌদামিনী খাস্তগিরি, সৌদামিনী মজুমদার, যোগমায়া গোস্বামী, সারদাসুন্দরী ঘোষ, বিধুমুখী মুখোপাধ্যায়, সরলাসুন্দরী দাস, সুশীলাসুন্দরী দাস, জগত্তারিণী বসু, ভবতারিণী বসু, কৃষ্ণবিনোদিনী বসু, জগন্মোহিনী রায়, কৈলাসকামিনী দত্ত, অন্নদায়িনী সরকার, কৃষ্ণকামিনী দেব এবং মহামায়া বসু। ইহা ভিন্ন সময়ে সময়ে ইংরেজ ও বাঙালী মহিলারাও সভায় যোগদান করিতেন।

প্রথম সাম্বৎসরিক সভায় রাধারাণী লাহিড়ী, সৌদামিনী মজুমদার প্রমুখ মহিলা ছাত্রীরা নারীজাতির উন্নতিমূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি কেশবচন্দ্র স্ত্রীজাতির শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করিলেন। ইহা হইতে স্ত্রীশিক্ষার ধারা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত— যাহা পরে ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্যে সম্যক্ পরিস্ফুট হয়, সে সম্বন্ধে কিছু ধারণা করিয়া লওয়া যায়। তিনি বলেন,—

"স্ত্রী ও পুরুষ বিভিন্ন প্রকৃতি। উভয়ের স্বভাব ভিন্ন এবং অধিকারও ভিন্ন। দুই জনেরই উন্নতির পথে চলিবার অধিকার এবং উভয়েরই তদুপযোগী স্বভাব আছে। কিন্তু এ অধিকার ভিন্ন; যদিও পরিমাণে সমান। অধিকার প্রকৃতি ও স্বভাব অনুসারে। সাহস ও বলসাপেক্ষ কার্য্য পুরুষজাতির অধিকার; দয়া মমতার কার্য্য স্ত্রী জাতির কোমল প্রকৃতির উপযোগী। যখন স্ত্রী পুরুষের প্রকৃতি বিভিন্ন, তখন তাঁহাদের উন্নতিসাধনের চেষ্টাও এ দেশে বিভিন্ন হওয়া উচিত। স্ত্রী জাতির উন্নতিসাধন তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ বিদ্যাশিক্ষা; ২ গৃহের সুনিয়ম সংস্থাপন; ৩ জনসমাজে স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার।

"দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হয়, ভারতবর্ষের কোন স্থানে স্ত্রীশিক্ষার বিশুদ্ধ প্রণালী সংস্থাপিত হয় নাই। কেবল ইতিহাস, অঙ্ক, ভূগোল প্রভৃতির আলোচনাতে স্ত্রীজাতির উন্নতি হয় এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। স্ত্রীজাতিকে স্ত্রীজাতীয় সদ্‌গুণে উন্নত করিতে হইবে, পুরুষজাতীয় গুণে তাহাদিগকে উন্নত করিলে উন্নতি না হইয়া অবনতিই করা হইবে। স্ত্রী-জাতির যথার্থ উন্নতি করিতে হইলে হৃদয়ে স্বাভাবিক কোমলতা ও মধুরতা রক্ষা করিতে হইবে। কাঁঠালকে আম্র বা আমড়াকে নিম করিলে তাহাকে উন্নতি বলা যায় না। প্রকৃতি বিনাশ উন্নতি নহে। প্রকৃতি রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দেখা উচিত যে প্রকৃতিসঙ্গত শিক্ষা হইতেছে কি না? গৃহকার্য্য সম্পাদন, পিতামাতার সেবা, সন্তানপালন, পুরুষগণসহ সমুচিত ব্যবহার এ সকল বিশেষরূপে শিক্ষা করা উচিত। ইতিহাস অঙ্ক ন্যায় প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিত হওয়া যায়, দুর্গোৎসব প্রভৃতিতে সম্ভ্রান্ত লোকের বাটিতে বিদায় লাভ করা যায়, এক একজন স্ত্রী জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ন্যায় বিখ্যাত হইতে পারেন; কিন্তু ইহা স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। বিশুদ্ধ স্ত্রী, বিশুদ্ধ মাতা, বিশুদ্ধ কন্যা, বিশুদ্ধ ভগ্নী হওয়া স্ত্রীজাতির জ্ঞানলাভের এই লক্ষ্য। স্বামী, কন্যা, মাতা ও ভ্রাতার প্রতি কর্ত্তব্য না জানা নারীদিগের পক্ষে অত্যন্ত নিন্দনীয় মূর্খতা। কেবল ইতিহাস, ভূগোল পড়িলে তোমরা কৃতবিদ্য

বলিয়া প্রশংসিত হইতে পারিবে না। ব্যাকরণে সন্ধি শিখিয়াছ বটে, কিন্তু আপনার পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে এখনও সন্ধি স্থাপন করিতে পারিলে না। যেখানে গৃহকার্য্যের সুশৃঙ্খলা নাই, বস্ত্র মলিন, শয্যা মলিন, শরীর অপরিষ্কৃত, বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব, যেখানে পিতামাতা পুত্র কন্যা ইহাদিগের মধ্যে অসদ্ভাব, স্বামী স্ত্রীতে অপ্রণয় ও অসম্মিলন, সেখানে প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা নাই। যাহাতে পরস্পরের প্রতি বিশেষ অনুরাগ জন্মে, সংসারধর্ম্ম পালনে তাচ্ছিল্য ভাব দূর হইয়া তৎপ্রতি অনুরাগ হয় এরূপ জ্ঞান শিক্ষা অত্যাবশ্যক।"*

বামাহিতৈষিণী সভার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক অধিবেশনের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণও পাওয়া যাইতেছে। ১৮৭৩ সনের ২১শে জুন বেলঘরিয়ায় এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এবারেও কেশবচন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সম্পাদিকা রাধারাণী লাহিড়ী বাৎসরিক বিবরণ পাঠ করিলেন। ইহা হইতে জানা যায় ·

"প্রতি পক্ষে শুক্রবার বেলা চারি ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় নানা কারণ বশতঃ প্রথম বৎসরের ন্যায় দ্বিতীয় বর্ষে ইহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় নাই। গত বৎসরে ক্রমান্বয়ে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ কয়েকটি পঠিত হয় ও তদ্বিষয় লইয়া সভাপতি মহাশয় সভ্যগণের সহিত আলোচনা করেন। আলোচনার পর সভাপতি মহাশয় মীমাংসা স্থির করিলে সভা ভঙ্গ হয়।"

বিভিন্ন অধিবেশনে যে কয়টি বিষয় আলোচিত হয় তাহা যথাক্রমে—(১) পুরাকালের হিন্দু ও বর্ত্তমানকালের সুসভ্য ইংরেজ রমণীদিগের কি কি গুণ অনুকরণীয়, (২) সন্তান পালন, (৩) দয়া, (৪) আদর্শ রমণী, (৫) বঙ্গীয় রমণীদিগের বর্ত্তমান অবস্থা এবং তাঁহাদিগের প্রতি ইংলণ্ডীয় নারীগণের কর্ত্তব্য, (৬) নারীগণের ধর্ম্মহীন শিক্ষা অনুচিত কিনা, কি প্রকার শিক্ষা দিলে নারীগণের সমগ্র উন্নতি হইতে পারে, (৭) নারীজীবনের উদ্দেশ্য। যে সব সভ্য সভায় নিয়মিত উপস্থিত হন তাঁহাদেরও নাম এইরূপ পাইতেছি, যথা—রাজলক্ষ্মী সেন, অন্নদায়িনী সরকার, মহামায়া বসু, মহালক্ষ্মী ঘোষ, মতিমালা দেবী, মালতীমালা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীলাসুন্দরী দাস, বরদাসুন্দরী চট্টোপাধ্যায়, নিস্তারিণী রায়, কৃষ্ণবিনোদিনী বসু, কুমারী সিংহ, কৈলাসকামিনী দত্ত, রাধারাণী লাহিড়ী। পূর্ব্ব বৎসরের মত এবারকার অধিবেশনগুলিতেও সময়ে সময়ে ইংরেজ ও বাঙালী মহিলারা উপস্থিত হইতেন।

আলোচ্য বার্ষিক অধিবেশনে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণ এবং কলিকাতার ভদ্রপরিবারস্থ বহু মহিলা উপস্থিত ছিলেন। কয়েকজন নূতন সভ্য মনোনয়নের পর 'বিজ্ঞান পাঠের আনন্দ ও উপকারিতা' এবং 'শিক্ষিতা রমণীগণের কর্ত্তব্য' বিষয়ে দুইটি বক্তৃতা পঠিত হয়। গৌরগোবিন্দ রায় (উপাধ্যায়), উমানাথ গুপ্ত, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ব্যক্তিগণ সময়োচিত বক্তৃতা প্রদান করেন। ইহার পর সভাপতি মহাশয় একটি সুদীর্ঘ, সরল ও মনোহর বক্তৃতা দ্বারা উপস্থিত সকলকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

বামাহিতৈষিণী সভার আর কোন বিবরণ এতাবৎ পাওয়া যায় নাই। কিছুকাল চলিবার পর এই সভাটির কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ "প্রচারকগণের সভায় নির্দ্ধারণ" নামক পুস্তকে (পৃ. ৬৪) ২৯ মাঘ ১৮০০ সালের সভায় এই নির্দ্ধারণটি পরিদৃষ্ট হয়,—'ব্রাহ্মিকা সমাজ এবং বামাহিতৈষিণী সভা পুনরুদ্দীপনের কথা হইল।' ইহার পর সভা

* বামাবোধিনী পত্রিকা—বৈশাখ ১২৭৯ (মে ১৮৭২)

যে পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাইতেছি। 'পরিচারিকা' আশ্বিন ১২৮৬ (১৮৭৯) সংখ্যায় "লণ্ডন" শীর্ষক একটি বক্তৃতা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পাদটীকায় আছে, "বামাহিতৈষিণী সভায় সভাপতি কর্ত্তৃক বিবৃত"। এই সময় 'আর্য্যনারী সমাজ' (মে, ১৮৭৯) ও 'বঙ্গমহিলা সমাজ' (আগষ্ট, ১৮৭৯) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমাজের, বিশেষ করিয়া স্ত্রীজাতির উন্নতিমূলক কার্য্যে ইঁহারা ক্রমে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু এ বিষয়ে উদ্যোক্তাদের মধ্যে বামাহিতৈষিণী সভাই প্রথম বলা চলে। ভারত সংস্কার সভার (Indian Reform Association) অধীনস্থ স্ত্রীজাতির উন্নতি বিভাগের সম্পাদকরূপে 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত এবং বামাহিতৈষিণী সভার সম্পাদক শিক্ষয়িত্রী ও বয়স্থা বিদ্যালয়ের ছাত্রী রাধারাণী লাহিড়ীর কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করিয়া কেশবচন্দ্রের ইংরেজী জীবনীকার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"The steadiness and perseverance with which this gentleman (Umesh Chandra Datta, Principal, City College, Calcutta), a veteran in the cause of female education, has laboured in this department of the work of the Brahmo Somaj, deserves the highest praise Miss Radharani Lahiri (Teacher, Bethune School, Calcutta) was the Secretary of the Bama Hitaishini Sava as long as the Society was alive Her example and acquirements, the devoted self-sacrifice with which she has given the best years of her life to the improvement of her sex, have won the admiration of the whole Brahmo Community. This gentleman and lady were of great service to Keshub's cause at this time." *

২। ভারতাশ্রম

গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকেই কেশবচন্দ্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া একদল যুবক গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। ক্রমে তাঁহারা নিজ নিজ পরিবার-পরিজনকেও লইয়া আসিতে বাধ্য হন। তাঁহাদের আশ্রয় বা আবাসস্থলের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতে লাগিল। প্রথমে অনেকে একক ভাবে পরস্পরকে সাহায্য করিতেন। কিন্তু ক্রমশঃ পরিবার সংখ্যা বর্দ্ধিত হইলে তাঁহারা কেহ কেহ একত্রে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। কেশবচন্দ্র এই সকল ব্রাহ্মকে একটি আদর্শ সুখী পরিবারে আবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ১৮৭২ সনের প্রারম্ভে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইলেন। এই বৎসর ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বেলঘরিয়ায় জয়গোপাল সেনের উদ্যানবাটিতে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। † কেশবচন্দ্র ইহার নাম দিলেন ভারতাশ্রম। আষাঢ় ১২৭৯ সংখ্যা 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় ভারতাশ্রম সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ বাহির হয়। ভারতাশ্রমের উদ্দেশ্য তাহাতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

"যখন পুরাতন হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সংস্কার এদেশে প্রবল ছিল, তখন নর-নারীর একই ভাব ও রীতি ছিল। সুতরাং তাহারা এক প্রকার সদ্ভাবে ও কুশলে থাকিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। কিন্তু এক্ষণে ইংরাজি শিক্ষা প্রভাবে হিন্দু সমাজের পত্তন ভূমি বিকম্পিত হইয়াছে

* The Life and Teachings of Keshub Chandra Sen, By P. C Mozoomdar, third edition, p 156

† আচার্য্য কেশবচন্দ্র ২য় খণ্ড—উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, পৃ. ৯২৭।

এবং রীতি পদ্ধতি আচার ব্যবহার, এমন কি মনের সংস্কার ও রুচি পর্য্যন্ত আন্দোলিত হইয়াছে। এ অবস্থায় ভগ্ন হিন্দু সমাজকে পবিত্র ধর্ম্ম ও উন্নত জ্ঞান অনুসারে পুনরায় গঠন করা আবশ্যক।

"এই উদ্দেশ্যেই ভারতাশ্রম খোলা হইয়াছে। কয়েকটি পরিবার নিয়মিত উপাসনা, বিদ্যাশিক্ষা ও স্বাস্থ্য সাধন দ্বারা বালক যুবা বৃদ্ধ সকলকে উন্নত করা সংস্থাপকদিগের লক্ষ্য। তাঁহাদের এই অভিপ্রায়, যে কিরূপে স্বীয় মন ও আত্মাকে রক্ষা করিতে হয়; পরস্পরকে ভাই ভগিনী বলিয়া ভালবাসিতে হয়; কিরূপে পিতামাতার সেবা ও সন্তান পালন করিতে হয়; ও কিরূপে ধর্ম্মের অনুগত হইয়া সাংসারিক যাবতীয় কার্য্য সমাধা করিতে হয়, তাহা সকলে শিক্ষা করেন।"

ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠা তখন যুবক-মনে কিরূপ উন্মাদনার উদ্রেক করিয়াছিল, কেশবের অনুরক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর নিম্নলিখিত কবিতাংশটি তাহার প্রমাণ,—

"ভারতাশ্রম বাসিদিগের প্রতি।

কোথাকার যাত্রি তোরা ভাই রে।
বাঁধ ভেঙ্গে আসে ঢেউ, এবার বাঁচবে না কেউ
প্রেম সাগরে লেগেছে তুফান।
ঘন ঘন ঢেউ উঠে, ব্রহ্মাণ্ড বা যায় ফুটে
উত্তরেতে ডাকিতেছে বাণ।
ওই ডেকে আসে বাণ, সামাল আমার প্রাণ
ঢেউ খা রে নির্ভয় অন্তরে;
ও ঢেউ লাগিলে গায়, মহাপাপী স্বর্গে যায়,
দুঃখীদের দুঃখ শোক হরে।
ব্রহ্মনাম হৃদে ধরে, ব্রহ্মেতে নির্ভর করে,
ক্ষণ কাল এই কিনারায়
সাবধানে বসে থাক্, আগে বাণ ডেকে যাক্
পরে পাড়ি দিবি পুনরায়।
ওই দেখ সারি গেয়ে, আনন্দে আসিছে ধেয়ে
ছোট বড় কতগুলি তরি;
বোধ হয় যাবে পারে, দেখ যেন ভুল না রে
কাছে এলে যাস্ সঙ্গ ধরি।

কোথাকার যাত্রি তোরা ভাই রে।
সারি গেয়ে উচ্চ স্বরে, মহা কোলাহল করে,
কোথা যাস্ একা আমি যেতে যে ডরাই রে!
বসে শুধু ভাবিতেছি তাই রে!..." *

---

* ধর্ম্মতত্ত্ব—১ ফাল্গুন ১৭৯৩ শক। শিবনাথ শাস্ত্রী 'আত্মচরিতে' লিখিয়াছেন,

"আমি কেশব বাবুর আশ্রমোৎসাহের মধ্যে প্রাণমন ঢালিয়া দিলাম। সে সময়ে আশ্রমের আবির্ভাব সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখি, তাহা বোধ হয় ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।" ২য় সং, পৃষ্ঠা, ১৮৩।

আশ্রমের বসবাস ও প্রাত্যহিক কার্য্য উক্ত নিবন্ধে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

"আশ্রম মধ্যে ভিন্ন লোক ও ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের জন্য স্বতন্ত্র ঘর আছে। আপন আপন নির্দ্দিষ্ট ঘরে তাঁহারা বাস করেন। উপাসনা বিদ্যাশিক্ষা ও আহার সাধারণ স্থানে নির্ব্বাহিত হয়। বায়ু সেবনের জন্যও নির্দ্দিষ্ট ছাদ আছে। ধর্ম্ম জ্ঞান সংসার সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন সময় নির্দ্দিষ্ট আছে; যথা :—

৬টা	হইতে	৭	পর্য্যন্ত	পাঠ
৭টা	...	৮	...	স্নান
৮টা	...	৯।৷৹	...	উপাসনা
৯।৷৹	...	১০	...	গৃহকার্য্য
১০টা	...	১০।৷৹	...	স্ত্রীলোকদিগের আহার
১০।৷৹	...	১১	...	পুরুষদিগের আহার
১১	...	১২	...	গৃহকার্য্য
১২	...	৫	...	বিদ্যালয়
৫	...	৬	...	গৃহকার্য্য
৬	...	৭	..	বায়ু সেবন
৭	...	৮	...	পাঠ
৮	...	৯	...	উপাসনা
৯	...	৯।৷৹	...	স্ত্রীলোকদিগের আহার
৯।৷৹	...	১০	...	পুরুষদিগের আহার
১০	...	১১	...	পাঠ
১১	...	৫	...	নিদ্রা

ভারতাশ্রমের সঙ্গে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় ও বামাহিতৈষিণী সভা যুক্ত হইল। একটি পুস্তকালয়ও স্থাপিত হইল। প্রতিষ্ঠাবধি প্রথম দুই মাস বেলঘরিয়ায় থাকিয়া এপ্রিল মাসে আশ্রমটি রাণী স্বর্ণময়ীর কাঁকুড়গাছিস্থ উদ্যানবাটিতে স্থানান্তরিত হয় এবং এখানে এক মাস অবস্থান করে। তৎপর ইহা কলিকাতায় ১৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে উঠিয়া আসে। আশ্রম পরিচালনা অর্থসাপেক্ষ। এ বিষয়ে উক্ত নিবন্ধে আছে,—

"আহার বিভাগে তত্ত্বাবধানের জন্য এক জন অধ্যক্ষ আছেন, তাঁহার এক জন বৈতনিক সহকারী আছেন। অধ্যক্ষ মহাশয় আহারের সমস্ত ব্যবস্থা করেন এবং যাহার যাহা প্রয়োজন তাহার বিধান করেন। সাধারণের জন্য অন্ন এবং রুটির বরাদ্দ আছে। রোগ বা অস্বাস্থ্য হেতু বিশেষ পথ্যের প্রয়োজন হইলে চিকিৎসকের বিধানানুসারে তাহা দেওয়া হয়।"

আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য প্রত্যেককে মাসে মাসে এইরূপ টাকা দেওয়ার বিষয় ধার্য্য হয়—পূর্ণবয়স্ক ৬৲ টাকা, ১০ বৎসরের ন্যূন বালকবালিকা ৩।৴৹ আনা, দুগ্ধপোষ্য ১।৷৹ আনা, ভৃত্য ৪।৹ আনা। এতদ্ব্যতীত দুগ্ধ, জলখাবার ইত্যাদির ব্যয় এবং ঘর-ভাড়া প্রত্যেকের স্বতন্ত্র দিতে হইত। এক জন অধ্যক্ষের হস্তে 'উপাসনার ও ধর্ম্মশাসনের' ভার অর্পিত ছিল।

সে যুগের নব্যবাংলার সামাজিক জীবন সংগঠনে ভারতাশ্রমের কৃতিত্ব অনন্যতুল্য। ভারত-

সংস্কার সভার বিবিধ বিভাগের কার্য্য সম্পাদনের জন্য এক দল নির্ভীক সাংসারিক চিন্তা-বিমুক্ত ত্যাগী কর্ম্মীর প্রয়োজন ছিল। ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠাবধি এরূপ কর্ম্মীদলের অভাব বিদূরিত হইল, তাঁহারা বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনা করিতে সক্ষম হইলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত (২য় সং, পৃ. ১৮১-৯৭) পাঠে ভারতশ্রম সম্পর্কে অনেক কথা আমরা জানিতে পারি। আশ্রমবাসীদের মধ্যে নানা বিষয়ে মতানৈক্য বিদ্যমান ছিল এবং কোন কোন বিষয়ে দ্বন্দ্ব, কলহ ভীষণাকার ধারণ করে। সংবাদপত্রেও নানারূপ সমালোচনা হইতে থাকে। কেশবচন্দ্র একবার একখানি সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে বিচারাদালতের শরণ লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভারতাশ্রমের সার্থকতা স্বতঃই আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। ভারতাশ্রমের শিক্ষয়িত্রী ও বয়স্থা বিদ্যালয়ের অন্যতম ছাত্রী সুদক্ষিণা গঙ্গোপাধ্যায় (পরে, সেন) ১৮৭৩ সনের ৮ই নবেম্বর এখানে আসিয়া যোগদান করেন। তখন আশ্রম ও বিদ্যালয় কলিকাতা ১৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে অবস্থিত ছিল। আশ্রমের লোকসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার অল্পকাল পরেই বর্ত্তমান ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউশনের বিপরীত দিকে আপার সারকুলার রোডের পূর্ব্ব পারে ব্রজনাথ ধরের বাগান ও পুকুরসহ একটি বৃহৎ বাটিতে স্থানান্তরিত হয়। সুদক্ষিণা স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে ভারতাশ্রমের আভ্যন্তরিক ব্যাপারাদি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"প্রচারক উমানাথ গুপ্ত মহাশয় ভারতাশ্রমের আহারের ভার লইয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি ছিলেন ম্যানেজার। প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া বাজার করিতে যাইতেন। প্রতিদিনই ঝুড়ী ঝুড়ী মাছ তরকারী ও কলাপাতা ক্রয় করিয়া আনিতেন—প্রতিদিনই ভোজ। এতগুলি লোকের দুই বেলা আহারের আয়োজন করা সহজ ব্যাপার ছিল না। রান্নাবাড়ীটি একটু দূরে পৃথক ছিল। সেটিও নিতান্ত ছোট নহে। দুই বেলাই আহারের জন্য ঘণ্টা পড়িত। ঘণ্টা শ্রবণ মাত্র আমরা নিজ নিজ গ্লাসে করিয়া এক গ্লাস জল লইয়া রান্নাবাটী অভিমুখে ছুটিতাম। দুই তিন জন ব্রাহ্মণ রন্ধন করিত, ও দুই তিনজনে পরিবেশন করিত। কলাপাতা ও আসন বিছান থাকিত।...

"আশ্রমের কথাই বলি। আমাদের ভারতাশ্রমের নিয়ম ছিল প্রত্যেক মেয়ে একদিন করিয়া একটি তরকারী রন্ধন করিবেন। আমি এক দিবস একটি ব্যঞ্জন রন্ধন করিব বলিয়া ভাণ্ডার হইতে আলু, নারিকেল, কিছু ছোলা ও তদুপযোগী তেল, ঘি, মশলা ইত্যাদি জোগাড় করিয়া লইলাম।...

"আমরা কখন কখন পুষ্করিণীতে সাঁতার দিতাম। ভারতাশ্রমের অনেক মেয়েরাই সাঁতার জানিতেন না। আমি পাড়া-গাঁয়ের মেয়ে; বাল্যকালেই সাঁতার দিতে শিখিয়াছিলাম। কার্য্যতঃ আমিই সর্ব্বাপেক্ষা সন্তরণপটু ছিলাম। এক দিন আশ্রমের পুষ্করিণীটি আমি সাত বার সাঁতার দিয়া পার হইয়াছিলাম। সেইসব আনন্দের দিন আর ফিরিয়া আসিবে না! স্মৃতির পটেই তাহাদের অনুলিপি সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।

"আমাদের ভারতাশ্রমের ডাক্তার ছিলেন দুকড়ি ঘোষ মহাশয়। তিনি প্রত্যহ সকলের ঘরে যাইয়া কে কেমন আছে সংবাদ লইতেন। কাহাকেও অসুস্থ দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। তাঁহার সুচিকিৎসায় আমাদের অসুখ পড়িলেও কখনও চিন্তিত হইতে হয় নাই।

"সর্ব্বাপেক্ষা প্রচারক কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় সকলকে স্নেহ করিতেন, তজ্জন্য সকলে তাঁহাকে 'মা' আখ্যা দিয়াছিলেন। কি ছেলে কি মেয়ে সকলকেই ইনি মায়ের মতন ভালবাসিতেন। প্রচারক মহাশয়ের বধূরাও ইঁহাকে শ্বশ্রূমাতার স্থানে পাইয়াছিলেন।"*

কেশবচন্দ্রের আদর্শ ছিল অতি উচ্চ। সেই আদর্শে পৌঁছিতে না পারিলে তিনি কিছুতেই মনে সোয়াস্তি পাইতেন না। এইজন্য যখন শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের কার্য্য পূর্ণোদ্যমে চলিতেছিল তাহার মধ্যেও তিনি একবার ছাত্রীদের শিক্ষা সম্বন্ধে স্বীয় অসন্তোষ ব্যক্ত করিতে ক্ষান্ত হন নাই। ১৮৭৪ সনে তিনি ভারতাশ্রম হইতে ঐ একই কারণে বেলঘরিয়ায় স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন।† ভারতাশ্রম ইহার পরও চারি বৎসরাধিককাল স্থায়ী ছিল। পরিশেষে কেশবচন্দ্রের সহকর্ম্মী প্রচারকদের জন্য১৮৭৯ সনের ২১শে জানুয়ারী আপার সারকুলার রোডে স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মিত হইলে আশ্রমটি উঠিয়া যায়। পরবর্ত্তীকালে বঙ্গদেশে যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নিষ্ঠাবান, স্বধর্ম্মপরায়ণ, আদর্শ মানুষ ও পরিবার সমূহের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার মূল পাই এই আশ্রমটির মধ্যে।

প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৫৭

* জীবন স্মৃতি— সুদক্ষিণা সেন, পৃ. ৯০-১, ৯৩।

† কেশবচন্দ্রের "সুখী পরিবার" পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।
(আচার্য্য কেশবচন্দ্র, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৯৭)

হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় ও বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

আমরা আজকাল বাংলার স্ত্রীশিক্ষার কথা আলোচনা করি। বঙ্গে ইদানীং নারীর উচ্চশিক্ষার যে আয়োজন চলিতেছে তাহার মূল সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ ধারণা থাকা আবশ্যক। কেশবচন্দ্র সেন স্বীয় শিক্ষয়িত্রী ও বয়স্থা বিদ্যালয়ে ইহার গোড়াপত্তন করেন। বিবাহিতা ও কুমারী নির্ব্বিশেষে নারীজাতির মধ্যে উচ্চশিক্ষার বহুল প্রচলন যে হইতে পারে তাহার উপায় প্রদর্শিত হয় হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় এবং ইহার আত্মজ বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় দ্বারা। আজিকার আলোচনায় এই কথাই বিশেষ করিয়া পরিস্ফুট হইবে।

১। হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়

কেশবচন্দ্র ১৮৭০ সনে কয়েক মাসের জন্য বিলাত গমন করেন। ভারতবর্ষে নারীজাতির শিক্ষাহীনতা এবং ইউরোপীয় মহিলাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি সেখানে একাধিক বক্তৃতা দেন। ব্রিষ্টলে কুমারী মেরী কার্পেণ্টার ভারতীয় নারীকুলের উন্নতির জন্য নেশন্যাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামে যে সভা গঠন করেন, কেশবচন্দ্র তাহার একজন প্রধান সহায়ক ছিলেন, পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে বলিয়াছি। তাঁহার বক্তৃতাদিতে বহু ইংরেজ মহিলা এদেশে আগমনান্তর শিক্ষাবিস্তারে মনোনিবেশ করিতে অভিলাষী হন। কেশবচন্দ্র বক্তৃতার মধ্যে একটি কথার উপর বিশেষ জোর দিতেন—কেহ যেন ধর্ম্মপ্রচারের ছল করিয়া শিক্ষা প্রচারোদ্দেশ্যে এদেশে না আসেন। তাহা হইলে পূর্ব্বে যেমন হইয়াছে, আসল উদ্দেশ্যই পণ্ড হইয়া যাইবে। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতাবলী অষ্টবিংশতি বর্ষীয়া জনৈকা কুমারী ইংরেজ মহিলার মনে ধরিল। তিনি কেশবচন্দ্রের প্রথম দিক্‌কার বক্তৃতা শুনেন নাই। বিলাত-ত্যাগের অল্পকাল পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে এই মহিলার আলাপ-পরিচয় হয়। ১৮৭০ সনের ১২ই সেপ্টেম্বর বিদায়কালীন বক্তৃতায় কেশবচন্দ্র যখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভারতীয় রূপে ("more Indian than ever") নিজেকে ব্যক্ত করেন তখন এই মহিলার মন তৎপ্রতি অধিক অধিকতর শ্রদ্ধান্বিত হইল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, ভারতবর্ষে গিয়া নারীশিক্ষায় আত্মনিয়োগ করিবেন।[১]

এই কুমারী মহিলাটির নাম এনেট একরয়েড। কেশবচন্দ্রের বিলাত ত্যাগের পর তিনি আরও কয়েকজন ভারতীয়ের সংস্পর্শে আসেন। মনোমোহন ঘোষ, কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত ও শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁহার ক্রমে পরিচয় হইল। একরয়েড বাংলা শিক্ষায় মন দিলেন। এদিকে লণ্ডনের শ্রমজীবী বিদ্যালয়ে অবৈতনিক শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যেও তিনি ব্রতী হন। কেশবচন্দ্র স্বদেশে ফিরিয়া ভারত-সংস্কার সভার অধীনে যে শিক্ষয়িত্রী ও বয়স্থা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন (১লা ফেব্রুয়ারী, ১৮৭১) তাহাতে পরে কুমারী একরয়েডের যোগদানের কথা

১। *Indian Called Them,* By Lord Beveridge, p. 85, 1947.

ছিল। কিন্তু বিলাত হইতে ১৮৭২ সনের মে মাসের এক পত্রে তিনি জানান যে এখানকার কার্য্য তিনি গ্রহণ করিতে পারিবেন না।[২] কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্প অটুট ছিল। তিনি কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠান বা দলের সঙ্গে যুক্ত না থাকিয়া স্বাধীনভাবে যাহাতে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে তৎপর হইতে পারেন তাহাই হইল তাঁহার মনোগত বাসনা। কুমারী এক্‌রয়েড ১৮৭২ সনের ২৫শে অক্টোবর বিলাত ত্যাগ করিয়া জাহাজযোগে পরবর্ত্তী ১৫ই ডিসেম্বর কলিকাতায় উপনীত হন। ইহার অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে কুমারী মেরী এ্যান কুক নামে এইরূপ আরও একটি মহিলা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারকল্পে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তবে উভয়ের উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি মূলগত পার্থক্য ছিল। সে যুগে শিক্ষাবিস্তার এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার একই পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত। অর্দ্ধশতাব্দী পরে সাধারণ ইংরেজ নরনারীর মন হইতে ধর্ম্মপ্রচারের আকাঙ্ক্ষা অনেকটা তিরোহিত হয়। কুমারী এক্‌রয়েড শিক্ষাবিস্তারে সহায়তা করিবার জন্যই এদেশে আগমন করিলেন।

কলিকাতায় পদার্পণ করিয়া এক্‌রয়েড পূর্ব্বপরিচিত ব্যারিষ্টার, স্ত্রীশিক্ষার একান্ত অনুরাগী মনোমোহন ঘোষের ভবনে গমন করিলেন। এইখানেই তিনি এক বৎসর কাল থাকিয়া একটি উন্নত ধরণের বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ-আয়োজন করিতে আরম্ভ করেন। কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত প্রমুখ বাঙালী বন্ধুদের সঙ্গেও তাঁহার দেখাসাক্ষাৎ হইল। শিক্ষয়িত্রী ও বয়স্থা বিদ্যালয়ে কর্ম্মগ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেও এক্‌রয়েডের কলিকাতায় আগমনের পরই স্ত্রীজাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিকামী কেশবচন্দ্র আসিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলেন। উদ্দেশ্যসাম্য হেতু তিনি তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করিতে অগ্রসর হন। এক্‌রয়েড কেশব-প্রতিষ্ঠিত ভারতাশ্রম, শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়, বামাহিতৈষিণী সভা প্রভৃতি বিশেষ যত্নের সহিত পরিদর্শন করেন। আবার মিস্ চেম্বারলেন, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে ১৮৭৩, ৮ই জানুয়ারি হইতে চারি দিবসকাল শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পরীক্ষাও লইয়াছিলেন।[৩]

ইহার পর যাহাতে শীঘ্র একটি মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে কুমারী এক্‌রয়েড যত্নশীল হন। এজন্য কয়েকজন ইংরেজ ও বাঙালী প্রধান লইয়া একটি কমিটিও গঠিত হইল। 'বামাবোধিনী পত্রিকা' (ফাল্গুন ১২৭৯) লেখেন :

"আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম কুমারী য়্যাক্‌রয়েড স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপন করিবার কল্পনা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতার প্রধান বিচারালয়ের সুযোগ্য বিচারপতি ফিয়ার সাহেব ও তাঁহার বিবি, অন্যতর বিচারপতি বাবু দ্বারকানাথ মিত্র, এবং দুর্গামোহন দাস, বাবু কেশবচন্দ্র সেন, বাবু মনোমোহন ঘোষ, উক্ত সভার সভ্য হইলেন, এবং কুমারী য়্যাক্‌রয়েড সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন, কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে এমন একটি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে, যাহাতে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষাতে উৎকৃষ্ট শিক্ষা দেওয়া হইবে। দশ বারোটি ছাত্রী হইলেই কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে। আমরা শুনিলাম ২।৫ জন এখনি ছাত্রী শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের মাসিক ব্যয়ের

২। *The Englishman*, 31 May, 1873.

৩। বামাবোধিনী পত্রিকা, মাঘ ১২৭৯

জন্য এক সহস্র টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এইটি চাঁদা দ্বারা তুলিতে হইবে। প্রধান শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করিবার জন্য বিলাত হইতে একজন উপযুক্ত বিবিকে আনিবার কথা হইতেছে।"

কিন্তু কমিটি গঠনের অল্পকালের মধ্যেই কেশবচন্দ্রের সঙ্গে এক্রয়েডের মতভেদ উপস্থিত হইল। কেশবচন্দ্র কমিটির নিকট ১৮৭৩, মে মাসে পদত্যাগপত্র প্রেরণ করিলেন। এক্রয়েডের মতামত লইয়া 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-এ বিরুদ্ধ সমালোচনা হইতে লাগিল। এই বিতর্ক ও বাদানুবাদ 'ইংলিশম্যান' কাগজে পর্য্যন্ত গড়াইল। বাখরগঞ্জ জেলার তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট হেনরি বিভারিজ স্ত্রীশিক্ষার অনুরাগী ছিলেন। তিনি প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের জন্য এককালীন এক শত টাকা দান করেন। তিনি এই বাদানুবাদের কথা জানিয়া কুমারী এক্রয়েডকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দেন এবং এই বিষয়ে তাঁহার ও কেশবের মধ্যে মিটমাটের ব্যবস্থা করিতেও অগ্রসর হন। মনোমোহন ঘোষ প্রমুখ অতিরিক্ত পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন (anglicised) ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিয়া কার্য্য করিলে তাহা যে সাধারণগ্রাহ্য না-ও হইতে পারে সে বিষয়েও তিনি তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দেন।[৪] কিন্তু কুমারী এক্রয়েড ছিলেন বড়ই জেদী মহিলা। তিনি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। কতকগুলি বিষয়ে তিনি যে দৃঢ় মত পোষণ করিতেন এবং তাহা যে সময় সময় উগ্রতার পর্য্যায়ে উঠিত, রাজনারায়ণ বসু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তাহা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।[৫]

যাহা হউক, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে আয়োজন চলিতে লাগিল। মনোমোহন ঘোষ, দুর্গামোহন দাস, মহারাণী স্বর্ণময়ী, বিচারপতি ফিয়ার ও তদীয় পত্নী এমিলি ফিয়ার, কুমারী এক্রয়েডের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিশেষ রূপে সহায়তা করিতে থাকেন। সাময়িক ও মাসিক অর্থ সংগ্রহেরও ব্যবস্থা হইল।[৬] কেশবচন্দ্র কমিটি ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধন বিভাগের মুখপত্র 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় এ বিষয়ে উদ্যোগ-আয়োজনের কথা প্রকাশিত হইতে লাগিল। জ্যৈষ্ঠ ১২৮০ সংখ্যায় এই পত্রিকা লেখেন :

৪। *India Called Them,* p.100.

৫। রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত, পৃ. ১৯৪-৬।

৬। কুমারী এক্রয়েডের প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের জন্য এককালীন দান ও মাসিক দানের একটি তালিকা এই,

এককালীন দান : মহারাণী স্বর্ণময়ী ৫০০, বর্দ্ধমানের মহারাজা ৫০০, রাজা প্রাণনাথ রায় ২০০, অনারেবল হব্‌হাউস ২০০, ও, সি, মল্লিক, ভাগলপুর ১০০, হেনরি বিভারিজ ১০০, কুমারী এক্রয়েড ১০০, এল, সি, বাঁড়ুয্যে-পত্নী ও ৭ জন বন্ধু ৪১, ডাঃ শ্যামমাধব রায়, নদীয়া, ২৫, বি, বি, ঘোষ, ফরিদপুর ১০, এ, এম, বসু, কেম্‌ব্রিজ ১০, শ্রীনাথ ঘোষ ১০, তারকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১০, মন্মথ মল্লিক, লণ্ডন ১০, কে, জি, গুপ্ত, লণ্ডন ৫, পি, কে, রায়, লণ্ডন ৫, শ্রীনাথ দত্ত, লণ্ডন ৫, ডি, এন্, দে, লণ্ডন ৫।

মাসিক চাঁদা : বিচারপতি ফিয়ার ৪৫, কুমারী এক্রয়েড ৪৫, ডাঃ কে, ডি, ঘোষ, রঙ্গপুর ২০, মনোমোহন ঘোষ ২০, ডাঃ বন্ধুবিহারী গুপ্ত, বর্দ্ধমান ২০, ডব্‌লিউ, এল, হিলী, সি, এস, ১০, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি, এস, ১০, রাখালচন্দ্র রায় ১০, পার্ব্বতীচরণ দাস, পূর্ণিয়া ১০, প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এলাহাবাদ ২ ইত্যাদি। *The Englishman,* May 20, 1873.

"মিস্ এক্রয়েডের প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে দুইটি ছাত্রীবৃত্তি দিবার জন্য মিস্ কার্পেণ্টার হাজার টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছেন। বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রীদ্বয় মনোনীত করিবেন।"

আয়োজন অনেকটা অগ্রসর হইলে ২৯শে আগষ্ট ১৮৭৩ তারিখে 'ভারত-সংস্কারক' 'অবলাবান্ধবে'র উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলেন :

"অবলাবান্ধব লিখিয়াছেন, কুমারী এক্রয়েডের প্রস্তাবিত নারী বিদ্যালয় সম্ভবতঃ নবেম্বর মাসে খোলা হইবে।... বিদ্যালয়ের নাম 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' হইবে।"

প্রতি মাসে যথোপযুক্ত অর্থাগমের ব্যবস্থা হইলে কুমারী এক্রয়েডের তত্ত্বাবধানে ১৮৭৩ সনের ১৮ই নবেম্বর ২২নং বেনিয়াপুকুর লেনে পাঁচটি ছাত্রী লইয়া হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় নামে একটি বোর্ডিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংবাদ দিয়া 'ভারত-সংস্কারক' ১৮৭৩, ২৮শে নবেম্বর লিখিলেন :

"গত বারের পূর্ব্ব মঙ্গলবারে [১৮ নবেম্বর] মিস্ এক্রয়েডের স্কুল খুলিয়াছে। আপাততঃ ৫টি ছাত্রী সংগৃহীত হইয়াছে, শিক্ষকের বন্দোবস্ত শীঘ্র হইবে। আমরা আশা করি বিদ্যালয়টির নাম যখন হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় হইয়াছে, ইহার সকল ব্যবস্থা তদনুযায়ী হইবে, তাহা হইলে ছাত্রীর অভাব অপূর্ণ থাকিবে না।"

বিদ্যালয়ের কার্য্য সুচারুরূপে আরম্ভ হইল। প্রতিষ্ঠার অল্প দিন পরে 'বামাবোধিনী পত্রিকা'ও (অগ্রহায়ণ ১২৮০) লেখেন :

"মিস্ আক্রয়েডের বিদ্যালয়ের কার্য্য সুন্দররূপে আরম্ভ হইয়াছে শুনিয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম। অধিক আহ্লাদের বিষয় এই উক্ত গুণবতী রমণী ছাত্রীগণকে গৃহকার্য্যে সুশিক্ষিত করিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। আমরা আশা করি ছাত্রীগণের জ্ঞান চরিত্র এবং কার্য্যদক্ষতা এই তিনের যাহাতে সমঞ্জস উন্নতি হয়, এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে।"

হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বার্ত্তা কুমারী এক্রয়েডের নিজ আবাসভূমি ইংলণ্ডের ঈষ্ট ওর্ষ্টারশায়ারেও গিয়া পৌঁছিল, সেখানকার *Brierly Hill Advertiser* নামক সংবাদপত্রেও এই বিদ্যালয়ের কথা প্রকাশিত হয়। ইহাতে বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য এবং শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এই পত্রিকাখানি লিখিলেন :

"Miss Akroyd has formed a school for Hindoo ladies. The general committee is strong in both European and native members of standing. The object of the school 'is to give thorough instruction on principles of the strictest theological neutrality. The subjects taught are arithmetic, physical and political geography, the elements of physical science, Bengali and English reading, grammar and writing, history and needlework." Great attention is to be given to the training of the pupils in practical housework and to the formation of orderly and industrious habits.'[7]

অর্থাৎ, হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ে বিশেষ কোন ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া রীতিবিরুদ্ধ। এখানকার অধিতব্য বিষয়—গণিত, ইতিহাস, ভূগোল (প্রাকৃতিক ও সাধারণ), প্রাথমিক বিজ্ঞান, বাংলা, ইংরেজী, ব্যাকরণ, লিখন এবং সূচীকর্ম্ম। পূর্ব্বে যেমন উক্ত হইয়াছে, গৃহকার্য্য এখানকার শিক্ষণীয় বিষয় হইল। ছাত্রীগণ নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া শ্রমসাধ্য কার্য্যে

৭। *India Called Them*, p.72.

যাহাতে অভ্যস্ত হয় সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইত। বিলাতে যেমন বোর্ডিং স্কুল, হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ও এই ধরণের একটি বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ছাত্রীগণ শিক্ষালাভের সময় এখানে বসবাস করিয়া প্রকৃত বিদ্যা অর্জ্জন এবং জীবন ও কর্ম্মে তাহা বিনিয়োগ করিবার পূর্ণ সুযোগ লাভ করিত।

প্রথমে কথা ছিল, বিলাত হইতে একজন শিক্ষয়িত্রী আনয়ন করিয়া তাঁহার উপর বিদ্যালয় পরিচালনার ভার অর্পণ করা হইবে। যত দিন না এরূপ শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হন, তত দিন কুমারী এক্রয়েড অবেতনে বিদ্যালয় তত্ত্বাবধান করিবেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এরূপ অভিপ্রায় পরিত্যক্ত হয়। কুমারী এক্রয়েডই বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ও তত্ত্বাবধায়িকা পদ গ্রহণ করেন। এক্রয়েড বাদে একজন দ্বিতীয় শিক্ষয়িত্রী এবং একজন পণ্ডিতও শিক্ষাদান কার্য্যে নিয়োজিত হন। এই পণ্ডিত 'অবলাবান্ধব'-সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। বিচারপতি ফিয়ার-পত্নীও এই বিদ্যালয়ে অবেতনে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতেন—বিভিন্ন স্থানে এইরূপ বলা হইয়াছে। মনে হয় দ্বিতীয় শিক্ষয়িত্রী ফিয়ার-পত্নী এমিলি ফিয়ার। তিনি এই বিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ এবং সম্পাদক বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছেন।[৮] কুমারী এক্রয়েডের বিদ্যালয় ত্যাগের পরে তিনি স্বয়ং বিদ্যালয়টি এক বৎসরকাল পরিচালনা করেন।

হিন্দুমহিলা বিদ্যালয় পরিচালনায় যাঁহারা উপদেশ ও অর্থ দিয়া কুমারী এক্রয়েডকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেন তাঁহাদের মধ্যে দুর্গামোহন দাস ও তদীয় পত্নী ব্রহ্মময়ী দেবীর নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বিদ্যালয়ের পণ্ডিত দ্বারকানাথ লিখিয়াছেন :

"কুমারী এক্রয়েড স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, যেদিন আমি শুনিব ইঁহাদিগের যত্ন শিথিল হইয়াছে, ইঁহার নিজ কন্যাদিগকে শিক্ষা দানের অন্য উপায় দেখিতেছেন, আমি সে দিনই স্বদেশে প্রতিগমন করিব।"[৯]

সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও এই বিদ্যালয়ের বিশেষ যোগ ছিল। বিলাতে অবস্থানকালে কুমারী এক্রয়েড তাঁহার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন। কার্পেন্টার মহোদয়ার দান ও বৃত্তিলাভের উপযোগী ছাত্রী নির্ব্বাচনের ভার শশিপদের উপর দেওয়া হইয়াছিল বলিয়াছি। তিনি এই বিদ্যালয়ের কার্য্যকরী সমিতির একজন বিশিষ্ট সভ্য হইয়াছিলেন।[১০]

হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ পরে বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। বিদ্যালয়ের প্রধানা ছাত্রীদের মধ্যে ছিলেন : স্বর্ণপ্রভা বসু (আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর ভগিনী ও আনন্দমোহন বসুর পত্নী), সরলা দাস (দুর্গামোহন দাসের কন্যা ও ডক্টর পি. কে. রায়ের পত্নী), হরসুন্দরী দত্ত, স্বর্ণময়ী দত্ত, স্বর্ণময়ী চট্টোপাধ্যায় (পরে পার্ব্বতীনাথ দাসগুপ্তের পত্নী), বিনোদমণি বসু (মনোমোহন ঘোষের ভাগিনেয়ী), কাদম্বিনী বসু (মনোমোহন ঘোষের মামাতো ভগিনী এবং পরে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্নী), গিরিজাকুমারী সেন (শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী) ও অবলা দাস (দুর্গামোহন দাসের কন্যা ও আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের পত্নী)।[১১]

৮। "...becoming in 1873 treasurer and secretary of Miss Akroyd's School."—*India Called Them*, p. 407.

৯। জীবনালেখ্য, ২য় সং, পৃ. ৫১।

১০। নবযুগের সাধনা—কুলদাচরণ মল্লিক, পৃ. ২০০-১।

১১। বাংলার নারী-জাগরণ—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ৬৫।

বিদ্যালয়টি কুমারী এক্রয়েডের তত্ত্বাবধানে ১৮৭৫ সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়। এই সনের ৬ই এপ্রিল তিনি কলিকাতায় বসিয়া ১৮৭২-এর তিন আইন অনুযায়ী বাখরগঞ্জের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হেনরি বিভারিজের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন।[১২] ইহার পরেই তিনি স্বদেশে চলিয়া যান। তখন বিদ্যালয়ের ভার বিচারপতি ফিয়ারের পত্নী এমিলি ফিয়ার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে এক বৎসর চলিবার পর ১৮৭৬ সনের মার্চ্চ মাসে ইহা উঠিয়া যায়।[১৩]

২। বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়

হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী দুর্গামোহন নিজ কন্যাদ্বয় এবং আশ্রিত মহিলাদের এখানে রাখিয়া শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়টি উঠিয়া যাওয়ায়, তিনি নিশ্চেষ্ট রহিতে পারিলেন না। ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসুর সহিত মিলিত হইয়া তিনি এই বিদ্যালয়টি পুনঃপ্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই বিষয়ে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের পণ্ডিত 'অবলাবান্ধব'-সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও বিশেষ উদ্যোগী হইলেন। ১৮৭৬ সনের ১লা জুন ওল্ড বালিগঞ্জ রোডে উক্ত বিদ্যালয়টি পুনরুজ্জীবিত হইল। এই সময়ে ইহার নাম দেওয়া হয় 'বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়'। এটিও বোর্ডিং স্কুল, পূর্ব্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণই এখানকার ছাত্রী হইলেন এবং এখানে বাস করিয়া শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, তিনি সাউথ সুবার্ব্বান স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া ভবানীপুরে বাস করিতেছিলেন। দ্বারকানাথের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তাঁহার প্রথমা কন্যা হেমলতাকে এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন।[১৪]

বারটি ছাত্রী লইয়া বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় খোলা হইল। ছয় মাসের মধ্যে ছাত্রী-সংখ্যা বাড়িয়া সতরটিতে দাঁড়ায়। এই ছাত্রীদের মধ্যে অবিবাহিতা ও বিধবা নারী ছিলেন। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার এক মাস পরে, জুলাই মাসে সুবার্বান মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত বালিকা বিদ্যালয়সমূহের একটি বৃত্তি-পরীক্ষা হয়। ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয় হইতে চতুর্থ পরীক্ষায় ৩, তৃতীয় পরীক্ষায় ৩, দ্বিতীয় পরীক্ষায় ১০ এবং প্রথম পরীক্ষায় ২৭ জন, একুনে ৪৩ জন বালিকা পরীক্ষা দিয়াছিলেন। পরীক্ষোত্তীর্ণা তেরটি ছাত্রীর মধ্যে পাঁচটিই বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের, এবং প্রথম তিনটি পরীক্ষায় তাঁহারাই প্রথম স্থানগুলি অধিকার করিয়া যথাক্রমে ৪, ৩, ও ২ মাসিক বৃত্তি লাভ করেন। 'বামাবোধিনী পত্রিকা' (শ্রাবণ ১২৮৩) হইতে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নাম ও পরীক্ষার ফলাফল এখানে প্রদত্ত হইল :

পরীক্ষা	বয়ঃক্রম	বিদ্যালয়ের নাম	পূর্ণসংখ্যা	প্রাপ্ত সংখ্যা
৪র্থ পরীক্ষা	...	...	২৫০	...
কাদম্বিনী বসু	১৪	বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়	"	১৫১
সরলা দাস	১৪	"	"	১৩৮।

১২। *India Called Them,* p. 127.

১৩। নববার্ষিকী, ১৮৭৭, পৃ. ১৯৫।

১৪। শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত, ২য় সং, পৃ. ২১১।

পরীক্ষা	বয়ঃক্রম	বিদ্যালয়ের নাম	পূর্ণসংখ্যা	প্রাপ্ত সংখ্যা
তৃতীয় পরীক্ষা				
সুবর্ণপ্রভা বসু	১৪	”	”	১২৮।।০
২য় পরীক্ষা				
অবলা দাস	১১	”	২০০	১০৯।।০
সরলা মহলানবিশ	১১	”	”	১০৮

উক্ত পত্রিকা বলেন, “চতুর্থ পরীক্ষায় বালিকাগণ যেরূপ ইংরেজী রচনা করিয়াছেন এন্ট্রাস শ্রেণীর ছাত্রেরা সেরূপ পারেন কিনা সন্দেহস্থল।” বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পরে এই পরীক্ষাগুলি গৃহীত হয়। কাজেই ইহার পূর্ব্ববর্তী হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ে এই সকল ছাত্রী কিরূপ উন্নত সুষ্ঠ শিক্ষা পাইয়াছিলেন, এতদ্দারা তাহাও সূচিত হইতেছে।

দুই জন শিক্ষয়িত্রী ও একজন শিক্ষক লইয়া বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রধানা শিক্ষয়িত্রী বা লেডী সুপারিণ্টেডেণ্ট ছিলেন মিসেস্ সেভিল—তাঁহার মাসিক বেতন এক শত টাকা। দ্বিতীয় শিক্ষয়িত্রীর নাম কুমারী ক' (Miss Caw)—বেতন ত্রিশ টাকা। কিছুকাল পরে তিনি অন্যত্র চলিয়া গেলে তাঁহার স্থলে নিয়োজিত হন কুমারী বির্‌লী। বাংলা শিক্ষক ছিলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি প্রতি মাসে চল্লিশ টাকা করিয়া বেতন লইতেন। দ্বারকানাথ সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী বলেন, শুধু “শিক্ষক কেন, তিনি দিনরাত্রি বিশ্রাম না জানিয়া ঐ স্কুলের উন্নতি সাধনে দেহমন নিয়োগ করিলেন।”[১৫]

দুর্গামোহন দাসের সহধর্ম্মিণী ব্রহ্মময়ী দেবীরও এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিশেষ আগ্রহ ছিল। দাস-দম্পতি বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ে নিজ কন্যাগণ ও আশ্রিত স্কুলকন্যাদের শিক্ষার নিমিত্ত প্রতিমাসে শতাধিক টাকা ব্যয় করিতেন। ১৮৭৬ সনের ৫ই নবেম্বর পত্নী ব্রহ্মময়ীর মৃত্যু হইলে দুর্গামোহন তাঁহার স্মরণার্থ এই বিদ্যালয়ে এককালীন পাঁচ শত টাকা দান ও মাসিক দশ দশ টাকার দুইটি ছাত্রীবৃত্তি সংস্থাপন করেন।[১৬]

আনন্দমোহন বসুও বিদ্যালয়ের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন। বস্তুতঃ প্রায় এক বৎসর কাল যাবৎ ছাত্রীবেতন এবং ব্যক্তিগত দানের উপর নির্ভর করিয়াই ইহার কার্য্য চলিয়াছিল। দ্বিতীয় বৎসরে,১৮৭৭ সনে সুবার্বান মিউনিসিপালিটি এবং বাংলা-সরকার প্রত্যেকের নিকট হইতে প্রতি মাসে পঁচাত্তর টাকা করিয়া সাহায্য পাওয়া যাইতে লাগিল।

উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর শিক্ষায় ও তত্ত্বাবধানে ছাত্রীগণ পাঠে বিশেষ উৎকর্ষলাভ করিলেন। ১৮৭৭ সনে প্রথম শ্রেণীর দুই জন ছাত্রী—কাদম্বিনী বসু ও সরলা দাস প্রবেশিকা এবং অপর তিন জন মাইনর ও মধ্য বাংলা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন। এ বৎসর বালিগঞ্জে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁহারা প্রত্যেকেই ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়েন। তখন তাঁহাদের পক্ষে পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় নাই। তবে এই বৎসর (১৮৭৭) প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিনী ছাত্রীদ্বয়ের প্রারম্ভিক পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। তাহাতে ইংরেজী সাহিত্যের পরীক্ষক ছিলেন মিঃ পোপ, অঙ্কশাস্ত্রের মিঃ গ্যারেট, ইতিহাস ও ভূগোলের ডক্টর পাদ্রী কৃষ্ণমোহন

১৫। শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত, পৃ. ২১১।

১৬। নববার্ষিকী, ১৮৭৭, পৃ. ২২।

বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাংলার পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। পরীক্ষকগণ প্রত্যেকেই এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, উভয় ছাত্রীই প্রবেশিকা পরীক্ষায় সাফল্যলাভে সমর্থ হইবেন। ১৮৭৭ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে বড়লাট-পত্নী লেডি লিটন বিদ্যালয়টির পরিচালনা-নৈপুণ্য এবং ছাত্রীগণের আচার-ব্যবহারে বিশেষ তৃপ্তিলাভ করেন।[১৭] শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর ১৮৭৬-৭৭ সনের বার্ষিক বিবরণে (পৃ. ৭৭) এই বিদ্যালয়টির উৎকর্ষ সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করেন :

"The Mirzapore school is maintained by Babu Keshub Chunder Sen; it is rather an adult female school than a normal school, its objects being similar to those of the Banga Mahila Vidyalaya, with which it may shortly be amalgamated. The latter is in every sense the most advanced school in Bengal. It was formerly managed in Calcutta by Miss Akroyd, and lately revived by some Bengali gentlemen who desire to see girls appearing at the University-examination at the new college for women at Cambridge. Mr. Garret found the first class consisting of two girls upto the standard of the second class of Zillah schools in Euclid and Algebra; he considers that, as far as these subjects are concerned, there is no reason why they should not go up to the examination at the end of the year. The managers are applying for a large grant, and the school unquestionably deserves encouragement. It is the first attempt to establish a higher English boarding school for girls, such as Mr. C. B. Clarke advocated some years ago."

এই মন্তব্যে পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষকগণের উক্তিই প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় এবং কেশবচন্দ্রের শিক্ষয়িত্রী ও বয়স্থা নারী বিদ্যালয় যে একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত, ইহা হইতে তাহাও বুঝা যাইতেছে। তবে এই বিবরণে বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়কে বঙ্গদেশে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত নারী বিদ্যালয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানকার শিক্ষাদান প্রণালীও জীবনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়া অনুসৃত হইত। এখানে ইংরেজী, বাংলা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি সাধারণ বিষয় তো ছাত্রীগণকে শিক্ষা দেওয়া হইতই, এসব বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, সূচীকর্ম্ম, বুনন প্রভৃতি বিষয়সমূহও তাঁহারা শিক্ষা করিতেন। ছাত্রীদের পালাক্রমে রন্ধনকার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হইত। বিদ্যালয়-সংক্রান্ত হিসাবপত্র রক্ষায়ও তাঁহারা তত্ত্বাবধায়িকাকে সাহায্য করিতেন। সঙ্গীত সম্পর্কে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বারকানাথ ছাত্রীদের জন্য তৎকালীন জাতীয় ভাবোদ্দীপক সঙ্গীতগুলি সঙ্কলন করিয়া একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন এবং ইহার নাম দেন "জাতীয় সঙ্গীত" (১৮৭৬)। তিনি ছাত্রীদের উপযোগী পাঠ্য পুস্তক রচনায়ও তৎপর হইয়াছিলেন।

বেথুন স্কুল পরিচালনার জন্য সরকার বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতেন। কিন্তু ইহা তখনও পর্য্যন্ত একটি শিশু-বিদ্যালয় ("nursery school") মাত্র ছিল। স্কুল কমিটির সভাপতি ছিলেন বিচারপতি ফিয়ার। তিনি কুমারী একরয়েড-পরিচালিত বিদ্যালয়টির কথাও বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। তাঁহার পত্নী এমিলি ফিয়ার এই বিদ্যালয়টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে যুক্ত হন এবং কুমারী একরয়েডের বিবাহের পরও এক বৎসর কাল ইহার পরিচালনা করেন বলিয়াছি।

১৭। *The Brahmo Year Book for 1876*, By Sophia Dobson Collet, London, p. 49.

বিচারপতি ফিয়ার বেথুন স্কুল কমিটির সভাপতি রূপে ইহার উন্নতির উদ্দেশ্যে ১৮৭৬ সনের মধ্যভাগে বিলাত-যাত্রার প্রাক্কালে শিক্ষা-বিভাগকে একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া যান। তিনি এই পত্রে বালিগঞ্জের বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের সঙ্গে বেথুন স্কুলের মিলনের প্রস্তাব করেন।[১৮] তখন নানারূপ বিঘ্ন থাকায় উভয় বিদ্যালয়ের মিলন সংঘটিত হইতে পারে নাই। শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষও যে বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের উন্নততর পঠন-পাঠন ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তাহা আমরা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি। ১৮৭৮, ৮ই এপ্রিল বেথুন স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ উৎসবে লেফ্‌টেনান্ট গবর্ণর সার এশলী ইডেন বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়কে একটি উৎকৃষ্ট শিক্ষায়তন ("excellent institution") বলিয়া উল্লেখ করেন। এই সময়ে উভয় বিদ্যালয়ের মিলনের সম্ভাবনার কথাও তিনি বলিয়াছিলেন। এই বৎসরই কয়েকটি সর্ত্তসাপেক্ষ ১৮৭৮ সনের ১লা আগষ্ট বেথুন স্কুল ও বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় সম্মিলিত হয়।[১৯] এ বিষয়ে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর ১৮৭৮-৭৯ সনের বার্ষিক বিবরণে (পৃ. ৮১) এইরূপ লেখেন :

"The amalgamation of the school (Bethune School) with the Ballygunge Banga Mahila Vidyalaya has been effected since the date of the last report. The circumstances of the amalgamation are briefly as follows : In 1873 the last named school, which is described as a 'boarding school upon the advanced principles of education', was established at Ballygunge, chiefly through the exertions of Mr. Justice Phear and of some ladies of Calcutta. In 1875 (?) Mr. Phear, who was the President of the Bethune School Committee, was of opinion that the school would have a wider scope if the Ballygunge school was amalgamated with it; but as there were difficulties at the time in the way, it was not till the year under report that the plan could be carried out. The house of the Bethune School, formerly occupied by the Lady Superintendent, was rearranged to accommodate the new pupils, and at the date of report there were 15 grown pupils boarding at the school."

বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় যখন বেথুন স্কুলের সহিত যুক্ত হয়, তখন ইহার ছাত্রীসংখ্যা ছিল চৌদ্দ জন। ইহাদের মধ্যে এগার জন সম্মিলিত বিদ্যালয়ে রহিয়া গেলেন।[২০] সম্মিলিত বেথুন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-সভায় বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের পক্ষে দুর্গামোহন দাস ও আনন্দমোহন বসু অধ্যক্ষরূপে গৃহীত হইলেন।[২১] এই বিদ্যালয় হইতে ১৮৭৮ সনে প্রবেশিকা ও অন্যান্য পরীক্ষায় যেসব ছাত্রী বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন তাঁহারা সকলেই বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় হইতে আগত। কাজেই তাঁহাদের কৃতিত্বের কথাও সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে এখানে উল্লেখ করিতে হয়। 'সংবাদ প্রভাকর' (৬ মার্চ্চ, ১৮৭৯) লেখেন :

"রমণীদিগকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দান করিতে দিবার স্বত্ব দেওয়ায়, এই

১৮। *Report of the Director of Public Instruction for 1876-77*, p. 74.

১৯। সংবাদ প্রভাকর, ৬ই মার্চ্চ, ১৮৭৯।

২০। *The Brahmo Year Book for 1878*, pp. 88-9.

২১। সংবাদ প্রভাকর, ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৯।

বিদ্যালয়ে নবপ্রবিষ্ট ছাত্রী শ্রীমতী কাদম্বিনী বসু প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণা হইয়াছে। কেবল এক সংখ্যার জন্য প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণা হইতে পারে নাই। মান্যবর লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর পরম তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দুই বৎসরের কারণ একটি বৃত্তি দান করিয়াছেন, এবং ৫০ মূল্যের পুস্তক দান করিয়াছেন। এই উপলক্ষে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর আরও ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, যে সকল ছাত্রী প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণা হইবে, তাহারা মাসিক ১৫ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইবে। বেথুন বিদ্যালয়ের অন্যান্য অনেক ছাত্রী যথেষ্ট সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ১৪ বর্ষ বয়স্কা ছাত্রী শ্রীমতী কামিনী সেন মধ্যম শ্রেণীর ইংরেজী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণা হইয়াছেন। কলিকাতা হইতে ১৬ জন তাঁহাপেক্ষা অধিকবয়স্ক ছাত্র পরীক্ষা দেয়। ইহার মধ্যে কামিনী অনুবাদে সর্ব্বপ্রথম, গণিতে চতুর্থ, এবং সাধারণ্যে চতুর্থ হইয়াছেন। অপর এক ছাত্রী শ্রীমতী অবলা দাসী যিনি ঐ পরীক্ষা দেন, তিনিও দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং শ্রীমতী (সুবর্ণপ্রভা) বসু যিনি বাঙ্গালায় ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেন তিনিও দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণা হইয়াছেন।"

ইহার পর বেথুন বিদ্যালয়ের দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণা কাদম্বিনী বসু কলেজে পড়িবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে একমাত্র তাঁহাকে লইয়া বেথুন স্কুলের সঙ্গে এফ্-এ ক্লাস খোলা হইল। ক্রমে বি-এ শ্রেণীও খোলা হয়। এইরূপে যে উচ্চ আদর্শ লইয়া হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় ও বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বেথুন বিদ্যালয়ের (স্কুল ও কলেজ বিভাগ) মধ্যে তাহা পরিণতি লাভ করিল। বঙ্গদেশে তথা ভারতবর্ষে মহিলাদের উচ্চশিক্ষা লাভের সকল বাধা বিদূরিত হইয়া গেল।

প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৫৭

RAJA RADHA KANTA DEB ON WOMEN'S EDUCATION IN INDIA

JOGESH C. BAGAL

The name of Raja Radha Kanta Deb is associated with many beneficent activities of early nineteenth century. That he was also a pioneer of women's education may not be known to many. He in his own house started female *pathsalas* or primary schools. In those days periodical examinations of the Calcutta School Society's boys were held in Radha Kanta Deb's house. Girl students of private as well as missionary schools were examined alongwith these boys and prizes were distributed to the deserving. Raja Radha Kanta assisted materially Pandit Gour Mohan Vidyalankara in the preparation of *Stri Siksha Bidhayaka*, or a treatise on women's education in India, for popularising the cause among his countrymen at that time. This book ran through many editions, and people who were averse to women's education, gradually veered round it. Just after the foundation of the Bethune School, the forerunner of the Bethune College, at Calcutta, some correspondence was passed between the Hon'ble J. E. Drinkwater Bethune, the principal founder of the School and Raja Radha Kanta Deb, friend of women's education in India. In the family papers of Raja Radha Kanta Deb I have come across some of these letters written by Radha Kanta to Bethune from which his views and activities in this direction can be clearly ascertained. Raja Radha Kanta Deb wrote to say that the orthodox elements of society represented by him were no less keen to impart education to their womenfolk than the progressives, of his day. Only the former differed in this that in their opinion time had not then arrived to allow their female wards to join *public* schools. Mr. Bethune got *Stri Shiksha Vidhayaka* published afresh and in this too he received the Raja's blessings. These letters are still of much interest to the students of Indian education, and I reproduce them below. The first letter refers to the publication of *Stri Siksha Vidhayaka.*

(I)

The Hon'ble J E Drinkwater Bethune, Esqre
My dear Sir,

I have been honored with your favor of this day and beg to state in reply that before I allow myself to appear in public as the author of the *Stri Siksha Vidhayaka*. I should like to see the new edition of it which is about to be published under your auspices. I, therefore, ask the favour of your kindly sending me a copy of it when issued from the Press that I may examine its contents. As I have a great mind to hold conversation with you on the subject I shall feel obliged by your kindly letting me know when it will be convenient for you to see me at yours Begging your acceptance of my best thanks for your kindness towards my nephew, I remain with esteem and regard,

Yours faithfully and obediently,
R
[Raja Radha Kanta Deb]

19th February, 1851

In the second letter Raja Radha Kanta Deb condemned the vituperators of Mr. Bethune and the cause he represented in no uncertain terms.

(II)

To
The Hon'ble J. E. D. Bethune, Esqre.
My Dear Sir,

I shall do myself the honor of waiting on you at Sir Arthur Buller's on Saturday to come between the hours of one and two p.m. as my religious duties and other vocations will not, I regret, permit me to visit you in the forenoon. My literary occupations leave me little or no time to look over the newspapers but I have learnt from Mr. Blaquire's communication that impudent publications are appearing therein to sully your reputation. They are certainly the vituperation of a malignant mind that cannot rest without doing evil. 20th February, 1851.

I remain,
Faithfully and obediently yours,
R.

The third letter is the longest. Herein Raja Radha Kanta Deb gave a *resumé* of his activities in the cause of women's education for more than a quarter of a century. His views on various aspects of women's education, too, will be found in it.

To
The Hon'ble J. E. Drinkwater Bethune, Esqre.

My dear Sir,

On perusing the new edition of the *Stri Siksha Vidhayaka* which you lent me the other day I find that the first of it containing Dialogues between two Native females on a vulgar colloquial style is comparatively a modern addition made I believe by Gour Mohan Vidyalankara the late Pandit of the School Society in some of the subsequent editions of the work—the second part is an exhortation to the Hindoo females by English ladies to enlighten their minds with education. It was also I think composed by the said Pandit. But most of the materials were supplied by me especially the instance of some Sanscrit Text on behalf of female education and the examples of educated women both ancient and modern. To this extent I have a share in the execution of the work and no further. I cannot therefore conscientiously take upon myself the credit of an author.

That the work cannot be fathered on me will appear from the following remarks I made on it when it was circulated to me as a member of the School Book Society :

"I highly approve of the design of the work on the Hindoo female education in the manner proposed by me in my letters to Mr. Pearce and strongly recommend the republication of the work in the languages suggested by that gentleman, etc. This pamphlet being composed from the best Hindoo authorities would be both gratifying and encouraging to the Natives who peruse it to promote the important object in view. The revision which the work requires I have communicated to the *author* who I think deserves the proposed remuneration etc."

I may mention here that the first edition of the work was published in 1822 at the Baptist Mission Press for the Female Juvenile Society and its style having undergone material changes in subsequent editions, has lost its terseness and classical purity.

To prevent any misconception of my individual opinion respecting the great cause you have been struggling for, I embrace this opportunity to declare that I have even shewn myself both by precept and example a staunch advocate of female education in abstract the importance of which in improving the morals and promoting the social happiness of a nation is too obvious to need any illustration.

The indigenous schools or *Pathsalas* in Calcutta which flourished under the patronage of the late School Society numbered among the scholars many an intelligent girl who received their instruction at the domicile of their father or neighbours, were examined by the Pandits and other officers deputed by

the Society and the distribution of prizes used to be held at my residence I myself was the Native Secretary to the Society and had the supreme gratification of witnessing the admirable working of the system Not a stigma was attached to it nor a voice of censure was raised against it I sincerely wish that such a system may be restored.

Efforts indeed were made as early as in the days of Marquis Hastings to set up public female schools but since then all classes of respectable Hindoos have thought it derogatory to allow their daughters and female wards to attend these institutions In my letter addressed to the Rev. W. H.Pearce in 1819 I find the following lines :

"We get our girls taught in Bengalee before they are married though all natives do not do so I fear the school-masters will scarcely have any girls of opulent and respectable Natives to be instructed at their schools."

Again in the year 1821 when the British and Foreign School Society sent out Miss Cook to educate Hindoo females the same aversion for the instruction of females at public schools prevailed and I communicated to the above gentleman. the sentiments of the Hindoo Community on the subject in the following terms

"They may be all convinced of the utility of getting their female children taught at home in Bengalee by their domestic schoolmasters as some families do before such female children are married or arrived at the age 9 or 10 years at furthest. For these reasons I am publicly of opinion that we need not have a meeting to discuss the subject of the education of Hindoo females by Miss Cook who may render her services (if required) to the schools lately established by the missionaries for the tuition of the poorer classes of native females."

In another letter to the said gentleman I said :

"The Hindoos cannot but feel themselves grateful in her (Miss Cook's) laudable intentions to teach the Hindoo ladies in European works of art both manual and mechanical prevail upon her to instruct for the present some poor women of good caste that when these have acquired a degree of skilfulness under her benevolent instructions. they may hereafter be retained in the families of respectable Hindoos and their knowledge will thereby be diffused among native female generally without interfering with their immemorial customs and usages."

Thus it appears that the antipathy of the respectable classes of natives against the establishment of public female schools is not a novel one nor does it originate from any malicious disposition towards the worthy founders. In fact I would say that the sudden egression from the close seclusion of hundreds of years in which Hindoo females of the higher classes have been kept however reprehensible it may be or from whatever source it might have originated cannot but lead to great abuses.

It is therefore my humble opinion that the proprietors of public female schools would do well to take into their Institutions Hindu girls of the *Nava Sayaka* class* which does not stand very low in the scale of Society, and encourage by some such system as that of the School Society the establishment of Indigenous female schools which will be supplied with teachers from those public schools.

I remain with esteem and regard
Yours faithfully and obediently.
R.

20th March, 1851.

Modern Review, June 1942

P. S — With many thanks I beg to return herewith the copy of the *Stri Siksha Vidhayaka* with the title page which you lent me the other day.
20th March, 1851.

* It comprehends nine inferior classes, *viz* : Gopa (the cowherd), Mali (the gardener), Taili (the oilman), Tanti (weaver), Modaka (confectioner), Varaji (the cultivator of the bettle plant), Kulala (the potter), Karmakara (the black-smith) and Napita (the barber).

গ্রন্থ-পরিচিতি

জীবন স্মৃতি। শ্রীসুদক্ষিণা সেন। স্বর্গগতা জনক-জননীর চরণে—আমার "জীবন স্মৃতি" উৎসর্গীকৃত হইল। প্রণতা শ্রীসুদক্ষিণা সেন। ভবানীপুর, ২৪শে মাঘ, '৩৯ সন। প্রাপ্তিস্থান—৫৭নং ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা। (এক টাকা)। ৫৭ নং ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা হইতে [সু] দক্ষিণা সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী বি-এ কর্ত্তৃক আর্ট প্রেস ২০নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২০২।

'ভূমিকা' অংশটি নিচে মুদ্রিত হল :

কয়েক বৎসর হইতেই মনে করিয়াছি আমার জীবনের ইতিহাসটুকু লিখিয়া যাইব। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের দেশ কুসংস্কারের কুঝ্মটিকায় কিরূপ আচ্ছন্ন ছিল, সেই ঘোর কুঝ্মটিকাজাল ভেদ করিয়া কিরূপে ব্রাহ্মসমাজের আলোকে আসিলাম এবং সেই সময়কার ব্রাহ্মদের অবস্থাই বা কিরূপ ছিল তাহাই বলিবার জন্য আমার এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। কেহ যদি ইহা পাঠ করিয়া সেকালের অবস্থা কথঞ্চিৎও অনুভব করিতে সক্ষম হয়েন, আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

আমি জীবনীটি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি এমন সময় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাকে আমার জীবনের ইতিহাস লিখিতে অনুরোধ করেন। লিখিতে আরম্ভ করিলেও ইহা শেষ করিতে পারিতাম কিনা জানি না। তাঁহার এই অনুরোধে আমার উৎসাহ বাড়িল এবং ইহা শেষ করিতে সক্ষম হইয়াছি। আমি তজ্জন্য চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাঋণে আবদ্ধ থাকিব। আমার স্বর্গগত স্বামী মহাশয়ের জীবন-বৃত্তান্ত লেখক শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর মহাশয়ও আমাকে জীবনী লিখিতে উৎসাহিত করেন ; তাঁহার নিকটও আমি কৃতজ্ঞ রহিলাম।

আমার নাতিনাতিনীরা এ বিষয়ে আমায় নানাভাবে সহায়তা করিয়াছে। তাহাদের মস্তকে ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক।

ভাষা ও বর্ণনায় অনেক ত্রুটী রহিয়া গেল, তাহা আমি নিজেই বুঝিতেছি। আশাকরি পাঠকপাঠিকাগণ সংশোধন করিয়া লইবেন।

লেখিকা।

চিত্র পরিচিতি : একটিমাত্র সাদাকালো প্রবেশকচিত্র-সমন্বিত (ছবির শিরোনাম : '১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ভারতাশ্রমে কেশবচন্দ্র')। ছবির একেবারে মধ্যস্থলে আচার্য কেশবচন্দ্র চেয়ারে উপবিষ্ট। তাঁর বাঁ-দিকে যাঁরা বসে আছেন তাঁরা হলেন : ১. শ্রীযুক্তা জগন্মোহিনী সেন (আচার্য কেশবচন্দ্রের পত্নী), ২. কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী, ৩. শ্রীযুক্তা সৌদামিনী মজুমদার (প্রচারক প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের পত্নী), ৪. শ্রীযুক্তা রাজলক্ষ্মী সেন (প্রচারক প্রসন্নকুমার সেনের পত্নী), ৫. শ্রীযুক্তা মহামায়া বসু (প্রচারক মহেন্দ্রনাথ বসুর পত্নী), ৬. প্রচারক উমানাথ গুপ্তের স্ত্রী, ৭. হরনাথ বসুর জনৈক আত্মীয়া, ৮. কুমারী সুদক্ষিণা গঙ্গোপাধ্যায় (গ্রন্থলেখিকা), ৯. শ্রীযুক্তা ক্ষান্তমণি দত্ত (প্রচারক প্রাণকৃষ্ণ দত্তের পত্নী), ১০. প্রচারক রামচন্দ্র সিংহের শ্বশ্রূমাতা, ১১. কুমারী কুমারী দাসগুপ্ত, ১২. শ্রীযুক্তা স্বর্ণলতা দে (প্রচারক কেদারনাথ দের পত্নী)। ডানদিকে যথাক্রমে বসে আছেন : ১৩. কুমারী বিরাজমোহিনী চৌধুরী (শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের পত্নী), ১৪. প্রচারক অমৃতলাল বসুর স্ত্রী, ১৫. শ্রীযুক্তা বরদাসুন্দরী চট্টোপাধ্যায় (শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী), ১৬. শ্রীযুক্তা কুমুদিনী সিংহ (প্রচারক রামচন্দ্র সিংহের পত্নী), ১৭. প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শ্বশ্রূমাতা, ১৮. শ্রীযুক্তা যোগমায়া গোস্বামী (প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পত্নী), ১৯. শ্রীযুক্তা অন্নদায়িনী সরকার (শ্রীযুক্ত হরগোপাল সরকারের পত্নী), ২০. শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সেনের পত্নী, ২১. শ্রীযুক্তা নিস্তারিণী রায় (উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের পত্নী), ২২. কুমারী শরৎকুমারী দত্ত (শ্রীযুক্ত সত্যপ্রিয় দেবের পত্নী), ২৩. শ্রীযুক্তা নিতম্বিনী চট্টোপাধ্যায়, ২৪. প্রচারক দীননাথ মজুমদারের পত্নী, ২৫. শ্রীযুক্ত হরনাথ বসুর পত্নী, ২৬. জনৈক শিববাবুর পত্নী।